ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ

মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী

www.pathagar.com

ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ

মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী

অনুবাদ ঃ আব্বাস আলী খান

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ২৪৮

১০ম প্রকাশ (আধুনিক ৫ম প্রকাশ)
জমাদিউস সানি ১৪৩৬
চৈত্র ১৪২১
মার্চ ২০১৫

বিনিময় ঃ ১৫০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

اسلام ایک نظرمیں -এর বাংলা অনুবাদ

ISLAMER PURNANGO RUP by Maulana Sadruddin Islahi.
Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 120.00 Only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ তায়ালার অসংখ্য শুকরিয়া যে, নানাবিধ অসুবিধা ও প্রতিকূল অবস্থার ভেতর দিয়ে "ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ' বইখানি পাঠক সমাজের খেদমতে পেশ করতে পারছি। বইখানি প্রখ্যাত আলেম মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী সাহেবের মূলগ্রন্থ "ইসলাম এক নযর মে"-এর বাংলা অনুবাদ।

ইসলামী মন-মস্তিষ্ক ও মননশীলতার জন্যে এ এক অনন্য সাধারণ গ্রন্থ সন্দেহ নেই। ইসলামের পরিপূর্ণ রূপ এর মধ্যে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করা হয়েছে। ইসলামের বিশদ বিশ্লেষণ থেকে শুরু করে ঈমানিয়াত, নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ প্রভৃতির সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা এতে রয়েছে। অতপর ইসলামী জীবন বিধানের বিস্তারিত আলোচনা, তার আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, দ্বীন ও রাজনীতি, মুসলিম মিল্লাতের গুরু দায়িত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলোর উপর যুক্তি-তর্ক ও অকাট্য প্রমাণাদিসহ আলোকপাত করা হয়েছে। সর্বশেষে ইসলামের পার্থীব বরকতসহ বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রন্থখানিকে যথাসম্ভব সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করার চেষ্টা করা হয়েছে। ইতিপূর্বে বইটি তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা পাঠকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে এখন তা এক খণ্ডে প্রকাশ করছি।

আশা করি, বইখানি সকল চিন্তাশীল পাঠকের হৃদয়ে দ্বীনে হকের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করবে এবং সেটাই আমাদের সাফল্য ও সার্থকতা।

বিনীত

—প্রকাশক

রজব, ১৩৯৬ হিজরী।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

❑ অর্থ ও তাৎপর্য ১৩

ইসলামের বুনিয়াদী তাৎপর্য ১৩
তাক্‌ভিনী ইসলাম ১৩
তাশরিয়ী ও পারিভাষিক ইসলাম ১৬
ইসলাম ও মানব ১৭
প্রত্যেক জাতির 'দ্বীন' ছিল ইসলাম ১৮
শুধু শেষ দ্বীনের নাম ইসলাম ১৯
পার্থক্যের কারণ ২১

❑ বুনিয়াদী আকায়েদ ২৪

১. আল্লাহর উপরে ঈমান ২৪
আল্লাহর উপরে ঈমান আনার অর্থ ২৫
শির্ক ২৯

২. আখেরাতের প্রতি ঈমান ৩২
আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার অর্থ ৩২
আখেরাতের উপর ঈমান আনার গুরুত্ব ৩৩
শাফায়াতের মুশরেকী ধারণা ৩৪
শাফায়াতের ইসলামী ধারণা ৩৫

৩. রেসালাতের প্রতি ঈমান ৩৯
রেসালাত ও তার আবশ্যকতা ৩৯
রসূল মানুষই ছিলেন ৪৩
রেসালাতের পদমর্যাদার ধরন ৪৭
রেসালাত সার্বজনীন ৪৮
রসূলের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ৪৮
নবীগণ ছিলেন নিষ্পাপ ৪৯
নবীদের পজিশন বা মর্যাদা ৫১
একজন নবীকে অস্বীকার করাও কুফরী ৫৩
রেসালাতে মুহাম্মদী ৫৫

❑ বুনিয়াদী আমল ৫৬

আরকানে ইসলাম ৫৬

www.pathagar.com

১. তওহীদ ও রেসালাতের স্বীকারোক্তি ৫৮
২. নামায ৫৯
দ্বীনে নামাযের গুরুত্ব ৫৯
নামাযের এ গুরুত্ব কেন ৬৩
নামাযের কিছু অতিরিক্ত উদ্দেশ্য ৬৫
বাঞ্ছিত নামায ৬৭
৩. যাকাত ৬৮
যাকাতের গুরুত্ব ৬৮
যাকাতের উদ্দেশ্য ৭২
যাকাতের হার ৭৯
যাকাতের ব্যবস্থাপনা ৮৪
যাকাতের বিভিন্ন পরিভাষা ৮৬
৪. রোযা ৮৭
রোযার বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য ৮৭
রোযা তাকওয়ার উৎস ৮৭
রোযা তাকওয়ার অপরিহার্য পন্থা ৯৩
রোযা তাকওয়ার ইসলামী মতবাদের আয়না স্বরূপ ৯৪
রোযার কিছু বিশিষ্ট সুফল ৯৯
উদ্দেশ্য অর্জনের শর্তাবলী ১০১
৫. হজ্ব ১০২
হজ্বের মর্যাদা ১০২
কা'বা নির্মাণ এবং তার গূঢ় রহস্য ১০৩
হজ্বের নিয়ম পদ্ধতি ১০৮
হজ্ব ও এবাদতের প্রেরণা ১১১
হজ্বের সার্বিক মর্যাদা ১১৫
ইসলামী রুকনসমূহের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টি ১১৬

❑ ইসলামী জীবন বিধান ১১৮

দ্বীন সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা-মতবাদ ১১৮
ইসলামে রাহবানিয়াত নেই ১১৯
ইসলাম শুধু ব্যক্তি জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় ১২২
ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা ১২৪
আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা ১২৫
নৈতিক ব্যবস্থা ১২৬

www.pathagar.com

পারিবারিক বিধান ১৩৩
সামাজিক ব্যবস্থা ১৩৫
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ১৪৬
রাজনৈতিক ব্যবস্থা ১৫৩
আইন ব্যবস্থা ১৫৯

❑ দ্বীন ও রাজনীতি ১৬২
ঈমান বিল্লাহ এবং রাজনীতির ধারণা ১৬৩
শরীয়তের নির্দেশাবলী ও রাজনৈতিক বিভাগ ১৬৪
দ্বীনের অনুসরণ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ১৬৫
রাজনীতি দ্বীনের প্রয়োজনীয় অংশ ১৬৭
ইসলামী রাষ্ট্র এবং মুসলিম রাষ্ট্র ১৬৮
নবীদের শিক্ষা ও রাষ্ট্রশক্তি ১৭০
ইসলামী দাওয়াত ও রাষ্ট্রশক্তি ১৭৩

❑ শরীয়ত ও এবাদত ১৭৫
এবাদতের মর্যাদা ১৭৫
এবাদতের মর্ম ১৭৬
এবাদত আভিধানিক অর্থের আলোকে ১৭৬
দ্বীনের সর্বস্বীকৃত মতবাদের আলোকে ১৭৮
কোরআনের ব্যবহার পদ্ধতির আলোকে ১৮০
কোরআনের বাঞ্ছিত এবাদত ১৮৪
আরকানে ইসলামের বিশিষ্ট গুরুত্ব ১৮৬
ভ্রান্ত ধারণা ও কারণসমূহ ১৮৮

❑ ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম ১৯১
ধর্মীয় একত্বের মতবাদ ১৯১
রেসালতে মুহাম্মদীর স্বতন্ত্র মর্যাদা ১৯২
স্বতন্ত্র মর্যাদার স্বাভাবিক দাবী ১৯৬
একমাত্র ইসলামের অনুসরণ আবশ্যক ১৯৬
ইসলামের অনুসরণই নাজাতের শর্ত ২০১

❑ মুসলিম জাতির গুরুদায়িত্ব ২০৪
ইসলামের বিশিষ্ট মর্যাদার বিশিষ্ট দাবী ২০৪
মুসলিম জাতির দায়িত্ব ২০৫
শাহাদতে হক (সত্যের সাক্ষ্য) কাকে বলে ২১০

www.pathagar.com

বাস্তব সাক্ষ্য ২১৩
প্রতিবন্ধকতা ও তার দাবী ২১৪
আভ্যন্তরীণ জিহাদ ২১৬
প্রচারমূলক জিহাদ ২১৯
সশস্ত্র জিহাদ ২২২
সশস্ত্র জিহাদের প্রকারভেদ ২২৪
দ্বীনের মধ্যে জিহাদের গুরুত্ব ২৩০
দাওয়াতী ও আদর্শমূলক জিহাদ ২৩৪
সশস্ত্র জিহাদের মর্যাদা ২৩৬

❑ ইসলামের দুনিয়াবী বরকত ২৪৬
দুনিয়ার সাফল্য এবং নবীগণের দাওয়াত ২৪৬
ইসলাম পার্থিব সাফল্যের নিশ্চয়তা দানকারী ২৪৯
দ্বীনের অনুসরণ এবং পার্থিব সাফল্যের সম্পর্ক ২৫১
পার্থিব সাফল্যের অপরিহার্য শর্তাবলী ২৫৫
একটি বিভ্রান্তি ও তার খণ্ডন ২৫৯

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অর্থ ও তাৎপর্য

ইসলামের বুনিয়াদী তাৎপর্য

অভিধানের দৃষ্টিতে 'ইসলাম' অর্থ আদেশ পালন করে চলা। কিন্তু দ্বীনের ভাষায় যখন কথা বলা হয়, তখন এ শব্দের অর্থ শুধু সেই আদেশ পালন, যা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে করা হয়। অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ পালন করে চলা। অতএব 'মুসলিম' তাকেই বলে যে আল্লাহর আদেশ মেনে চলে এবং তাঁর আদেশ লংঘন করে না।

তাক্‌ভিনী ইসলাম

আমাদের সকলের জানা আছে যে, আল্লাহ তায়ালার আহকাম (নির্দেশাবলী) দুই প্রকারের। একটা হলো তাক্‌ভিনী (সৃষ্টিগত)। অন্যটা তাশরিয়ী (শরীয়াতগত)।

যেসব আদেশ-নিষেধ স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্যতামূলকভাবে পালন করা হয় এবং যা না করে কোন উপায় নেই তাহলো তাক্‌ভিনী আহকাম বা সৃষ্টিগত নির্দেশাবলী। কারণ প্রতিটি সৃষ্টিকে স্রষ্টার আদেশ পালনে বাধ্য করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। সৃষ্টির মূলে তাকে এ স্বাধীনতা দেয়া হয়নি যে, সে ইচ্ছা করলে সে আদেশ মানবে অথবা মানবে না। যেমন ধরুন, সূর্যের প্রতি তার এবং গোটা সৃষ্টিজগতের মালিকের হুকুম হলো এই যে, সে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে উদিত হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর অস্ত যাবে। পৃথিবী থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থান করবে এবং পৃথিবীকে আলো ও উষ্ণতা দান করবে। সূর্য এ নির্দেশ পালন করতে বাধ্য। তার এ শক্তি নেই যে, সে এ আদেশ কখনো অস্বীকার করে। এরূপ বায়ুর উপর নির্দেশ এই যে, সে প্রাণী জগতকে জীবিত রাখবে। পানিকে আদেশ করা হয়েছে তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা মিটাতে। জ্বালিয়ে দেয়ার আদেশ করা হয়েছে অগ্নিকে। মানুষের উপর আদেশ হয়েছে যে, সে জিহ্বা দ্বারা কথা বলবে। কান দিয়ে শুনবে। নাক দিয়ে ঘ্রাণ নেবে।

যে কয়টি সৃষ্টির নাম করা হলো, এরা সকলে এদের উপরে আরোপিত নির্দেশ পালনে বাধ্য। অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করা এদের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। এ ধরনের আহকাম বা নির্দেশাবলীকে প্রাকৃতিক আইন-কানুন এবং কুদরতী আইন কানুনও বলা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ একথাটাই বহুল প্রচারিত।

www.pathagar.com

তাশরিয়ী বা শরীয়াতগত আহকাম বলতে আল্লাহ তায়ালার সে সব আদেশ-নির্দেশ বুঝায়, যা পালন করতে কোন জন্মগত বা সৃষ্টিগত বাধ্য-বাধকতা নেই। বরঞ্চ তা ছেড়ে দেয়া হয়েছে স্বাধীন ইচ্ছার উপরে। সে আদেশ পালন করার এখতিয়ারও যেমন সৃষ্টির আছে, তেমনি সে আদেশ পালন না করার এখতিয়ারও তার আছে। যেমন ধরুন, মানুষের উপরে খোদার নির্দেশ হচ্ছে যে, সে এক খোদার বন্দেগী করবে। কিন্তু এ কাজ করার জন্যে জন্মগতভাবে সে বাধ্য নয়। বরঞ্চ তাকে এ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে যে, সে ইচ্ছা করলে এক খোদার বন্দেগী দাসত্ব আনুগত্য করবে। অথবা ইচ্ছা করলে সে হাজার হাজারকে তার খোদা বানাতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে সে খোদা এবং খোদায়ীকে একেবারে অস্বীকারও করতে পারে। এসব নির্দেশাবলীকে শরয়ী আহকাম বা শরয়ী আইন-কানুন বলা হয়।

এ উভয় প্রকারের নির্দেশ আল্লাহ তায়ালার একই রকম পালনীয় নির্দেশ। অপর দিকে যেহেতু আদেশ পালন করার নামই ইসলাম, সে জন্যে এ দু'য়ের যে কোন একটির আনুগত্য করাকে বলা হবে ইসলাম। এ এক সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য সত্য।

অতপর যেহেতু অচেতন পদার্থ হতে মানুষ এবং ফেরেশতা পর্যন্ত এমন কোন সৃষ্টি নেই, যে তার মালিক ও স্রষ্টার দাস নয় এবং যার প্রতি সৃষ্টিগত অথবা শরীয়তগত আদেশ দেয়া না হয়েছে, এ জন্যেই 'ইসলাম' এবং 'মুসলিম' হওয়ার বিষয়টা শুধু মানুষ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। বরঞ্চ গোটা সৃষ্টিজগত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে 'ইসলাম' কোন এক বিশেষ সৃষ্টির নয়, বরঞ্চ গোটা সৃষ্টিজগতের দ্বীন হয়ে পড়েছে। এর অর্থ এই হলো যে, ওসব সৃষ্টির 'দ্বীন' ইসলাম, যাদেরকে ইচ্ছা ও এখতিয়ারের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যাদের প্রতি সৃষ্টিগত আহকাম বা প্রাকৃতিক আইন-কানুন চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এভাবে যেহেতু তারা তাদের উপর আরোপিত ওসব আহকাম পূরোপূরি মেনে চলে, সে জন্যে তারা সকলেই 'মুসলিম' এবং পূর্ণ 'মুসলিম'। এই যে সূর্য সেও মুসলিম। কেননা সে ঐ একটি নির্দিষ্ট বিধান ও ব্যবস্থা অনুযায়ী পরিভ্রমণ করে, উদিত এবং অস্তমিত হয়। উষ্ণতা এবং আলো ছড়ায়। এ এমন এক অটল বিধান যা তার জন্যে তৈরী করা হয়েছে। এই যে চন্দ্র এবং তারকারাজি—এরাও মুসলিম। কারণ তাদেরকে যে বিধান ও আইন -কানুনের অধীন করা হয়েছে, তা কখনো তারা ভংগ করে না। তেমনি বায়ুও মুসলিম কারণ সে ঐভাবেই প্রবাহিত হয়, মেঘ পরিচালনা করে, তৃণরাজিকে খাদ্য ও সজীবতা দান করে এবং ঐভাবেই প্রাণীজগতকে সজীব রাখে যেভাবে তাকে আদেশ করা হয়েছে। এরূপ পানিও মুসলিম। কারণ সে মাটিকে সিক্ত

www.pathagar.com

করে, চারা উৎপন্ন করে, পিপাসা নিবারণ করে এবং উষ্ণতা লাভ করে বাষ্পে পরিণত হয়। এ সবকিছুই তার মনিবের পক্ষ থেকে তার উপরে ডিউটি নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। ইচ্ছা ও এখ্‌তিয়ার বিহীন সৃষ্টির 'দ্বীন'ও ইসলাম এবং তারা সকলেই যে 'মুসলিম' একথাটা নিছক বিবেক ও যুক্তি-তর্কের ভিত্তিতে বলা হয়নি, বরঞ্চ তার আসল ভিত্তি হলো পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট উক্তি। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

"(সত্য অস্বীকারকারী দল কি) আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কোন দ্বীন অনুসন্ধান করে ? অথচ আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তারা সকলেই আল্লাহর দ্বীনের অনুগত।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৩)

কোরআন পাকের এ শব্দগুলো একথাই প্রমাণ করে যে—আকাশমণ্ডলী থেকে এ পৃথিবী পর্যন্ত একমাত্র সত্য দ্বীন অস্বীকারকারী জ্বিন ও মানব ব্যতীত প্রত্যেকটি সৃষ্টি আল্লাহর 'মুসলিম' (অনুগত) এবং তাদের সকলের দ্বীন হচ্ছে 'ইসলাম'।

আর একটি আয়াতের দিকে লক্ষ্য করুন। উপরের সত্যকে অন্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ط وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ط

"সাত আসমান, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাকিছু আছে তা সবই আল্লাহ তায়ালার তসবীহ পাঠ করে। এ সৃষ্টিজগতে এমন কোন বস্তু নেই যা তাঁর প্রশংসার সাথে পবিত্রতা ও মহত্ব বর্ণনা করে না। কিন্তু তোমরা তাদের এ তসবীহ পাঠ (পবিত্রতা ও মহত্ব বর্ণনা) বুঝতে পার না।"

–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪৪)

তৃতীয় আর একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ط

"তোমরা কি লক্ষ্য করনি যে, বস্তুতঃ আল্লাহই এক সত্তা যাকে সেজদা করে সকলেই, যারা আছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে। এবং সেজদা করে

www.pathagar.com

সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষরাজী, চতুষ্পদ জন্তু ও বহুসংখ্যক মানুষ।"–(সূরা আল হজ্জ ঃ ১৮)

এখন বুঝতে পারা গেল যে শুধুমাত্র দু' একটি সৃষ্টি নয়, বরঞ্চ আকাশ, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজী, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, বাতাস, পানি, বৃক্ষলতাদি, সমুদ্র, পশু-পক্ষি, মানুষ ও জ্বিন—এক কথায় প্রতিটি অণু-পরমাণু হতে আরম্ভ করে সূর্য পর্যন্ত প্রতিটি ছোট-বড়, সজীব-নির্জিব সচেতন-অচেতন সৃষ্টি আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে। তাঁর সামনে সকলেই মস্তক অবনত করে, সেজদা করে।

এই প্রশংসাবাদ ও পবিত্রতা বর্ণনা এবং সেজদা করার প্রকৃত মর্ম অন্তত এই যে, এসব সৃষ্টি ও পদার্থ কণা তাদের প্রতি আল্লাহর আরোপিত আইন কানুন, বিধি-ব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেনে চলে। এভাবে তারা তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর প্রকাশ্য সাক্ষ্যদান করে তাদের গতিবিধি ও কার্যপ্রণালীর দ্বারা।

এসব আয়াতের দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, ইচ্ছা স্বাধীনতা ও এখতিয়ারবিহীন সমগ্র সৃষ্টিজগতের 'দ্বীন'ও ইসলাম। কিন্তু তাদের প্রতি যে আহকাম দেয়া হয়েছে তা যেহেতু সৃষ্টিগত ধরনের, সে জন্যে তাদের ইসলামের স্বরূপটাও হবে সৃষ্টিগত ইসলাম এবং তাদেরকে বলা হবে সৃষ্টিগত 'মুসলিম'।

তাশরিয়ী ও পারিভাষিক ইসলাম

এখন ঐসব সৃষ্টির কথা চিন্তা করুন যারা ইচ্ছা ও এখতিয়ারের স্বাধীনতা রাখে। তাদের প্রাকৃতিক পজিশন এই যে, যদিও অনেক ব্যাপারে তারা প্রথমোল্লিখিত সৃষ্টির মতো লাচার ও স্বাধীন এখতিয়ারবিহীন, কিন্তু আবার অনেক ব্যাপারে তারা সেরূপ লাচার ও এখতিয়ারবিহীন নয়। বরঞ্চ জন্মগত-ভাবে তাদেরকে এ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে যে, এসব ব্যাপারে তারা যেমন খুশী তেমন ভূমিকা অবলম্বন করতে পারে। যেমন ধরুন, মানুষের প্রতি আল্লাহ তায়ালার এক ধরনের আইন চাপানো আছে যে, সে চোখ দিয়ে দেখবে, কান দিয়ে শুনবে, মুখ দিয়ে কথা বলবে। আবার আর এক ধরনের আইন আছে যে, সে তার চক্ষু দ্বারা কেবলমাত্র অমুক অমুক বস্তু দেখবে ও অমুক অমুক বস্তু দেখবে না। কান দিয়ে অমুক কথা শুনবে ও অমুক কথা শুনবে না। মুখ দিয়ে যেন এমন কথা বের হয় ও এমন কথা কখনো বের হয় না। এখন প্রথম ধরনের আইনতো সে বাধ্যতামূলকভাবেই মেনে চলে। কারণ এ ব্যাপারে আইন মানা না মানার কোন স্বাধীনতাই তাকে দেয়া হয়নি। সে জন্যে সে আইন অনুযায়ী চলতে বাধ্য।

www.pathagar.com

কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের আইন মানার জন্যে তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। সে ইচ্ছা করলে তা মানতে পারে এবং ইচ্ছা করলে মানতে নাও পারে। এ ব্যাপারে আনুগত্য করা না করা উভয় প্রকারের স্বাধীনতাই তার আছে। এ জন্যে যে রকম প্রথম ধরনের আহকামের বেলায় এবং জীবনের এখতিয়ারবিহীন ক্ষেত্রে মানুষের ইসলামকে তাকভিনী বা সৃষ্টিগত ইসলাম বলা হবে, সে রকম জীবনের অবশিষ্ট ক্ষেত্রে অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছা ও এখতিয়ার বিশিষ্ট ক্ষেত্রে তার ইসলামকে শরীয়তগত এবং এখতিয়ারপূর্ণ ইসলাম বলা উচিত। কিন্তু দ্বীনি পরিভাষায় শরয়ী আহকামের জন্যে শরয়ী আহকাম অথবা 'শরয়ী ও এখতিয়ারী ইসলাম' শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। বরঞ্চ তাশরিয়ী ও এখতিয়ারী শব্দের বন্ধন ব্যতিরেকে 'আহকামে এলাহী' এবং 'ইসলাম' শব্দগুলোকে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। তার কারণও অতি সুস্পষ্ট।

যেসব সৃষ্টিকে তাক্‌ভিনী আহকামের সাথে সাথে তাশরিয়ী আহকাম পালনের জন্যেও দায়ী করা হয়েছে, তাদের বেলায় আনুগত্য ও আনুগত্যের ফলশ্রুতির দিক দিয়ে তাকভিনী আহকামের কোন গুরুত্ব থাকছে না। তাশরিয়ী আহকামই সবকিছু হয়ে যাচ্ছে। এ জন্যে সাধারণ আলোচনায় 'আহকামে এলাহী' ও 'ইসলাম' পরিভাষাদ্বয় সংগত কারণেই শুধু ঐসব তাশরিয়ী আহকামের জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে থাকা উচিত এবং তাই করা হয়েছে।

অতএব এখন আসল কথা হলো এই যে, যারা আহকামে এলাহী মানে না তাদের জন্যে 'মুসলিম' শব্দ একেবারেই ব্যবহার করা চলবে না। অথচ সে এ অবস্থাতেও তাকভিনী আহকাম পুরোপুরি মেনে চলছে এবং এর ভিত্তিতে অতটুকু পর্যন্ত সে অবশ্যই 'মুসলিম'। কিন্তু যেহেতু এখতিয়ারী ইসলাম না থাকা অবস্থায় বাধ্যতামূলক ইসলামের কোনই মূল্য থাকছে না, সে জন্যে তা ধর্তব্যের মধ্যেও নয়। এ কারণে শরীয়তের পরিভাষায় কোন ব্যক্তিকে 'মুসলিম' শুধুমাত্র তখনই বলা যাবে যখন সে তাকভিনী আহকামের বাধ্যবাধকতা হতে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তাশরিয়ী আহকামের কাছে স্বেচ্ছায় নতি স্বীকার করবে।

ইসলাম ও মানব

এর আগে ইংগিত করা হয়েছে যে, যেসব সৃষ্টিকে ইচ্ছা ও এখতিয়ারের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, মানুষ তাদের মধ্যে একটি। শুধু যে তাদের মধ্যে একটি তাই নয়, বরঞ্চ এ ব্যাপারে তার মধ্যে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যও আছে। এ জন্যে স্বাভাবিকভাবেই তার উপর তাশরিয়ী আহকাম জারী করা হয়েছে। কোরআন মজিদ বলে যে, যখন প্রথম মানুষটিকে এ দুনিয়ায় বসবাসের জন্যে পাঠানো হয় তখন আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন ঃ

www.pathagar.com

فَامَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ○
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج

"অতপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়েত পৌঁছে, তাহলে যে আমার হেদায়েত মেনে চলবে তার জন্যে চিন্তার কোন কারণ থাকবে না এবং সে আশংকিত ও ব্যথিত হবে না। যে হেদায়েত অস্বীকার করবে এবং আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবে সে হবে দোযখের অধিবাসী।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ৩৮-৩৯)

এ ঘোষণায় হেদায়েত অর্থাৎ শরীয়তের আহকাম পাঠাবার কথা যদিও শর্তের সাথে বলা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা কোন শর্ত নয়। বরঞ্চ কথা বলার এ এক বাদশাহী ভংগিমা। এর মর্ম এই যে, তোমাদের কাছে আমার হুকুম-আহকাম অবশ্যই পৌঁছবে যা মেনে চলা তোমাদের অপরিহার্য কর্তব্য।

বস্তুত বাস্তব ক্ষেত্রে যা কিছু হয়েছে তার বিশ্লেষণ কোরআনের নিম্নোক্ত ঘোষণায় পাওয়া যায় ঃ

وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَافِيْهَا نَذِيْرٌ○ (فاطر : ٢٤)

"এমন কোন জাতি ছিল না যাদের কাছে কোন সাবধানকারী (নবী) আসেনি।"–(সূরা ফাতের ঃ ২৪)

এ দু'টি আয়াত একথারই সুস্পষ্ট ঘোষণা করে যে, এ দুনিয়ায় মানুষের বসবাস এবং শরীয়তের আহকাম একত্রেই শুরু হয়েছে। সেই আদিকাল থেকে মানবজগত কখনো 'দ্বীন' ও 'শরীয়ত' শূন্য হয়ে পড়েনি। এমন জাতি নেই যে, আল্লাহ তায়ালার হেদায়েত থেকে বঞ্চিত ও অনবহিত রয়েছে। এটা এ জন্যে যে, মানুষ ছিল একটা স্বাধীন এখতিয়ার সম্পন্ন সৃষ্টি।

প্রত্যেক জাতির 'দ্বীন' ছিল ইসলাম

মানব অস্তিত্বের প্রথম দিন হতে আজ পর্যন্ত শরীয়তের যেসব আহকাম চলে এসেছে তা সবই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রেরিত। এ জন্যে তার প্রতিটির আনুগত্য প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য। এর ভিত্তিতেই বলা যায় যে, প্রত্যেক যুগের শরীয়তের আহকামের যে সমষ্টি, যাকে 'দ্বীন' বলে, তা ছিল ইসলাম। আর তা যারা মেনে চলেছে, তাদের প্রত্যেকেই প্রকৃতপক্ষে ছিল 'মুসলিম'। এ এমন এক অনিবার্য সত্য যে সম্পর্কে জ্ঞান ও বিবেক এবং কোরআনের সাক্ষ্য একমত। হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ـ

"ইবরাহীম না ছিলেন ইয়াহুদী, আর না ছিলেন নাসরানী (খৃষ্টান)। বরঞ্চ সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহর একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন তিনি।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৬৭)

আর একস্থানে হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তার বংশধর হযরত ইসমাঈল (আ), হযরত ইসহাক (আ), হযরত ইয়াকুব (আ), হযরত ইউসুফ (আ) প্রমুখ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ○ وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ـ يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ..... قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ ..... وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ○ (بقرة : ١٣١-١٣٣)

"শুনো সে সময়ের কথা যখন ইবরাহীমকে তাঁর প্রভু বলেছিলেন— 'মুসলিম হও অর্থাৎ আমার অনুগত হয়ে যাও।' তখন তার জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'আমি জগতসমূহের প্রভুর মুসলিম অর্থাৎ অনুগত হয়ে গেলাম।' অতপর এ বিষয়ে অসিয়ত করলেন ইবরাহীম তার পুত্রদেরকে এবং ইয়াকুব তাঁর পুত্রদেরকে এই বলে, 'হে আমার সন্তানগণ। আল্লাহ তোমাদের জন্যে এই বিশেষ দ্বীনটি পছন্দ করেছেন। অতএব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমরা মুসলিম হয়ে থেকো।'..... তাঁরা বললো ঃ 'আমরা আপনার ইলাহর বন্দেগী করব ..... এবং আমরা তাঁরই মুসলিম (অনুগত) হয়ে থাকব'।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৩১-১৩৩)

কোরআন পাকে এ ধরনের বিশ্লেষণ হযরত লূত (আ), হযরত মূসা (আ), হযরত সুলায়মান (আ), হযরত ঈসা (আ) প্রমুখ নবীগণের সম্পর্কেও দেয়া হয়েছে। অতপর সুস্পষ্টরূপে বলা হয়েছে যে, তাঁরা এবং তাদের অনুসারীগণ সকলেই ছিলেন 'মুসলিম' এবং সকলেরই দ্বীন ছিল ইসলাম।

শুধু শেষ দ্বীনের নাম ইসলাম

যেসব তথ্য ও তত্ত্ব পেশ করা হলো তার আলোকে যে কোন আসমানী দ্বীনের অন্যান্য আসমানী দ্বীনের তুলনায়, প্রকাশ্যতঃ নাম ও ব্যাখ্যার দিক দিয়ে কোন বৈশিষ্ট্য পার্থক্য থাকার কথা নয়। তা সে কোরআনী শরীয়ত হোক অথবা তৌরাতী হোক। হযরত আদম (আ), হযরত নূহ (আ) এবং হযরত ইবরাহীমের (আ) প্রতি প্রেরিত শরীয়ত হোক অথবা হযরত ঈসার (আ)

www.pathagar.com

শরীয়ত হোক। তাদের সকলের এই একই নাম—'ইসলাম' এবং সেসব শরীয়তের অনুসারীগণেরও 'মুসলিম' নাম দেয়া বাঞ্ছনীয়। এ জন্যে যে, মূল এবং মর্মের দিক থেকে এ সমুদয় শরীয়ত একই ধরনের 'ইসলাম' ছিল এবং তাদেরই অনুসারীগণও ছিলেন 'মুসলিম'।

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল তার বিপরীত। তার কারণ এই যে, কোরআনের বিশেষ পরিভাষায় 'ইসলাম' নামটি শুধুমাত্র ঐ দ্বীনটির জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে, যা কোরআন পেশ করেছে এবং যা শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফার (সা) উপরে নাযিল হয়েছে। এভাবে 'মুসলিম' নামটিও এসব লোকের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যাঁরা ছিলেন শেষ দ্বীনের অনুসারী। কোরআন যখন 'আল ইসলাম' শব্দটি উচ্চারণ করে তখন তা ইসলাম শব্দের সাধারণ অর্থ বুঝায় না। বরঞ্চ বিশেষ করে এ একটি দ্বীন এবং আহকামে এলাহীর সমষ্টিকেই বুঝায়। যেমন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ط(مائدة : ٣)

"মুসলমানগণ ! আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্যে আমার 'দ্বীন' পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের উপরে আমার নিয়ামত পূর্ণ মাত্রায় দান করলাম এবং 'দ্বীন' হিসেবে 'আল ইসলাম'কে মনোনীত করলাম।"

–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৩)

এ আয়াতগুলোতে 'আল ইসলাম' বিশেষ করে ঐ একটি দ্বীনকে বলা হয়েছে যা ছিল হযরত মুহাম্মদের (সা) আনীত দ্বীন।

'মুসলিম' নামটি সম্পর্কে বলতে গেলেও বলতে হয় যে, এ ব্যাপারে তো আরো সুস্পষ্ট। কোরআন পাকের এরশাদ হচ্ছে ঃ

هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ٧ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا ط(حج : ٧٨)

"তিনিই তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছেন প্রথম থেকেই এবং এ কোরআনেও।"–(সূরা আল হজ্জ ঃ ৭৮)

এ শব্দগুলো অর্থ ও মর্মের দিক দিয়ে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। একটা সিদ্ধান্তকর ভংগিমায় বলা হচ্ছে যে, পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতকে অর্থের দিক দিয়ে এবং গুণবাচক হিসেবে যদিও 'মুসলিম' বলা হয়েছে, তথাপি এ বিশিষ্ট মর্যাদাটি লাভ করেছেন শুধুমাত্র শেষ দ্বীনের অনুসারীগণ। অর্থের দিক দিয়ে মুসলিম হওয়ার সাথে সাথে তাদের প্রকাশ্য নাম এবং উপাধিও হয়েছে মুসলিম।

www.pathagar.com

শেষ নবীর উম্মত ব্যতীত অন্য এমন কোন আহলে ঈমান দল নেই যাকে 'মুসলিম' বলা হয়েছে। যদি তাই হতো তাহলে "তিনিই তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছেন" কথাটি অর্থহীন হয়ে পড়তো। কারণ যদি সকল আহলে ঈমান নামের দিক দিয়ে 'মুসলিম' হতো তাহলে কোন একটি দলের ব্যাপারে এ বিশ্লেষণের কোনই আবশ্যকতা ও যথার্থতা থাকে না যে তার নাম 'মুসলিম' রাখা হলো। এ জন্যে কোরআন পাকে যখনই অন্য কোন উম্মতকে মুসলিম বলা হয়েছে (যেমন প্রায়ই বলা হয়েছে) তখন বুঝতে হবে যে তা বলা হয়েছে অর্থের দিক দিয়ে। অথবা বলতে পারেন যে, সেটা গুণবাচক নাম। পারিভাষিক নাম ও উপাধি সেটা নয়।

পার্থক্যের কারণ

প্রশ্ন হতে পারে যে, এ পার্থক্যটা তাহলে কেন। হযরত মুহাম্মদের (সা) দ্বীনের মতো অন্যান্য নবীর 'দ্বীন'ও যখন আল্লাহ তায়ালারই প্রেরিত এবং এই দ্বীনের অনুসারীদের মতো তাঁদের অনুসারীগণও যখন আল্লাহ তায়ালার অনুগত ছিলেন, তখন শুধু এই একটি 'দ্বীনের' নাম 'ইসলাম' এবং তার অনুসারীগণের নাম 'মুসলিম' কেন হবে ? যদি প্রকৃতপক্ষে সমস্ত 'দ্বীন'গুলো ইসলামই ছিল এবং অন্য সব নবীর উম্মতও 'মুসলিম'ই ছিলেন, তাহলে তাঁদের সকলেরই নাম ও উপাধি 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' হলো না কেন ?

তার জবাব হচ্ছে এই যে, নাম রাখার সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ নীতির ভিত্তিতেই তা করা হয়েছে। অযথা করা হয়নি।

সে নীতিটি হচ্ছে এই যে, একই গুণ যদি একাধিক মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় এবং যদি মনে করা হয় যে, এই গুণ কোন ব্যক্তির নাম এবং উপাধি হয়ে যাক, তাহলে তার জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি সেইতো হবে যার মধ্যে এ গুণ আছে অন্যান্যের তুলনায় সবচেয়ে বেশী। কারণ কোন গুণ কোন ব্যক্তির নাম ও উপাধি হয়ে যাওয়ার অর্থ হলো এই যে, সে ব্যক্তির মধ্যে উক্ত গুণ পাওয়া যায় পরিপূর্ণ রূপে। অন্যের মধ্যে সে গুণ দেখা গেলেও তা অতটা নয়। বরঞ্চ এ দিক দিয়ে সে এতটা পেছনে পড়ে থাকে, যেমন সূর্যের তুলনায় নক্ষত্র হয়ে পড়ে জ্যোতিহীন।

যেমন ধরুন 'সিদ্দীকিয়ত' (বিশ্বাসভাজনতা) এমন একটি গুণ যা অনেক মানুষের মধ্যেই পাওয়া যায়। কিন্তু 'সিদ্দিক' শব্দটি উপাধি হিসেবে কেবলমাত্র হযরত আবু বকরের (রা) জন্যে নির্দিষ্ট। এর তো এ অর্থ হতে পারে না যে, সিদ্দীকিয়ত বা বিশ্বাসভাজনতার মর্যাদায় শুধুমাত্র তিনিই অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং অন্যান্য সাহাবা তার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। বরঞ্চ এসব সাহাবাদের মধ্যে

www.pathagar.com

এমন ব্যক্তিও ছিলেন যাঁর সম্পর্কে নবী (সা) এরূপ মন্তব্য করেছেন যে, যদি নবুয়াত খতম না হতো তাহলে তিনি নবী হতেন। অতএব নিশ্চিত করে বলা যায় যে, এই মহান দলটিতে একজন, দু'জন নয়, বরঞ্চ অগণিত 'সিদ্দিক' ছিলেন। তাহলে কি কারণ থাকতে পারে যে, 'সিদ্দিক' উপাধিতে ভূষিত হবার মর্যাদা শুধু আবু বকরই (রা) লাভ করলেন ? অবশ্য অবশ্যই তার কারণ এ ছাড়া আর কিছু নয় যে, তিনি 'সিদ্দীকিয়তের' গুণে ছিলেন সকলের অগ্রে। ইতিহাস, জীবন চরিত এবং হাদীসের পৃষ্ঠাগুলো তার সাক্ষ্য বহন করে।

এ নীতিকে সামনে রেখে শেষ নবীর (সা) 'দ্বীন' এবং অন্য নবীগণের 'দ্বীনের' ব্যাপারে চিন্তা করে দেখুন। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, যদিও সকল দ্বীনই অর্থের দিক দিয়ে ইসলামই ছিল, কিন্তু যে দ্বীন কোরআনের রূপ নিয়ে এবং শেষ নবীর মাধ্যমে এ দুনিয়ায় এলো, অধিকার ও যোগ্যতা একমাত্র তারই যে তার নামটা হবে 'ইসলাম'। কারণ তার ইসলামিয়াত অন্য সকল দ্বীনের ইসলামিয়াত থেকে অনেক বেশী অগ্রসর। এবং অন্যান্যের তুলনায় সে নিশ্চিতরূপে এক উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী।

অন্যান্য দ্বীনের অবস্থা এই যে, তাদের আইন-কানুন, হুকুম-আহকামের সমষ্টি তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত ও সীমিত। তাদের দাওয়াত প্রচারের গণ্ডিও ছিল সীমিত। তদুপরি সেসব কার্যকর থাকার কালও ছিল সীমিত। পক্ষান্তরে এই শেষ দ্বীনের হুকুম আহকামের সমষ্টি হলো বিশদ ও সর্বব্যাপী। তার প্রচার প্রসারের ক্ষেত্র সীমাহীন। তার প্রয়োগকাল সীমাহীন। অর্থাৎ সকল কাল ও যুগে তা সমানভাবে প্রযোজ্য। তার দাওয়াতের ক্ষেত্র বিশ্বজাহান। তার শরীয়তি বিধানের ধারা প্রকৃতি মানবতার সাধারণ অবস্থা ও প্রবণতার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। তার শিক্ষা সমগ্র মানবজাতির জন্যে একটা পূর্ণাংগ ও উৎকৃষ্ট জীবন বিধানের সাথে সন্নিবেশিত। হযরত আদমের (আ) কাল হতে আল্লাহ তায়ালার যেসব হেদায়েত ও নিয়ামত অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়েছিল এই দ্বীন তার পূর্ণ পরিণতি। অবস্থা যখন এই, তখন ন্যায়নীতি এবং ন্যায় বিচারের দৃষ্টিতে 'ইসলাম' শুধুমাত্র এই সর্বশেষ, সাধারণ ও সর্বব্যাপী এবং সবচেয়ে পূর্ণাংগ দ্বীনের নামই হতে পারে।

এভাবে অন্যান্য উম্মত ব্যতীত শুধু নবী মুহাম্মদের (সা) অনুসারীদেরকে 'মুসলিম' নাম ও উপাধি এ জন্যে দেয়া হয়েছে যে, তাদের মুসলমানিত্বের গুণপনা অন্যান্যের তুলনায় ছিল অনেক বেশী। তাঁরা এমন দ্বীনের আমলবরদার ছিলেন, যা ছিল সর্বব্যাপী, যার উদ্দেশ্য ছিল অতীব মহান ও অনুপম। তাঁদের প্রতি এ গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল যে, তাঁরা এক একটি করে প্রতিটি জাতির কাছে সে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেবেন। সমগ্র দুনিয়ার সামনে ইসলামের

www.pathagar.com

সাক্ষ্যদান করবেন এবং দুনিয়ার সর্বত্র দ্বীনে হক প্রতিষ্ঠার পূর্বে সংগ্রাম থেকে নিবৃত্ত হবেন না। পক্ষান্তরে এ ধরনের গুরুদায়িত্ব অন্য কোন উম্মতের উপর অর্পিত হয়নি। অতএব সংগত কারণেই তাঁদেরকে বলা হয়েছে "খায়রুল উমাম"—সকল উম্মতের সেরা এবং 'মুসলিম' নাম তাঁদের জন্যেই নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

এ বিশদ আলোচনায় জানা গেল যে, গোটা সৃষ্টিজগত সৃষ্টিগতভাবে এবং বাধ্যতামূলকভাবে 'মুসলিম' এবং শরীয়তগতভাবে সব নবীর উম্মতই 'মুসলিম' ছিলেন। এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত প্রত্যেক দ্বীনও ছিল ইসলাম। কিন্তু 'ইসলাম' এবং 'মুসলিম' শব্দদ্বয় যখন সাধারণভাবে বলা হয়, তখন শেষ নবীর প্রচারিত দ্বীনকেই বলা হয় 'ইসলাম' এবং তাঁর অনুসারী উম্মতকে বলা হয় 'মুসলিম'।

www.pathagar.com

বুনিয়াদী আকায়েদ

যেসব শিক্ষার উপরে ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, মৌলিক ও ব্যবহারিক উভয় দিক দিয়ে তার গুরুত্বের স্তর পৃথক পৃথক। তাদের মধ্যে আবার একটা স্বাভাবিক ক্রমবিন্যাসও দেখতে পাওয়া যায়। সে সবের মধ্যে কোনটা ভিত্তি, কোনটা দেয়াল, কোনটা স্তম্ভ, কোনটা ছাদ এবং কোনটা বাহ্যিক অংগসজ্জার ন্যায়। ইসলামকে সঠিকভাবে জানতে বুঝতে হলে, এই ক্রমবিন্যাস সহকারে তা অধ্যয়ন করতে হবে। সে জন্যে তার যেসব শিক্ষাকে ভিত্তি বলা হয়েছে, প্রথম তারই আলোচনা করা যাক। ইসলামের পরিভাষায় তাকে বলা হয়েছে, 'ঈমানিয়াত' ও 'আকায়েদ'।

ঈমান এবং আকীদাহ যে দ্বীনের ভিত্তি তা এত সুস্পষ্ট যে, এর জন্যে যুক্তি প্রমাণাদির দরকার করে না। সকলেরই জানা আছে যে, ঈমানিয়াত হলো এলম (জ্ঞান) এবং অবশিষ্ট সমস্ত কিছুই আমল। আমলের পূর্বে এলমের স্থান। এলম একটি বীজ এবং আমল হলো তার থেকে উৎপন্ন বৃক্ষ। বীজ ব্যতীত যেমন বৃক্ষের অস্তিত্ব চিন্তা করা যায় না, ঠিক তেমনি এলমের অভাবে আমলও সম্ভব হতে পারে না। এ জন্যে যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমানিয়াত ও আকায়েদ ঠিক না হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কোরআন পাক ঘোষণা করে ঃ

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ج

"বরঞ্চ আসল পুণ্য কাজ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির যে ঈমান আনে আল্লাহর উপরে, আখেরাতের উপরে, ফেরেশতাদের উপরে, আসমানী কেতাবসমূহের উপরে এবং সমস্ত নবীর উপরে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৭)

এখন জানা গেল যে, ঈমানিয়াত ব্যতীত নেক আমলের কোন সম্ভাবনা নেই। ইসলামের এই ঈমানিয়াত ও আকায়েদ কি তা উপরের আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে। এ আয়াত এবং অন্যান্য আয়াতের দৃষ্টিতে ঈমানিয়াত আকায়েদ পাঁচটি। যথা–

- আল্লাহর উপরে ঈমান।
- আখেরাতের উপরে ঈমান।
- নবীগণের উপরে ঈমান।
- ফেরেশতাগণের উপরে ঈমান।
- আল্লাহর অবতীর্ণ কেতাবসমূহের উপরে ঈমান।

www.pathagar.com

কিন্তু হাদীস থেকে জানা যায় যে, আরও একটি বিষয় আছে যা আকায়েদের মধ্যে শামিল। সেটা হচ্ছে তকদীরের উপর ঈমান। হাদীসে জিব্রিলে বলা হয়েছে ঃ

اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ (مسلم)

"(ঈমান হচ্ছে এই যে,) তুমি ঈমান আনবে আল্লাহর উপরে, তাঁর ফেরেশতাদের উপরে, তাঁর প্রেরিত কেতাবসমূহের উপরে, তাঁর রসূলগণের উপরে আখেরাতের উপরে এবং তাকদীরের ভাল-মন্দের উপরে।"

মনে রাখতে হবে যে, কোরআন এবং হাদীসের বর্ণনার মধ্যে কোন গরমিল নেই। শুধু একটু বিশদ বিশ্লেষণের পার্থক্য মাত্র। অর্থাৎ তকদীরের উপরে ঈমান প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর উপরে ঈমানেরই একটা অংশ বিশেষ। এ জন্যে কোরআনে তা পৃথক করে বলা হয়নি। বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে হাদীসে তা অতিরিক্তভাবে বলে দেয়া হয়েছে। যা হোক এ এক অনিবার্য সত্য যে, আল্লাহর অন্যান্য গুণাবলী ও তার চাহিদার উপরে ঈমান আনার ন্যায় তকদীরের উপরে ঈমানও অত্যাবশ্যক।

এই হলো ইসলামের ছয়টি আকায়েদ যার উপর তার পূর্ণ শরীয়তী ব্যবস্থার প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু বিচার বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে, এসব আকায়েদের মধ্যে সব কয়টির গুরুত্ব এক রকম নয়। কারো বেশী, কারো কম। মোটামুটি ভাগ করলে জানা যাবে যে, প্রথম তিনটি বুনিয়াদী গুরুত্বের অধিকারী। বাকী তিনটি তার দাবী পূরণ করতে এসেছে ; অথবা তার শাখার ন্যায়। এ জন্যে প্রথম তিনটি যদি ভালোভাবে বুঝতে পারা যায় তাহলে সমগ্র বিষয় বুঝার জন্যে তা হবে যথেষ্ট।

১. আল্লাহর উপরে ঈমান

আল্লাহর উপরে ঈমান আনার অর্থ

০ আল্লাহর উপর ঈমান আনার অর্থ হলো তাঁর অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

০ কোরআন এবং হাদীসে আল্লাহ তায়ালার যেসব গুণাবলীর বিশদ বিবরণ আছে, আল্লাহকে সেসব গুণে পূর্ণ গুণান্বিত বলে বিশ্বাস করা।

www.pathagar.com

০ আল্লাহর গুণাবলী অবশ্যম্ভাবী রূপে তাঁকে যে এখতিয়ার দান করে তা একমাত্র আল্লাহরই জন্যে নির্দিষ্ট—একথা বিশ্বাস করা।

০ আল্লাহর গুণাবলীর সাথে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কিছু অধিকারও জড়িত আছে। এসব অধিকার ও বিশ্বাস করতে হবে। নতুবা তাঁর গুণাবলীর উপর বিশ্বাস হয়ে পড়বে সম্পূর্ণ অর্থহীন।

এক নম্বরে বর্ণিত বিষয়টিত অতি সুস্পষ্ট। এ জন্যে এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ আল্লাহর অস্তিত্বই স্বীকার করে না সে তাঁর উপরে ঈমান কিভাবে আনবে?

অবশ্যি অবশিষ্ট বিষয়গুলো প্রথমটির মতো এত সুস্পষ্ট নয়। তাই এসবের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। অতএব এসবের বিস্তারিত আলোচনা করা যাক এবং বলে দেয়া হোক যে, আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী কি কি? তাঁর সে গুণাবলীর দাবীই বা কি কি?

আল্লাহর সব গুণাবলী কিন্তু আবার একই ধরনের নয়। কয়েকটি গুণ এমন (একটিও বলা যায়) যা অন্যগুলোর উপরে প্রভাব বিস্তারকারী। অবশিষ্ট গুণাবলী প্রথম কয়েকটি হতে উদ্ভূত। অথবা শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত। এ জন্যে প্রথমোক্ত কয়টির প্রয়োজনানুরূপ বিশ্লেষণ হয়ে গেলে অবশিষ্ট গুণাবলী আলোচনার প্রয়োজন হবে না। এবং এতটুকুতে বুঝতে পারা যাবে যে, আল্লাহর উপর ঈমান রাখার জন্য কোন্ ধরনের গুণাবলীর অধিকারী তাঁকে মনে করতে হবে। এ কারণেই সেইসব মৌলিক গুণ কয়টির এবং তার প্রয়োজনীয় দাবীর আলোচনা সামনে করা হচ্ছে।

আল্লাহ তায়ালার বুনিয়াদী এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী ঃ

০ তিনি অনাদি। তিনি অনন্ত। তিনি এক অনিবার্য চিরস্থিতিশীল সত্তা। অর্থাৎ তিনি অনন্তকাল থেকে আছেন এবং অনন্তকাল থাকবেন। তাঁকে কেউ সৃষ্টি করেনি। বরঞ্চ তিনি আপনা আপনিই অস্তিত্ববান।

০ তিনি স্রষ্টা। অর্থাৎ তিনি যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করে থাকেন। প্রত্যেককে তার অস্তিত্বহীনতার শূন্যতা থেকে তিনি সৃষ্টি করেন।

০ তিনি প্রভু পরোয়ারদেগার। অর্থাৎ তিনি জীবিকাদাতা ও পালনকর্তা।

০ তিনি বাদশাহ ও বিচারক। প্রতিটি সৃষ্টি তাঁর বাদশাহীর এবং বিচার শাসনের অধীন।

০ তিনি সর্বজ্ঞানী। অর্থাৎ প্রতিটি কথা, কাজ এবং প্রতিটি গতিবিধি তাঁর জানা। যা হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে—সবই তাঁর জানা আছে, কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের অগোচর নয়।

www.pathagar.com

০ তিনি পরম বিজ্ঞ। তাঁর কোন কাজ হিকমতের খেলাফ নয়, উদ্দেশ্য বিহীন ও অনর্থক নয়। বরঞ্চ তাঁর প্রতিটি কাজের মধ্যে বিজ্ঞতা, পরিপূর্ণ হিকমত ও মহানতম উদ্দেশ্য নিহিত আছে।

০ তিনি সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী। তিনি প্রতিটি কাজ করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। তাঁর কোন ইচ্ছা পূরণে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে না তাঁর কোন সিদ্ধান্ত কেউ বাতিল করতে পারে না। তাঁর কোন আদেশ কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারে না।

০ তিনি অত্যন্ত ন্যায় বিচারক। তার প্রতিটি কাজ ন্যায় বিচারের উপরে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সৃষ্টিগত আহকাম এবং শরীয়তী আহকাম উভয়ই ন্যায়নীতি ভিত্তিক। তাঁর প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তই সঠিক ইনসাফের ভিত্তিতে হয়।

০ তিনি প্রতিদান দাতা। অর্থাৎ প্রত্যেক কাজের প্রতিদান তিনি দেন। ভাল কাজের ভালো প্রতিদান। মন্দ কাজের মন্দ প্রতিদান।

০ তিনি ইলাহ বা মা'বুদ। অর্থাৎ তিনি একমাত্র উপযুক্ত সত্তা যাঁর স্তবস্তুতি, পূজা অর্চনা করা যায়। তাঁরই সামনে আনুগত্যের মস্তক অবনত করা যায়। যাকিছু চাওয়ার তা একমাত্র তাঁরই কাছে চাওয়া যেতে পারে।

০ তিনি এক ও একক। অর্থাৎ তাঁর যত গুণ আছে তার মধ্যে কোন একটিতেও তাঁর সংগে অন্য কেউ শরীক অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তিনি যে শুধু চির শাশ্বত, স্রষ্টা, পালক প্রভু, বাদশাহ ও বিচারক, জ্ঞানী ও বিজ্ঞ, পরাক্রান্ত ও পরাক্রমশালী, ন্যায় বিচারক, প্রতিদানদাতা ও মা'বুদ তাই নয়। বরঞ্চ তিনিই একমাত্র এসব গুণের অধিকারী।

আল্লাহ তায়ালার উপরোক্ত বুনিয়াদী গুণাবলীর মধ্যে শেষের গুণ যাকে তওহীদের গুণ বলে, একটা বিশিষ্ট গুরুত্ব রাখে।

সমগ্র ইসলামের প্রাণ যেমন তার আকীদাসমূহ, তেমনি আকীদাসমূহের প্রাণ হলো তওহীদের আকীদা। বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে জানতে পারা যাবে যে, এই তওহীদের গুণটি অন্যান্য সমগ্র গুণাবলীরই এক পূর্ণ বিকাশ। এ জন্যে এই একটি গুণ প্রকৃতপক্ষে সমগ্র গুণাবলীর প্রতিনিধিত্ব করে। যে ব্যক্তি সজ্ঞানে এবং দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে একথা ঘোষণা করলো যে, আল্লাহই একমাত্র মা'বুদ সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় গুণাবলীর উপর চাক্ষুস বিশ্বাসের ঘোষণা করলো। তওহীদী গুণের এই বিশিষ্ট ও সর্বব্যাপী মর্যাদাকে সম্মুখে রাখলে আর এ প্রয়োজন থাকে না যে, অন্যান্য গুণাবলীর চাহিদা বর্ণনা করতে হবে এবং তাদের প্রত্যেকটির পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করতে হবে।

www.pathagar.com

তার পরিবর্তে এই একটি গুণের চাহিদা জানতে পারলেই যথেষ্ট হবে। এ জন্যে এখানে আলোচনা। এ গুণটির চাহিদা বর্ণনার মধ্যেই সীমিত থাকবে।

কোরআন হাদীসের ঘোষণা অনুযায়ী তওহীদী আকীদার গুরুত্বপূর্ণ ও বুনিয়াদী চাহিদা নিম্নরূপ ঃ

০ আল্লাহ ব্যতীত এমন আর কোন সত্তা নেই যে আপনা আপনি অস্তিত্ববান। বরঞ্চ প্রতিটি পদার্থ আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি। اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ প্রতিটি পদার্থ তাঁরই মালিকানার অধীন। তার নিজস্ব কোন গুণ নেই। যাকিছু আছে তা আল্লাহরই দেয়া। সে গুণটুকু তার মধ্যে ততোক্ষণই অবশিষ্ট থাকবে, যতোক্ষণ আল্লাহ তা রাখতে চান।

০ আল্লাহ তায়ালার সত্তা যাবতীয় পদার্থ থেকে অন্যরূপ। কোন কিছুই কোন প্রকারে তাঁর মতো নয়।

০ কেউ যত বড়োই হোক না কেন, খোদার সাথে তার কোন তুলনাই হতে পারে না।

০ তিনি কারো পিতাও নন পুত্রও নন।

০ না তিনি কোন সত্তার সাথে একত্র হতে পারেন, আর না মিশে একাকার হয়ে যেতে পারেন।

০ তাঁর কোন শরীরও নেই এবং শরীর সম্পর্কিত গুণাবলীও নেই।

০ আল্লাহ তায়ালাই এমন এক সত্তা যাঁর সন্তুষ্টির জন্যে মানুষের চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। মানুষের প্রতিটি কাজের প্রেরণার মধ্যে থাকতে হবে খোদার সন্তুষ্টি লাভ এবং কাজের উদ্দেশ্যও হতে হবে তাই।

০ স্তব স্তুতি ও পূজা-অর্চনামূলক সকল কার্যকলাপ ও গতিবিধি একমাত্র আল্লাহরই জন্যে নির্দিষ্ট হতে হবে। সেজদা কেবলমাত্র তাঁকেই করা যেতে পারে। যত প্রকার নযর নিয়ায তা সবকিছু তাঁর নামেই হতে হবে। দোয়া তাঁর কাছেই করতে হবে। আশ্রয় তাঁরই কাছে চাইতে হবে। গায়েবী মদদের জন্যে একমাত্র তাঁকেই ডাকতে হবে।

০ দাসত্ব আনুগত্যে প্রেরণা ও অনুভূতি একমাত্র তাঁরই জন্যে নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। একমাত্র তাঁর উপরই তাওয়াক্কুল করতে হবে। তাঁকেই সকল প্রকার আশা-ভরসার স্থল মনে করতে হবে। তাকওয়া, ভয়-ভীতি, প্রকৃত মহব্বত একমাত্র তাঁরই জন্যে হতে হবে।

০ আল্লাহ তায়ালার অসীম ও অনন্ত সৃষ্টিজগতের একটি ক্ষুদ্র অংশ আমাদের এই পৃথিবী। এ সবের সর্বময় কর্তা একমাত্র তিনি। আদেশ-নিষেধের এবং আপন মরযী পূরণের অধিকার তাঁর। প্রকৃত আইন বিধান রচনাকারী

www.pathagar.com

তিনি। কোন সৃষ্টির কর্তব্য ও দায়িত্ব নির্ধারণের তার সম্পর্কে কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের, ক্ষমা করা অথবা শাস্তিদানের পূর্ণ এখতিয়ার একমাত্র তাঁর।

০ আল্লাহ ব্যতীত এমন আর কেউ নেই, যে মা'বুদ হওয়ার যোগ্যতা রাখে, যে অর্চনার যোগ্য, যার সন্তুষ্টি কামনা করা যেতে পারে। আর কেউ এমন যোগ্য নেই যার সামনে মাথা অবনত করা যেতে পারে। যার নামে নযর নিয়ায পেশ করা যেতে পারে ; যার অফুরন্ত দানের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা যায়। আর এমন কেউ নেই যাকে বন্ধু, অভিভাবক ও কার্যসিদ্ধিকারী, অভাব অভিযোগ পূরণকারী এবং বিপদ হরণকারী ও ত্রাণকর্তা মনে করা যেতে পারে, যার কাছে দোয়ার জন্যে হস্ত প্রসারিত করা যেতে পারে, কোন কিছু কামনা করা যেতে পারে, গায়েবী মদদের জন্যে ডাকা যেতে পারে। এমন আর কেউ নেই যার উপর তাওয়াক্কুল করা যেতে পারে, অন্তরে যার জন্যে ভয়-ভীতি ও তাকওয়া রাখা যেতে পারে, যাকে আশা-ভরসাস্থল মনে করা যেতে পারে এবং যার জন্যে হৃদয়ে প্রকৃত ভালোবাসা পোষণ করা যেতে পারে। এমন আর কেউ নেই, যার হস্তে সামান্য পরিমাণও কর্তৃত্ব প্রভুত্ব থাকতে পারে, যে কারো সামান্য পরিমাণও লাভ-নোকসান করতে পারে, যে কারো জন্যে আইন-কানুন রচনা করতে পারে, হুকুম শাসন চালানোর কোন অধিকার রাখে এবং যার নিরংকুশ আনুগত্য দাসত্ব জায়েয হতে পারে।

তওহীদের এসব বুনিয়াদী চাহিদা এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে, তার যে কোন একটি অস্বীকার করলে আল্লাহর উপর ঈমান রাখার দাবী অর্থহীন হয়ে পড়ে। তার অর্থ এই যে, এ সবকিছুই তওহীদী আকীদার প্রকৃত মর্মের অন্তর্গত। কোন মানুষই প্রকৃত অর্থে মুসলমান হতে পারে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত এ আকীদাহ তার এবম্বিধ মর্ম ও তাৎপর্য সহ তার অন্তরে প্রবেশ না করেছে।

শির্ক

অন্তরের মধ্যে কোন একটি বিষয়ের ধারণা তখনই সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়, যখন তার বিপরীত ধারণটাও সংগে সংগে বলে দেয়া হয়। এ জন্যে গুরুত্বপূর্ণ কোন মৌলিক নীতি ও মতবাদ বিশ্লেষণের সময় সাধারণতঃ এটাও প্রয়োজন মনে করা হয় যে, তার বিপরীত মতবাদকেও তার পাশাপাশি রেখে দিতে হবে।

তওহীদী আকীদাহ অপেক্ষা কোন্ মতবাদ ও আকীদাহ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে ? এ জন্যে প্রয়োজন তার বিপরীত মতবাদ অর্থাৎ শির্ককেও বুঝে নেয়া। যেমন ধারা কোরআন পাক তার কার্যপদ্ধতির দ্বারা আমাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করেছে।

www.pathagar.com

তওহীদের শিক্ষা দেবার সময় শুধু এতটুকু বলেই শেষ করা হয়নি যে, তওহীদ কাকে বলে এবং তার যুক্তি প্রমাণাদি তার মংগল ও ফলাফল এই। বরঞ্চ বিশদভাবে কথা বলাও প্রয়োজন মনে করা হয়েছে যে, শির্ক কাকে বলে, তার কার্যাবলী কি, তা চিনার উপায় কি এবং কেন তা একটা নির্ঘাৎ ভিত্তিহীন ও ভ্রান্ত মতবাদ। এমন কি তওহীদের ধারণা শিক্ষা দিতে গিয়ে যে নীতি বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে তওহীদের স্বীকৃতি ও শির্কের অস্বীকৃতি এক সংগে দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ কথা এভাবে বলা হয়নি যে, 'আল্লাহ একাই মাবুদ।' বরঞ্চ বলা হয়েছে, 'নেই কোন মাবুদ আল্লাহ ব্যতীত।' لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

এ বর্ণনা ভংগিতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তওহীদের অবিমিশ্র ধারণা হতেই পারে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত শির্ক পরিপূর্ণ রূপে অস্বীকার করা না হয়েছে। এখন শির্কের অস্বীকৃতি বা পরিহার আবশ্যক বিধায় তা হৃদয়ংগম করাও অবশ্য প্রয়োজন।

শির্কের অর্থ কোন কিছুর অংশীদার মনে করা। আল্লাহ তায়ালার সত্তা অথবা তাঁর গুণাবলীর অপরিহার্য চাহিদার মধ্যে কাউকে অংশীদার করাকে দ্বীনের পরিভাষায় বলা হয় শির্ক।

শির্ক তিন প্রকারের ঃ

এক প্রকারের শির্ক যা আল্লাহ তায়ালার সত্তার সংগে করা হয়।

দ্বিতীয় প্রকারের শির্ক তাঁর গুণাবলীর অংশীদার মনে করা।

তৃতীয় প্রকারের শির্ক গুণাবলীর অপরিহার্য চাহিদার মধ্যে কাউকে অংশীদার করা।

প্রথম ধরনের শির্কের বাস্তব রূপ হবে নিম্নরূপ ঃ

০ কাউকে আল্লাহ তায়ালার মতো সত্তা মনে করা।

০ কাউকে তাঁর পিতা অথবা সন্তান মনে করা।

০ এমন মনে করা যে, তিনি অন্য কোন সত্তার সাথে মিলে একীভূত হয়ে আছেন।

০ এমন ধারণা পোষণ করা যে, তিনি অন্য কোন সৃষ্টির আকৃতি ধারণ করে আবির্ভূত হবেন। অর্থাৎ কোন সৃষ্টি তাঁর অবতার হতে পারবে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আরববাসী ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তায়ালার কন্যা এবং জ্বিন জাতিকে তাঁর ভ্রাতা ও জ্ঞাতিগুষ্ঠি মনে করতো। এমনিভাবে খৃষ্টানগণ হযরত ঈসাকে (আ) আল্লাহর একমাত্র পুত্র এবং তাঁর অবতার মনে করে। এসব কিছুই শির্ক বিযযাত অর্থাৎ তাঁর সত্তার সংগে শির্ক করা।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় ধরনের শির্কের বাস্তব রূপ হলো এই যে, আল্লাহ যেসব গুণে গুণান্বিত, তার যে কোন একটি গুণ অন্য কারো মধ্যে আছে এমন মনে করা। তা যে অর্থে আল্লাহ তায়ালার মধ্যে পাওয়া যায় সেই অর্থেই অন্যের মধ্যে বিদ্যমান মনে করা। যেমন ধরুন, 'এল্‌ম আল্লাহ তায়ালার একটি গুণ। তার যথার্থ মর্ম এই যে, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সবকিছু তিনি জানেন। অতীত ভবিষ্যত সবই তাঁর কাছে বর্তমান। এখন যদি কেউ মনে করে যে, অমুক ব্যক্তি এই ধরনের জ্ঞান রাখে তাহলে সেটা হবে শির্ক বিসসিফাৎ অর্থাৎ গুণাবলীর শির্ক করা। এমনিভাবে কাউকে লাভ-নোকসানের সম্মুখীন করাও আল্লাহর একটি গুণ। যার সার কথা এই যে, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে আনন্দ ও শান্তির সামগ্রী দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে তার থেকে বঞ্চিত করেন। এখন যদি কোন ব্যক্তি এমন ধারণা বিশ্বাস রাখে যে, অমুক ফেরেশতা অথবা জ্বিন অথবা কোন বুযর্গ মানুষ আমাদের ভাগ্যের ভাঙা-গড়া করতে পারে, অথবা দুঃখ-কষ্ট ও ক্ষতির সম্মুখীন করতে পারে, তাহলে সে তাকে আল্লাহ তায়ালার একটা গুণের অংশীদার মনে করলো। কাজটা হবে তার শির্ক বিসসিফাৎ।

তৃতীয় ধরনের শির্কের বাস্তব রূপ এই যে, আল্লাহর গুণাবলীর কিছু অনিবার্য চাহিদা আছে। এ সবগুলোকে একমাত্র আল্লাহরই জন্যে নির্দিষ্ট মনে না করা। এগুলোকে অথবা এর যে কোন একটিকে অন্য কারো জন্যে সংগত মনে করা। যেমন আল্লাহর গুণাবলীর একটা চাহিদা এই যে, সত্যিকার আনুগত্য ও প্রেম ভালোবাসা একমাত্র আল্লাহরই হক। এখন যদি কেউ কারো প্রতি এই ধরনের ভালোবাসা রাখে, অথবা কাউকে এই ধরনের আনুগত্যের যথার্থ যোগ্য মনে করে, তাহলে আল্লাহর গুণাবলীর চাহিদার সাথে অন্যকে শরীক করা হলো। এরূপভাবে তাঁর গুণাবলীর আর একটি চাহিদা এই যে, কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব ও হুকুম শাসন একমাত্র তাঁরই হাতে। হুকুম শাসন করার, আইন রচনা করার অধিকার একমাত্র তাঁরই। অতএব যদি কেউ অন্য কাউকে এ অধিকার দান করে, সে একজন ব্যক্তি হোক অথবা ব্যক্তির সমষ্টি হোক, তাহলে তাও শির্ক বলে গণ্য হবে।

এই তিন প্রকারের শির্কের বর্তমানে তওহীদের ইসলামী আকীদাহ আর টিকে রইলো না। আর যেখানে তওহীদ থাকে না সেখানে ঈমানও থাকে না। ঈমান না থাকলে ইসলামের অস্তিত্বর কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। এ জন্যে কোরআনে শির্ককে সবচেয়ে বড় জুলুম বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ (لقمان : ١٣)

আল্লাহ বলেন ঃ

www.pathagar.com

اِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ۚ (نساء : ٤٨)

"আল্লাহ ইচ্ছা করলে সব গুনাহ মাফ করবেন। কিন্তু শির্কের গুনাহ মাফ করবেন না।"-(সূরা আন নিসা ঃ ৪৮)

বিবেককে স্বীকার করতে হবে যে, এর চেয়ে ন্যায়সংগত কথা আর কিছু হতে পারে না।

২. আখেরাতের প্রতি ঈমান

আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার অর্থ

আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার অর্থ এই যে, নিম্নে বর্ণিত তথ্যসমূহ অন্তর দিয়ে মেনে নেয়া ঃ

০ মানুষের জন্ম একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে হয়েছে। সে একটা দায়িত্বশীল সত্তা। তার স্রষ্টা তাকে জীবন যাপনের একটা পূর্ণাংগ নির্দেশনামাসহ পয়দা করেছেন। তদানুযায়ী আমল করাই হলো তার জন্যে অত্যন্ত সংগত এবং পুণ্য কাজ, আর তা পরিত্যাগ করে নিজের ইচ্ছামত পথ অবলম্বন করা পথভ্রষ্টতা এবং পাপ।

০ মানুষের জীবন মৃত্যুর সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায় না। বরঞ্চ তারপরও ক্রমাগত চলতেই থাকবে। এ দুনিয়ার জীবনে যে যাকিছু করে, তা যদিও বস্তুজগতের পরিণাম হিসেবে এখানেই শেষ হয়ে যায়, কিন্তু নৈতিক পরিণাম হিসেবে সবকিছুই বাকি থেকে যায়। এমন একদিন আসবে যেদিন আল্লাহ তায়ালার হিকমত ও ইচ্ছা অনুযায়ী আসমান যমীনের এই সমগ্র কারখানা ওলট পালট হয়ে যাবে। অতপর এ যমীনের উপরে একটি প্রাণীও জীবিত থাকবে না। মৃত্যুর মহানিদ্রায় সব ঢলে পড়বে। কোরআনের পরিভাষায় একে বলে 'কিয়ামত'।

০ কিয়ামত সংঘটিত হবার পর পৃথিবীর শুরু থেকে আরম্ভ করে কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যত প্রাণী জন্মগ্রহণ করে মৃত্যুবরণ করছে, তাদের সকলকে আবার পুনর্জীবিত করে একত্র করা হবে। একে বলে 'হাশর'।

০ হাশরের পরে আমাদের জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হবে। এ অধ্যায়ের সূচনা এভাবে হবে যে, আমাদের সকলকে আল্লাহ তায়ালার আদালতে পেশ করা হবে। তিনি তখন আমাদের দুনিয়ার জীবনের হিসাব নেবেন। সে সময়ে আমাদের পাপ-পুণ্যের পুংখানুপুংখ রেকর্ড আমাদের সামনে রাখা হবে। ন্যায়ের দাঁড়িপাল্লা খাটানো হবে। প্রত্যেকের আমল কাঁটায় কাঁটায় পরিমাপ

www.pathagar.com

করা হবে। যে ভাগ্যবানের আমল ভারি প্রমাণিত হবে এবং যার আমলনামা হবে নেকীর আমলনামা, তার জীবনের এই দ্বিতীয় অধ্যায় অতিবাহিত করার জন্যে তাকে দেয়া হবে এমন একস্থান যা হবে নিয়ামতে পরিপূর্ণ। সে নিয়ামত হবে অগণিত ও অফুরন্ত। যার কল্পনা এই দুনিয়ায় করা কিছুতেই সম্ভব নয়। সেসব নিয়ামত লাভের পর মানুষের আর কিছুই কামনা করার থাকবে না। এ স্থানের নাম 'জান্নাত'। যে হতভাগ্যের অবস্থা এর বিপরীত হবে, যার আমলনামা হবে পাপের আমলনামা, যে তার জীবনের প্রথম অধ্যায় গাফলতি এবং অসত্য আচরণের ভেতর দিয়ে অতিবাহিত করে আল্লাহর সামনে হাযীর হয়েছে তাকে তার জীবনের এ অধ্যায় যাপন করার জন্যে এমন এক স্থান দেয়া হবে যা হবে বর্ণনাতীত দুঃখ কষ্টে পরিপূর্ণ। দুঃখ কষ্ট কখনো এবং কোন কালে শেষ হবে না। এ স্থানের নাম জাহান্নাম।

০ এ হিসাব নিকাশ এবং সিদ্ধান্তের পর আমাদের জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়টি তার পরিপূর্ণরূপ নিয়ে অস্তিত্ব লাভ করবে। এ হবে এক অনন্ত কালের অধ্যায়। এ জীবন হবে চিরন্তনের জীবন। এখন মৃত্যুর আর কোন নাম নিশানা থাকবে না।

যা কিছু বলা হলো এই হলো 'আখেরাত'। আর এই হলো আখেরাতের উপর ঈমান আনার অর্থ।

আখেরাতের উপর ঈমান আনার গুরুত্ব

মুমেন হওয়ার জন্যে এটা অপরিহার্য যে, যেমন সে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, তেমনি আখেরাতের উপরেও তাকে ঈমান আনতে হবে। এছাড়া একজন কিছুতেই মুমেন ও মুসলিম হতে পারে না। আর আখেরাতের উপর ঈমান ব্যতিরেকে আল্লাহর উপর ঈমান অর্থহীন হয়ে পড়ে। তার কারণ এই যে, আখেরাত হওয়াটাও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালার বহু গুণেরই একটি জরুরী চাহিদা যেমন তার একটা গুণ হলো ন্যায় বিচারের। একটা হিকমতের, একটা রহমতের, একটা কৃতজ্ঞতাভাজনের এবং একটা বিচার শাসনের। কিয়ামত না হলে এবং মানুষের আমলের প্রতিদান না হলে এ একটা ভিত্তিহীন দাবীতে পরিণত হয় যে, এ দুনিয়ার স্রষ্টা একজন ন্যায় বিচারক, একজন মহাবিজ্ঞ ও ন্যায়নিষ্ঠ, একজন কৃতজ্ঞভাজন, একজন বাদশাহ ও শাসক। কারণ, মানুষের আমলের নৈতিক পরিণাম যেমন হওয়া উচিত, তাতে এ দুনিয়ায় দেখতে পাওয়া যায় না। যালেম অত্যাচারীকে এখানে সুখী ও সমৃদ্ধ দেখতে পাওয়া যায়। আর সত্যের অনুসারী যারা, তারা বোঝা বহন করে, দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ মুসিবতের। অতএব এ পার্থিব জীবনের শেষে এমন ব্যবস্থা যদি না থাকে যে, প্রত্যেকে তার কৃতকর্মের প্রতিফল পাবে, তাহলে এমন অদ্ভুত

www.pathagar.com

পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে যে, আল্লাহ তায়ালার ন্যায় বিচার, হিকমত, রহমত এবং বিচার শাসন অর্থহীন হয়ে পড়বে। অতএব আল্লাহর উপর ঈমান রাখা এবং কৃতকর্মের পুরস্কার অথবা শাস্তি অস্বীকার করা—এ দু'য়ের একত্রে শব্দের মালা গাঁথা যায় কিন্তু বাস্তব তত্ত্বের দিক দিয়ে উভয়কে একত্র করা যায় না।

শাফায়াতের মুশরেকী ধারণা

এ দুনিয়ার জীবনে কোন ব্যক্তি খোদার একজন দায়িত্বশীল বান্দাহ হিসেবে জীবন যাপন করেছে, যার জন্যে আখেরাতে সে বেহেশতী জীবন লাভ করবে, যার এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই হাতে।

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ ۚ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۚ (حج : ٥٦)

"সেদিন বাদশাহী একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। তিনি মানুষের ভবিষ্যত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।"–(সূরা আল হজ্জ ঃ ৫৬)

বিবেক যা বলে, প্রকৃত সত্যও তাই। যেমন ঃ

০ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সমগ্র সৃষ্টিজগতের মালিক ও বিচারক এ জন্যে কিছুতেই হতে পারে না যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার অন্য কারো হাতে থাকবে।

০ তিনি সর্বজ্ঞানী। আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সবকিছুরই তিনি সরাসরি জ্ঞান রাখেন। তিনি জানেন যে, দুনিয়ায় কে কি করেছে। তার হস্তদ্বয় কি অর্জন করেছে। তার মনের বাসনা কি ছিল। সে হৃদয়ে কোন্ ধরনের প্রেরণা পোষণ করতো। রাতের অন্ধকার বরং দিনের কর্মব্যস্ত মুহূর্তগুলো সে কিভাবে এবং কোন্ কাজে অতিবাহিত করেছে এ সবকিছুই তাঁর কাছে এমনই উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট যেমন আমাদের কাছে দুপুর বেলার সূর্য। এত সবের পর কোন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে তিনি অপরের মুখাপেক্ষী কিছুতেই হতে পারেন না। এ ব্যাপারে 'অন্য কারো' মতামত, পরামর্শ অথবা সাক্ষ্য গ্রহণের কোনই প্রয়োজন তাঁর নেই। বিশেষ করে এই যে, "অন্য কারো' বলা হলো, সেও তো এমন যে, সে তার নিজেরই অতীত ও ভবিষ্যতের কোনই জ্ঞান রাখে না। অতএব যার অতি সামান্য জ্ঞান আছে, বরঞ্চ বলতে গেলে যার কিছুই জ্ঞান নেই, সে কি করে প্রকৃত সত্য নির্ধারণে সর্বজ্ঞকে সাহায্য করতে পারে?

০ আল্লাহ ন্যায় বিচারক। অতএব এও হতে পারে না যে, কারো সুপারিশের উপরে এমন লোককে তিনি ক্ষমা করবেন যে ঈমান ও আমলের দিক দিয়ে নীতিগতভাবে ক্ষমা লাভের অযোগ্য। এতে করে ন্যায় বিচার করা হবে না। অতএব যেদিক দিয়েই দেখুন না কেন, এমন আশাব্যঞ্জক ধারণার ক্ষীণতম

www.pathagar.com

সম্ভাবনাও নেই যে, আখেরাতের সাফল্য ঈমান ও আমলের পরিবর্তে কোন বুযর্গ ব্যক্তির উপর নির্ভর করবে। সেদিনের হিসাব-নিকাশের পর সে বুযর্গ ব্যক্তির দ্বারাই কার্য উদ্ধার হবে এবং তিনি আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে ক্ষমা করিয়ে দেবেন তা সে প্রতিদান নীতি অনুযায়ী ক্ষমার যোগ্য নাইবা হোক না কেন। কোরআন মজিদ এবম্বিধ ধারণাকে একেবারে ভিত্তিহীন বলেছে এবং দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছে যে, এ ধরনের কোন সুপারিশই সেদিন কোন কাজে আসবে না। সুপারিশে কোন সুফল হওয়া তো দূরের কথা, এ ধরনের সুপারিশই কেউ করতে পারবে না।

مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِىَ يَوْمٌ لَّابَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ط(بقرة : ٢٥٤)

"সেদিন আসার পূর্বে যেদিন না কোন লেনদেন হবে, না কোন দুস্তি-মহব্বত আর না কোন সুপারিশ।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৪)

শুধু এতটুকুই নয় যে, এ ধরনের কোন সুপারিশের ধারণা একটা ভিত্তিহীন ও অনর্থক কল্পনা বিলাস মাত্র, বরঞ্চ বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে এ একটা মুশরেকানা ধারণা বলেই মনে হবে। কারণ এ ধরনের ধারণা ও মতবাদ তখনই গ্রহণ করা যেতে পারে যখন একথা স্বীকার করতে হবে যে, আল্লাহ তাঁর বাদশাহীর মালিক একা নন। নিজের প্রজাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপরের হস্তক্ষেপের উর্ধে তিনি নন এবং না তার জ্ঞান প্রতিটি বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছে, আর না তিনি ন্যায়পরায়ণ (নাউযুবিল্লাহ)। প্রকাশ থাকে যে, এ প্রকার ধারণা একজন মুশরেকেরই হতে পারে। কোন মুমেনের হতে পারে না।

শাফায়াতের ইসলামী ধারণা

তাই বলে এর অর্থ এও নয় যে, আখেরাতে কোনরূপ শাফায়াতই হবে না। পক্ষান্তরে প্রকৃত ব্যাপার এই যে, একদিকে যেমন এই মুশরেকান ধারণার খণ্ডন করা হয়েছে, অপর দিকে এক বিশেষ ধরনের শাফায়াতের ধারণাও দেয়া হয়েছে। তাছাড়া ইসলামী আকীদার মধ্যেও একথা শামিল আছে যে, কিয়ামতের দিনে কিছু লোক কিছু লোকের শাফায়াত করবেন। এ শাফায়াত কোন্ ধরনের হবে তা কিছুটা বিবেক দ্বারাও অনুমান করা যায় অন্ততঃ এতটুকু কথাতো পরিষ্কার যে, উপরে বর্ণিত ধরনের কোন শাফায়াত হবে না। বরঞ্চ মৌলিক দিক দিয়ে পৃথক ধরনের এক শাফায়াত হবে। তা এমন হবে যার দ্বারা আল্লাহ তায়ালার কোন গুণের অথবা সে গুণের কোন অনিবার্য চাহিদার অস্বীকৃতি কিছুতেই হবে না এবং এ সত্যের সাথেও কোন সংঘর্ষ হবে না যে, আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টিজগতের মালিক প্রভু এবং শাসনকর্তা। তিনি সবকিছুই পরিজ্ঞাত। তাঁর প্রতিটি কাজ এবং প্রতিটি সিদ্ধান্ত ইনসাফ ও ন্যায়নীতি ভিত্তিক।

www.pathagar.com

অতপর একথা সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর এর মর্ম এই দাঁড়ায় যে, শাফায়াত সকলের জন্যও হবে না এবং তা হবে না বাধাবন্ধনহীন। বরঞ্চ তা হবে বিশেষ ক্ষেত্রে এবং সীমিত। হবে কিছু নিয়ম-নীতির অধীন।

কোরআন মজীদ এ বিবেকপ্রসূত ধারণা শুধু সমর্থনই করে না, বরঞ্চ এ শাফায়াতের নিয়ম-পদ্ধতির বিশদ বিবরণও দিয়েছে। তা হচ্ছে এই ঃ

০ শাফায়াতের ব্যাপারটি হবে পুরোপুরি আল্লাহর হাতে এবং যাকিছু হবে তা তাঁর মরযী মাফিকই হবে।

قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ط(الزمر : ٤٤)

"বল, শাফায়াতের সমগ্র ব্যাপারটাই আল্লাহর হাতে।"

-(সূরা আয যুমার ঃ ৪৪)

০ আল্লাহ যাঁকে অনুমতি দেবেন, একমাত্র তিনিই শাফায়াতের জন্যে মুখ খুলতে পারবেন।

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ط(البقرة : ٢٥٥)

"তার অনুমতি ব্যতিরেকে কে তাঁর কাছে শাফায়াত করবে?"

-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৫)

০ শাফায়াতকারী শুধুমাত্র সেই ব্যক্তির জন্যে শাফায়াত করতে পারবে যার উপরে সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ শাফায়াতের অনুমতি দেবেন।

وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى ـ(انبياء : ٢٨)

"যাদের উপরে আল্লাহ খুশী হয়েছেন তাদের ছাড়া আর কারো জন্যে শাফায়াত করা যাবে না।"-(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ২৮)

০ এ ধরনের শাফায়াতে শাফায়াতকারী যা কিছু বলবেন তা সকল দিক দিয়ে হবে সত্য ও ন্যায়সংগত।

لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ـ(النبا : ٣٨)

"রহমানুর রহীম আল্লাহ যাদেরকে অনুমতি দেবেন তারা ব্যতীত আর কেউ কোন কথা বলতে পারবে না এবং তারা যাকিছু বলবে, তা ঠিক ঠিক বলবে।"-(সূরা আন নাবা ঃ ৩৮)

এসব সীমারেখার ভেতরে যে শাফায়াত হবে, তার স্বরূপ অপ্রকাশ রয়ে যাচ্ছে না। তা নিশ্চিতরূপে দাসসুলভ অনুনয় বিনয়, দোয়া ও ক্ষমা ভিক্ষা থেকে

www.pathagar.com

সূক্ষ্মতম পৃথক কোন বস্তু নয়। শাফায়াতকারী না কোন ব্যক্তির ঈমান ও আমল সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান কিছু বাড়িয়ে দেবে, না তাকে ক্ষমার যোগ্য বলে ঘোষণা করবে, আর না কোন দিক দিয়ে আল্লাহর সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার কোন ধারণা অন্তরে পোষণ করতে পারবে। শুধু এতটুকু করবে যে, সৃষ্টি-জগতের বাদশাহের দরবারে এবং তাও তাঁর অনুমতি লাভের পর অতি বিনীতভাবে দরখাস্ত করবে, তাঁর রহম ও করম ভিক্ষা চাইবে। বলবে, হে দুনিয়া ও আখেরাতের বাদশাহ ! আপনি আপনার অমুক বান্দাহর গুনাহ মাফ করে দিন। তার ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা করুন, তাকে আপনি আপনার রহমত ও মাগফেরাতের আবেষ্টনীর ভেতর টেনে নিন।

এসব থেকে এ সত্যটি প্রকট হয়ে পড়ছে যে, শাফায়াত কবুলকারী যেমন আল্লাহ, তেমনি শাফায়াতকারীও আসলে তিনিই। কোরআনের কোন কোন স্থানে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন ঃ

لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِهٖ وَلِىٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ (انعام : ٥١)

"তিনি ব্যতীত তাদের জন্যে না আর কেউ অলী বা অভিভাবক আছে, আর না কেউ শাফায়াতকারী।"–(সূরা আল আনআম ঃ ৫১)

এই শাফায়াতকারী কোন্ ব্যক্তি হবেন এবং যাদের সম্পর্কে শাফায়াত করা হবে তারা কে এবং কোন্ ধরনের লোক হবে ? এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে যে, শাফায়াতকারীগণ হবেন আল্লাহর নেক ও নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ। আর যাদের জন্যে শাফায়াত করা হবে, তারা এমন লোক হবে যাদের ঈমান ও আমল হিসাব নিকাশের সময় এতটা কম ওজনের হবে যে, ক্ষমার সাধারণ নীতির অনুযায়ী তারা ক্ষমার যোগ্য বলে প্রতিপন্ন হবে না। ক্ষমার যোগ্যতা লাভে কিছুটা অভাব রয়ে যাবে। এ অভাবটুকু এমন হবে যা ক্ষমা করার জন্যে শাফায়াত করা হবে।

এখানে মনের মধ্যে আরো একটি প্রশ্নের উদয় হয়। তা হচ্ছে এই যে, এ শাফায়াতের তাহলে আসল অর্থটা কি ? কি উদ্দেশ্যেই বা শাফায়াত গ্রহণ করা হবে ? যদি শাফায়াতকারীর শাফায়াত করার মধ্যে কোন এখতিয়ারই না থাকে, যেমন উপরে বর্ণিত আয়াতগুলোর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়, তাহলে এর পরিষ্কার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, শাফায়াতের পর যাদের ক্ষমার কথা ঘোষণা করা হবে, তাদের ক্ষমা করার সিদ্ধান্ত আল্লাহ আগে থেকেই করে রেখেছেন। তাহলে মাঝখানে এই শাফায়াতের মাধ্যমটির উদ্দেশ্য কি ?

তার জবাব এই যে, প্রকাশ্যতঃ এ শাফায়াতের আসল উদ্দেশ্য, মনে হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর ঐসব খাস বান্দাহদের মর্যাদা প্রদর্শন করা, যাদেরকে তিনি তাঁর দরবারে মুখ খুলার এবং অনুনয় বিনয় করার অনুমতি দেবেন।

www.pathagar.com

হাশরের মাঠের জনসমুদ্রে, যেখানে সকলে নীরব নিস্তব্ধ, ভীতসন্ত্রস্ত ও অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান এবং কারো টু-শব্দ করার শক্তি হবে না সেখানে যাঁদেরকে কথা বলার অনুমতি দেয়া হবে তাঁদের জন্যে সত্যি সত্যি সেটা বড় গৌরবের বিষয় হবে আর তাদের সবিনয় গুযারেশ হবে, 'হে খোদা ! আপনি আপনার অমুক অমুক বান্দাহর ত্রুটি বিচ্যুতি মাফ করে দিন।'

অতপর সৃষ্টিজগতের মালিকের পক্ষ থেকে সে আবেদন মঞ্জুর করে নেবার পর সে সব বান্দাহদের ক্ষমা ঘোষণা করা হবে।

এ বিস্তারিত আলোচনার পর একথা অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে গেল যে, শাফায়াত প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ এক ক্ষমা পদ্ধতির নাম, যা ক্ষমার সাধারণ নিয়ম-পদ্ধতি থেকে কিছুটা পৃথক। একে আমরা ক্ষমা প্রদর্শনের অতিরিক্ত অনুগ্রহের নীতি-পদ্ধতি বলতে পারি। এও একটা নীতি-পদ্ধতি বটে—এটাও আল্লাহ তায়ালার তওহীদ, ন্যায়-নীতি, প্রভুত্ব, সম্ভ্রম ও জ্ঞান প্রভৃতি গুণাবলীর পুরোপুরি চাহিদা মুতাবিক। এতে করে পুরস্কার অথবা শাস্তি বিধানের যে আইন কানুন তা কণামাত্র ক্ষুণ্ন করা হয় না।

কেতাব ও সুন্নাত থেকে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে, আখেরাতে লোকের ক্ষমা প্রাপ্তি আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত কিছুতেই সম্ভব নয়। ইসলামের নবীর ঘোষণা হচ্ছে যে, কোন ব্যক্তিই শুধু মাত্র তার আমলের বদৌলতে নাজাত পাবে না।

اِعْلَمُوْا اَنَّهُ لَنْ يَّنْجُوْا اَحَدُكُمْ بِعَمَلِهِ -(مسلم)

"জেনে রাখ। তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিই শুধু তার আমলের বদৌলতে নাজাত পাবে না।"-(মুসলিম)

কিন্তু একথা যেমন সত্য, তেমনি এও সত্য যে, আল্লাহর এ 'ফযল ও করম'ও একটা ন্যায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি কেবলমাত্র ঐসব লোকদেরকেই নিজের 'ফযল ও করমের' ছায়ায় গ্রহণ করবেন, যারা ঈমান ও আমলের বদৌলতে তার যোগ্য বিবেচিত হবে। যে ব্যক্তি যতটা ভালো ঈমান ও আমলসহ হাযীর হবে সে তাঁর 'ফযল ও করমেরও' ততটা বেশী হকদার প্রমাণিত হবে। আবার যার কাছে এ মূলধন যত কম হবে, সে তাঁর 'ফযল ও করমের' (অনুগ্রহের) ততটা কম হকদার হবে। এমন কি কতক লোক এমনও হবে যারা তাঁর অনুগ্রহের মোটেই যোগ্য হবে না। মোটকথা মাগফেরাত বাস্তবক্ষেত্রে নির্ভর করে মানুষের স্বীয় ঈমান ও আমলের উপরে। আর এ ব্যাপারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার আল্লাহর হাতে।

এ হলো ইসলামের দৃষ্টিতে শাফায়াতের নির্ভুল ধারণা। আখেরাতের উপর ঈমান আনা এবং তা অক্ষুণ্ন রাখার দাবী একেবারে অর্থহীন হয়ে পড়ে,

www.pathagar.com

যতোক্ষণ না শাফায়াত সম্পর্কে নির্ভুল ইসলামী মতবাদ গ্রহণ করে ঐ ভ্রান্ত ধারণা থেকে মনকে মুক্ত করা হয়েছে যার বিষয়ে উপরে আলোচনা করা হলো। কারণ এ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করার পর আখেরাতের উপর ঈমান আনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। আল্লাহ এবং আখেরাতের উপর সঠিক ঈমান আনার উদ্দেশ্য তো এই যে, মানুষ প্রকৃত সত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে যেন সে নিজের জীবনে সঠিক চলার পথ বেছে নিতে পারে এবং দুনিয়াতে আল্লাহর বান্দাহ ও মুসলিম হয়ে থাকতে পারে। শাফায়াতের এ ভ্রান্ত ধারণা প্রকৃত সত্যের সংগে পরিচিত হতে এবং সঠিক পথে অবিচল থাকতে দেয় কি ? কখনোই না। কারণ, এ ধারণা তো তাকে এরূপ এক আশায় রূহকে ভুলিয়ে রাখে যে আখেরাতের হিসাব-নিকাশের সাফল্য ঈমান ও আমলের উপরে নির্ভর করে না। বরঞ্চ নির্ভর করে বুযর্গানের সন্তুষ্টি ও শাফায়াতের উপরে। আর এসব বুযর্গানের সন্তুষ্টি ও শাফায়াত লাভ হতে পারে যদি তাঁদের আস্তানায় গিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলী ও নযর নিয়ায পেশ করা হয়। চিন্তা করুন, এ ধারণার বশীভূত হওয়ার পর আখেরাতের চিন্তা এবং আল্লাহ তায়ালার ফরমাবরদারীর অনুভূতি কিভাবে বাকি থাকতে পারে ? বলতে হয় যে, এ একটা আফিং এর ন্যায় মতবাদ। এমন ধ্যান-ধারণা পোষণ করার পর আখেরাতকে মানা ঠিক না মানার মতোই। অতএব আখেরাত সম্পর্কে ইসলামী আকীদাকে সঠিকরূপে হৃদয়ংগম করার জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজন হবে শাফায়াত সম্পর্কে মন-মস্তিষ্ক পরিষ্কার করে নেয়া।

০ বর্তমানে মৃত বুযর্গানের কবরকে কেন্দ্র করে যেসব বাড়াবাড়ি করা হয় তা তওহীদী আকীদার একেবারে খেলাফ। মৃত ব্যক্তিকে নিশ্চিতরূপে শুধু সুপারিশের যোগ্যই মনে করা হয় না, বরঞ্চ বিপদ মুক্তির জন্যে সংগত অসংগত মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্যে, গায়েবী মদদের জন্যে মৃত ব্যক্তিকে ডাকা হয় এবং তাকে খুশী করার জন্যে বিবিধ নযর নিয়ায পেশ করা হয়। এ কাজের জন্যে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে দেশের আনাচে-কানাচে অসংখ্য দালাল নিযুক্ত থাকে। এভাবে তওহীদ পুরস্ত মুসলমানকে মুশরেক ও পৌত্তলিক বানাবার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র পরিকল্পিত উপায়ে চলছে।

['দ্বীনের' দরদী যাঁরা তাঁদের এ দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া দরকার। অন্যথায় এ জন্যেও আখেরাতে জবাবদিহি করতে হবে।—অনুবাদক]

৩. রেসালাতের প্রতি ঈমান

রেসালাত ও তার আবশ্যকতা

ইসলামের তৃতীয় আবশ্যকীয় বুনিয়াদী আকীদাহ হলো রেসালাত। রেসালাতের শাব্দিক অর্থ হলো 'দূতগিরি' এবং 'পয়গম্বর'। শরীয়তের পরিভাষায়

www.pathagar.com

রেসালত এমন দূতগিরিকে বলা হয় যা আল্লাহ তায়ালা কায়েম করেছেন মানবজাতিকে তাঁর শরীয়তের আহকাম শিখাবার জন্যে এবং তাদেরকে তাঁর মনঃপুত পথ দেখাবার জন্যে।

রেসালাত পরম্পর কেন কায়েম করা হয়েছে ? তার প্রয়োজনই বা কেন হলো ? আর এর উপরে ঈমান আনার আবশ্যকতাই বা কি ?

এসব বিষয়ের উপরে চিন্তা-ভাবনা করতে গেলে একটু দূর থেকে আলোচনা প্রয়োজন। অর্থাৎ প্রথমে দেখতে হবে যে, মানুষ কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তা সফল করতে হলে কোন্ বাস্তব পন্থা অবলম্বন করা দরকার।

ইসলাম মানব সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য এবং তার জীবনের যে গুরু দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছে তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বন্দেগী ও আনুগত্য। এ এমন এক বস্তু যার উপরে আখেরাতের সাফল্য নির্ভর করছে। আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্যের নাম করতেই স্বাভাবিকভাবে তাঁর আহকাম (নির্দেশাবলী) এবং ইচ্ছা ও মরযীর প্রশ্ন সামনে আসে। কারণ আনুগত্য তো আহকামেরই হতে পারে এবং হুকুম না হলে আনুগত্যের কোন প্রশ্নই থাকে না। অতএব যখনই একজন মানুষ তার প্রভু পরোয়ারদেগারের বান্দাহ ও অনুগত হয়ে জীবন যাপন করার সিদ্ধান্ত করবে তখন সে অবশ্য অবশ্যই এটা জানতে চাইবে যে, তার প্রভুর সেসব হুকুমগুলো কি যা মেনে তাকে চলতে হবে ? তিনি কি পছন্দ করেন এবং কি অপছন্দ করেন ? কোন্ কাজ করলে সে তাঁর বিশ্বাস ভাজন হতে পারবে এবং কোন্ কাজ থেকে সে বিরত থাকবে যাতে করে সে তাঁর নাফরমানীর অভিশাপ থেকে বাঁচতে পারে ? এসব জানতে না পারলে সে তার প্রভুর আনুগত্যের জন্যে এক পাও অগ্রসর হতে পারবে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তায়ালার আহকাম এবং ইচ্ছা ও মরযী জানবার উপায় কি ? মানুষ কি করে জানতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা অমুক অমুক বিষয় করার আদেশ দিয়েছেন এবং অমুক অমুক বিষয় থেকে বিরত থাকতে বলেছেন ?

এর প্রত্যুত্তরে যেসব বিষয়ের নাম নেয়া যেতে পারে তার মধ্যে একটা হচ্ছে প্রতিটি মানুষের বিবেক। কিন্তু প্রতিটি মানুষ কেন, কোন মানুষ এমন নেই যে তার বিবেকের দ্বারা সে এটা জানতে পারে যে, জীবন ও সৃষ্টিজগতের গূঢ় রহস্য কি, তার স্রষ্টা ও পরোয়ারদেগারের মধ্যে কোন্ গুণের সমাবেশ আছে, আমাদের মতো মানুষের কাছে তার সেসব গুণাবলীর চাহিদাই বা কি এবং আমাদের জন্যে তাঁর নির্দেশাবলী কি। মোটকথা এসব বিষয় যে বিবেকের জ্ঞানের অতীত তা এক অতি স্বীকৃত সত্য।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বস্তু হলো মানুষের আপন অস্তিত্ব ও আত্মশক্তি। কিন্তু এ শক্তির ব্যাপারও তেমন বিভিন্ন কিছু নয়। রিয়াযতে নফস বা আত্মসাধনায় যত বড়ো প্রচেষ্টাই করা হোক না কেন, তা এখানে কোন সুফল লাভ করতে পারে না। কারণ মানুষ তার আধ্যাত্মিক দিককে মেজে ঘষে যতই আয়নার মতো স্বচ্ছ করুক না কেন, তার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার আহকাম ও মরযী কোন প্রতিকৃতি আপনা আপনি কখনো প্রতিবিম্বিত হতে পারে না। আয়নার মধ্যে কোন কিছুর প্রতিবিম্ব দেখতে পাওয়ার জন্যে আয়নার স্বচ্ছতাই যথেষ্ট নয়। বরঞ্চ প্রয়োজন এই যে, সে বস্তুটির অনাবৃত আকৃতি তার সম্মুখে এবং নিকটে হতে হবে। অতএব যতোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তাঁর আহকামকে নির্দিষ্ট করে একটা অস্তিত্ব দান না করেছেন এবং অস্তিত্বে আনার পর মানুষের অন্তর আয়নার সামনে রেখে না দিয়েছেন, তা সে আয়না যতোই স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল হোক না কেন, তার মধ্যে কোন প্রতিবিম্বের পরিস্ফুরণ কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ এ দাবী করতে পারেনি যে, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেককে তাঁর আহকাম ও মরযী জানবার জন্যে এ পদ্ধতি নির্ধারিত করে দিয়েছেন। অতএব আহকামে এলাহী জানার জন্যে এ পদ্ধতিও একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা বৈ কিছু নয়।

তৃতীয় বস্তু হচ্ছে ব্যক্তির পরিবর্তে ব্যক্তি সমষ্টির সম্মিলিত চিন্তা-গবেষণা। কিন্তু লক্ষ কোটি অন্ধ মিলিত হয়ে যেমন একটি চক্ষুষ্মান মানুষের মর্যাদা লাভ করতে পারে না, তেমনি মানুষ যত বিরাট সংখ্যায় একত্র হোক না কেন, তারা আহকামে এলাহী অবগত হওয়ার ব্যাপারে সফলকাম হতে পারবে না। তাছাড়া কথা হচ্ছে এই যে, বহু লোকের সমষ্টি তো ঐসব লোককে নিয়েই হয়েছে যাদের মধ্যে কেউ একজনও এমন নয় যে, তার নিজের জ্ঞান বিবেকের দ্বারা আহকামে এলাহী জ্ঞাত হওয়ার কোন স্বপ্ন দেখতে পারে। অতএব প্রথম দু'টির মতো এটাও একটি নিষ্ফল পদ্ধতি।

এভাবে উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতির মধ্যে কোন একটিও এমন নয় যার দ্বারা মানুষ তার প্রয়োজন পূরণ করতে পারে।

অবশ্যি বহু কিছু এমন আছে যার ভালো বা মন্দ হওয়াটা আমরা আপনা আপনি অনুভব করতে পারি। তাদের ভালো বা মন্দ হওয়ার সিদ্ধান্ত আমরা স্বীয় প্রকৃতি, বিবেক অথবা আপন অস্তিত্বের অনুভূতি থেকে নিজেরাই করে নিতে পারি। আর এ এক স্বীকৃত সত্য যে, হেদায়েতে এলাহীও (আল্লাহ কর্তৃক ভালো-মন্দের পথনির্দেশ) ভালো-মন্দ নির্ধারণের দ্বিতীয় নাম। কিন্তু এতটুকু মনে করলেই চলবে না যে, মানুষ আপনা আপনি আল্লাহর যাবতীয় নির্দেশাবলী এবং ইচ্ছা ও মরযীর আন্দাজ অনুমান করতে পারবে। কারণ 'কিছু' কাজের

www.pathagar.com

ভালো বা মন্দ হওয়ার জ্ঞান ও আন্দাজ অনুমান 'সমুদয়' কাজের ব্যাপারে প্রয়োগ করা যেতে পারে না। দৃষ্টি প্রসারিত করে চারিদিকের জগতটাকে একবার দেখে নিন। কতজন প্রতিভাকে একমত পাওয়া যায়? এমন কত আছে যার ভালো হওয়া সম্পর্কে এবং এমন কত আছে যার মন্দ হওয়া সম্পর্কে মানবজাতি একমত? খুব কম করে হলেও আপনি এমন কাজ ও প্রতিভার কোন উল্লেখযোগ্য সংখ্যা বর্ণনা করতে পারবেন না যার ভালো এবং মন্দ হওয়া সম্পর্কে সব মানুষ একমত। আর সামান্য কোন ব্যাপারে একমত হলেও বিস্তারিত আলোচনার পর তাদের মধ্যে মতৈক্য ঠিক আগের মতন থাকবে না। একথা সত্য যে, একটা তুচ্ছ ভিত্তির উপরে এতবড় বিরাট দাবীর প্রাসাদ কিছুতেই নির্মাণ করা যেতে পারে না। কিছু বিষয়ের ভালো এবং মন্দ হওয়ার সিদ্ধান্ত যদি মানুষ করেও ফেলতে পারে তবুও তা ভালো-মন্দের সমগ্র বিষয়ের সমাধান করার সনদ হতে পারে না, অবশ্যি একথা বলা যাবে না যে, প্রদীপের আলো আলো নয়। কিন্তু একথা ত অবশ্যই বলা যাবে যে, পৃথিবী আলোকিত করার জন্যে যে সূর্যের প্রয়োজন এ প্রদীপ তার স্থান লাভ করতে পারে না।

অতএব এ ব্যাপারে মানুষ যে সম্পূর্ণ অসহায় তা এক স্বীকৃত সত্য। এর বিরুদ্ধে না বিবেক কিছু বলতে পারে, আর না কোন পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রমাণ দেয়া যেতে পারে। এহেন পরিস্থিতির সুস্পষ্ট দাবী এই ছিল যে, এ ব্যাপারে মানুষকে ঊর্ধজগত থেকে পথপ্রদর্শন করা হোক। কারণ আল্লাহর মরযী জানার যোগ্যতা যদি মানুষের চিন্তা ও আধ্যাত্মিক শক্তির না থাকে অথচ তা জানা কিন্তু আহার ও পানীয়ের মতোই অত্যাবশ্যক, তাহলে এ প্রয়োজন পূরণের জন্যে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ব্যতীত আর কি পথ থাকতে পারে?

একদিকে অবস্থা এই এবং মানুষের ছিল সবচেয়ে বড়ো ও বুনিয়াদী প্রয়োজন আর অন্যদিকে আল্লাহ তায়ালার রুবুবিয়ত, রহমত, ইনসাফ এবং হিকমত। আর এসব গুণের প্রত্যেকটির দাবী ছিল এই যে, মানুষকে এমন অসহায়ভাবে অন্ধকারে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে না বরঞ্চ তাকে সাহায্য করতে হবে। তাকে সেসব আহকাম সুস্পষ্ট করে বলে দিতে হবে যা তার জানা না থাকলে বন্দেগী এবং আনুগত্যের পথ অবলম্বন করতে পারবে না। এমতাবস্থায় অত্যন্ত সংগত কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর আহকাম মানুষকে পৌঁছার ব্যবস্থা বাইরে থেকে করলেন। এ ব্যাপারে একটি দিনও বিলম্ব করলেন না। মানবজাতির সূচনা থেকেই এ ব্যাবস্থপনারও সূচনা করে দিলেন। যে প্রভু পরোয়ারদেগার মানুষের বস্তুগত প্রয়োজন মিটাবার এত বড় ব্যবস্থাপনা করে রেখেছেন, তিনি তাদের নৈতিক ও দ্বীনি প্রয়োজন মিটাবার দিকে লক্ষ্য করবেন

www.pathagar.com

না এটা তাঁর আপন মর্যাদার খেলাফ। যে মালিক প্রভু তাঁরই মনঃপুত পথে চলার দায়িত্ব মানুষের উপর চাপালেন, তাঁর রহমত ও ইনসাফ মানুষকে সে পথ দেখাবার কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে না, তা কি করে সম্ভব ? বস্তুতঃ তিনি সে ব্যবস্থা করেছেন এবং এটা সেই ব্যবস্থা যাকে 'দ্বীনের' পরিভাষায় বলে 'রেসালাত'। যার মাধ্যমে এ ব্যবস্থাপনা করা হলো তাকে বলা হয় 'রসূল'।

এখন একথা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, রেসালাত ব্যতীত মানুষ আল্লাহ তায়ালার আহকাম কিছুতেই অবগত হতে পারে না। যেমন ধারা দেখার জন্যে চোখের পুত্তলিতে দৃষ্টি শক্তির প্রয়োজন হয়, তেমনি মুমেন এবং মুসলিম হওয়ার জন্যে রেসালাতের উপর ঈমান আনাও অত্যন্ত প্রয়োজন।

বস্তুতঃ যে জিনিস কোন গন্তব্য স্থানে পৌছার একমাত্র অবলম্বন হয়, তাকে যতোক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করা না হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত গন্তব্যস্থানে পৌছার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

তারপর কথা শুধু এতটুকুই নয়। লক্ষ্য করলে জানতে পারা যাবে যে, রেসালাতের বাস্তব গুরুত্ব এর চেয়ে অনেক বেশী। রেসালাত ব্যতীত শুধু যে আল্লাহর আহকাম জানতে পারা যাবে না। তাই নয়, বরঞ্চ এ ছাড়া স্বয়ং আল্লাহ এবং আখেরাতও জানতে পারা যাবে না। রেসলাত এমন এক মাধ্যম যা আল্লাহ তায়ালার প্রকৃত পরিচয় এবং আখেরাতের সঠিক জ্ঞান দান করে। পরিষ্কার ভাষায় বলতে গেলে, রেসালাত ব্যতীত আল্লাহ এবং আখেরাতের উপর ঈমান আনাও সম্ভব নয়। অতএব রেসালাতের উপর ঈমান রাখাও যদি ইসলামের বুনিয়াদী আকীদার মধ্যে শামিল হয়, তাহলে তা অত্যন্ত সংগতই বলতে হবে।

নীতিগতভাবে যখন জানা গেল যে, রেসালাত মানুষের জন্যে তার আহার ও পানীয়ের মতোই অত্যাবশ্যক এবং তা ইসলামের বুনিয়াদী আকীদার মধ্যে শামিল তাহলে এখন এর প্রয়োজন বিশ্লেষণ করা যাক।

কোরআন মজিদ রেসালাত সম্পর্কে যেসব তত্ত্ব ও তথ্য দান করেছে তা নিম্নরূপ ঃ

রসূল মানুষই ছিলেন

আল্লাহ তায়ালা মানুষের কাছে তাঁর আহকাম পাঠাবার মাধ্যমে হর-হামেশা মানুষকেই করেছেন। অর্থাৎ এই রসূল না ফেরেশতাদের মধ্যে কেউ ছিলেন, আর না জ্বিন জাতির মধ্য থেকে কেউ ছিলেন, অথবা এমনও নয় যে, স্বীয় আহকাম জ্ঞাত করার জন্যে আল্লাহ স্বয়ং মানুষের আকৃতিতে ধরার ধূলায়

www.pathagar.com

নেমে এসেছেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, যখনই কোন রসূল পাঠানো হয়েছে, তাঁকে মানুষের মধ্য থেকেই পাঠানো হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلاَّ رِجَالاً نُّوْحِىْٓ اِلَيْهِمْ ـ(يوسف : ١٠٩)

"(হে মুহাম্মদ) তোমার পূর্বেও আমি শুধু মানুষকেই রসূল হিসেবে পাঠিয়েছি, যাদের উপর আমি অহী নাযিল করেছি।"–(ইউসুফ ঃ ১০৯)

কোরআন মজিদে অতীত জাতিসমূহের এবং তাদের প্রতি প্রেরিত নবী-রসূলগণের দাওয়াতের যে বিবরণ দেয়া হয়েছে তার থেকে জানা যায় যে, মানুষ সবসময়ে আল্লাহর রসূলগণকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করেছে ঃ

قَالُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا ـ(ابرهيم : ١٠)

"তোমরা তো আমাদের মতোই মানুষ। তবে কেমন করে তোমরা আল্লাহর দূত এবং রসূল হওয়ার দাবী কর?"–(সূরা ইবরাহীম ঃ ১০)

তাদের কথার জবাবে রসূলগণ কখনো একথা বলেননি যে, তারা ভুল বলেছে। বরঞ্চ সকলেই বলতেন ঃ

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ـ(ابرهيم : ١١)

'হ্যাঁ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, আমরা তোমাদেরই মতো মানুষ'।"
–(সূরা ইবরাহীম ঃ ১০)

অতএব এ এক অবধারিত সত্য যে, রেসালাতের জন্যে হর-হামেশা মানুষকে নিযুক্ত করা হয়েছে। তাঁরা ঐ ধরনেরই মানুষ ছিলেন যেমন আপনি ও আমি। আমাদেরই মতো তাঁদের শরীর ও প্রাণ ছিল। শক্তি ও কামনা-বাসনা ছিল। বিবি-সন্তানাদি ছিল। তাঁরা প্রকৃতির নিয়মের অধীন পয়দা হয়েছেন। পানাহার করতেন। ঘুমাতেন, জাগতেন। তাঁদের সুখ-দুঃখের অনুভূতি ছিল। হাসি-কান্না তাদেরও ছিল। সুস্থ-সবলও থাকতেন। আবার রোগাক্রান্তও হতেন। মৃত্যুও তাদেরকে স্পর্শ করতো। মোটকথা, সবদিক দিয়েই তারা ছিলেন মানুষ। মনুষ্যত্বের প্রতিটি অণু-পরামাণু তাঁদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। "আমরা তোমাদেরই মতো মানুষ ছিলাম"—শুধু একথাটুকুর দ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব বুঝতে পারা যাবে না। তাই কোরআন স্থানে স্থানে এর বিশদ বিবরণ দিয়েছে।

اِنَّهُمْ لَيَاكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ ـ(فرقان : ٢٠)

"রসূলগণ নিঃসন্দেহে আহার করতেন। বেচা-কেনার জন্যে হাটে-বাজারেও যেতেন।"–(সূরা আল ফুরকান ঃ ২০)

www.pathagar.com

وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ط(رعد : ٣٨)

"আমি তাদেরকে বিবি ও সন্তানাদি দিয়েছিলাম।"-(সূরা আর রাদ ঃ ৩৮)

যে মসলেহাত (গূঢ় তাৎপর্য) সামনে রেখে রেসালাতের জন্যে মানুষকে বেছে নেয়া হলো, তার দিকেও কোরআন অংগুলি নির্দেশ করেছে। মক্কার অধিবাসীগণ যখন নবুয়তের প্রতিবাদ করে বললো ঃ "আমাদের নিকটে নবী পাঠাবার প্রয়োজনই যদি আল্লাহ তায়ালার থাকতো, তাহলে আমাদেরই মতন একজন মানুষ হিসেবে তোমাকে না পাঠিয়ে একজন ফেরেশতাকে নবী করে পাঠাতেন।"

এর জবাবে আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَلَكًا رَّسُوْلًا ○ (بنى اسرائيل : ٩٥)

"(হে নবী!) তাদেরকে বলে দাও, যদি ফেরেশতারা এ দুনিয়ায় চলা-ফেরা ও বসবাস করতো, তাহলে অবশ্যই তাদের জন্যে আমি আসমান থেকে একজন ফেরেশতাকেই রসূল করে পাঠাতাম।"-(বনী ইসরাঈল ঃ ৯৫)

এ আয়াতটি রেসালাত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার এক নির্ধারিত নীতি ঘোষণা করেছে। তাহচ্ছে এই যে, রসূল ঠিক ঐ জাতীয় সৃষ্টির মধ্য থেকে হওয়া উচিত যে জাতীয় সৃষ্টির কাছে গিয়ে তাঁকে রসূলের দায়িত্ব আনজাম দিতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে এ একটি কথা মাত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ এমন এক হিকমতপূর্ণ বাক্য যা সুস্থ বিবেকের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে। এর থেকে এ সত্যটি প্রকট হয়ে পড়ে যে, মানুষের কাছে আল্লাহর আহকাম পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্যে রসূলের মানুষ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নতুবা রেসালাতের উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে না। কারণ রসূল যদিও মানুষের কাছে আহকামে এলাহী পৌঁছার মাধ্যম, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি একজন ডাকপিয়ন। তাঁর কাজ এছাড়া আর কিছু নয় যে, তিনি টেলিফোন অথবা টেলিগ্রাফের তারের মতো শুধু আল্লাহর আহকাম মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিবেন। না, তা নয়। বরঞ্চ তিনি এর চেয়ে আরও অনেক কিছু। তিনি আল্লাহর আহকাম পৌঁছিয়ে দেন তো বটেই। তদুপরি তিনি সে আহকামের দিকে মানুষকে আহ্বান জানান। তিনি একাধারে একজন হাদী (পথপ্রদর্শক), শিক্ষক, খোদায়ী আইনের ব্যাখ্যাদাতা। খোদার হুকুম অনুযায়ী মানুষের জ্ঞানদান এবং তাদের আত্মশুদ্ধির কাজ তিনি করেন। এবং সর্বপ্রথম তিনি স্বয়ং উক্ত হুকুমগুলোর পায়রবি করে অন্যান্যের সামনে আমলের একটা উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করেন। এ সবকিছুই তাঁর দায়িত্বের মধ্যে শামিল।

www.pathagar.com

অন্য কথায়, যতোক্ষণ এ সবকিছুই করা না হয়েছে ততোক্ষণ যে উদ্দেশ্যে রেসালাত পরম্পরা কায়েম করা হয়েছে তা কখনোই সফল হবে না। চিন্তা করুন, মানুষ ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টি এ সমস্ত কাজ আনজাম দিতে পারে কি ?

এর একটি জবাবই হতে পারে। তাহচ্ছে এই যে, অন্য কোন সৃষ্টি এ সবের কোন কোনটি হয়তো সমাধা করতে পারে। কিন্তু সবটা কখনোই পারবে না। যেমন ফেরেশতার কথাই ধরুন। মানুষকে বাদ দিলে সর্বপ্রথম দৃষ্টি তাদের দিকেই পড়ে। যদি কোন ফেরেশতাকে রসূল নিযুক্ত করে মানুষের কাছে পাঠানো হতো তাহলে চিন্তা করুন, অবস্থাটা কি হতো ?

অবশ্যি একথা সত্য যে, ফেরেশতা আল্লাহর আহকাম মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিত নিশ্চয়ই। কিন্তু মানবিক প্রবণতা ও দাবী এবং বিশিষ্ট মানবিক সমস্যা ও কার্যকলাপের সাথে যেসব বিষয়ের সম্পর্ক, ফেরেশতা হয়ে সেসব কেমন করে সে নিজে আমল করতো ? তারপর শরীয়তের একটা বিরাট অংশের উপর তার নিজের আমল করার প্রশ্নই যদি না রইলো, তাহলে সে নিজের অনুসারীদের জন্যে উজ্জল আদর্শ কিভাবে পেশ করতো ? ঠিক এমনি-ভাবে এসব মানবিক প্রবণতা ও দাবী সম্পর্কে অনবহিত থেকে এতদসম্পর্কীয় কাজ-কামে কিভাবে যথাসময়ে মানুষকে পথপ্রদর্শন করতো ? আল্লাহর কেতাব থেকে মানুষের জন্যে দেয়া জীবন পদ্ধতির বুনিয়াদী কাঠামোর বিশদ ব্যাখ্যাই বা সে কিভাবে করতো ? সে তো জানেই না যে, মানবীয় প্রবৃত্তির অবস্থা এবং রহস্যাবলী কি। অতপর সে কিভাবে তাদের তাযকিয়ায়ে নফস বা আত্মশুদ্ধি করবে ?

কোরআন মজিদ একথা বলে যে, প্রত্যেক নবী সেই জাতির মধ্য থেকে হতেন যাদের মধ্যে তাঁকে নবী করে পাঠানো হতো। এভাবে তাঁর উপরে যে খোদার কালাম নাযিল হতো, তাও সেই ভাষায় হতো যে ভাষায় তার জাতি কথা বলতো।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهٖ ـ(ابراهيم : ٤)

"প্রত্যেক নবীকে তার জাতীয় ভাষায় নবী করে পাঠিয়েছি।"

–(সূরা ইবরাহীম ঃ ৪)

তা কেন ? তা এ জন্যে, যাতে করে নবীর পয়গাম তাঁর জাতির কাছে সুস্পষ্ট হয়। কোরআন মজিদের এ বিবরণ থেকে অনুমান করুন যে, আল্লাহ মানুষের কাছে তাঁর পয়গাম দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট করে দেয়ার জন্যে কেমন পরিপূর্ণ ব্যবস্থা করেছেন। তিনি এ বিষয়ে এতটা গুরুত্ব দিয়েছেন যাতে করে কষ্ট বা ওযর-আপত্তি প্রতিবন্ধক হতে না পারে এবং যাতে করে তাদের

www.pathagar.com

জন্যে যুক্তি প্রমাণাদির পূর্ণ সমাপ্তি ঘটে। অর্থাৎ এরপর যেন তাদের বলার কিছুই না থাকে।

এখন কথা হলো এই যে, প্রত্যেক নবীকে যদি তাঁর জাতির লোকের মধ্য থেকেই হতে হয় এবং খোদায়ী পয়গামও যদি সেই জাতির ভাষায় হতে হয়, তাহলে মানুষের মধ্য থেকে নবী হওয়াটাই যে অনেক গুণে বেশী প্রয়োজন তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

রেসালাতের পদমর্যাদার ধরন

রেসালাত এমন কোন বস্তু নয় যা চেষ্টা চরিত্র করে অর্জন করা যেতে পারে। বরঞ্চ এ একটা নিছক দানের বস্তু। আল্লাহ তায়ালার এ বিশেষ দান তার ভাগ্যেই জোটে যার প্রতি তিনি সদয় হন। এ দান প্রাপ্তির ব্যাপারে মানুষের চেষ্টা-সাধনা ও কামনা-বাসনার কোনই সম্পর্ক নেই।

আল্লাহ তায়ালা এ পদ-মর্যাদা বা গুরুদায়িত্বের জন্যে স্বয়ং লোক নির্বাচন করেন। কোরআনের ভাষায় তাকে বলা হয় 'এসতাফা'। এসতাফার অর্থ হলো, অনেক বস্তুর মধ্য থেকে সবচেয়ে ভালো যেটি তা বেছে নেয়া। এ শব্দটি থেকে বুঝতে পারা যায় যে, রেসালাতের জন্যে নির্বাচন এমন সব ব্যক্তিরই হতো, যারা সকল প্রকার যোগ্যতা ও প্রতিভা শক্তির দিক থেকে এ মহান এবং পবিত্র পদমর্যাদার জন্যে সকলের চেয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি হতেন। বিবেকের দিক দিয়ে যেমন এটা প্রয়োজন মনে হয়, কোরআন মজিদের কোন কোন বিবরণও এদিকে ইংগিত করে।

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ (انعام : ١٢٤)

"আল্লাহ তায়ালাই সবচেয়ে ভালো জানেন যে, কার উপরে তাঁর পয়গম্বরী সপর্দ করা উচিত ছিল।"–(সূরা আল আনআম ঃ ১২৪)

শিক্ষালাভ ও চেষ্টা চরিত্র করে যে রেসালাত লাভ করা যায় না, শুধু তাই নয়, বরঞ্চ অন্যলোক এর গূঢ় তত্ত্ব বুঝতেও সক্ষম নয়। আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ط قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا (بنى اسرائيل : ٨٥)

"এসব লোক অহী কি সে সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করছে। তাদেরকে বলে দাও, 'অহী আমার প্রভুর বিশেষ আদেশাবলীর একটি। এবং তোমাদের মতো সাধারণ মানুষকে অতি অল্প জ্ঞানই দেয়া হয়েছে'।"

–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮৫)

www.pathagar.com

অর্থাৎ "স্বাভাবিক ভাবেই অহী তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির নাগালের বাইরে। অতএব তোমরা তা বুঝতেও পারবে না।

অহী বুঝতে না পারার অর্থ হলো আসল নবুওয়াতের গূঢ়তত্ত্ব বুঝতে না পারা। কারণ এই অহী নবুয়াতের এক বিশেষ অংগ। তা পেলেই একজন নবী হতে পারেন।

রেসালাত সার্বজনীন

প্রত্যেক জাতির কাছে নবী পাঠানো হয়েছে ঃ

وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلاَّ خَلاَ فِيْهَا نَذِيْرٌ (فاطر : ٢٤)

"এমন কোন জাতি নেই যাদের মধ্যে একজন সাবধানকারী (রসূল) আগমন করেননি।"–(সূরা আল ফাতের ঃ ২৪)

বস্তুতঃ এইতো হওয়া উচিত ছিল। কারণ সকল মানুষই তো সমান। তারা যে জাতি এবং যে দেশেরই হোক না কেন। সকলকে একই উদ্দেশ্যে পয়দা করা হয়েছে। আল্লাহর বন্দেগী সকলের জীবনেরই অপরিহার্য কর্তব্য হিসাবে নির্ধারিত করা হয়েছে। অতপর আখেরাতে এ কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তা সকলের জন্যেই হবে। অতএব এ কি করে হতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা কিছু সংখ্যক লোককে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করবেন এবং কিছু সংখ্যককে অন্ধকারে রাখবেন? এক দলকে তাঁর আহকাম জানিয়ে দেবেন এবং অন্যদলকে তার থেকে বঞ্চিত করবেন ? তিনি যখন সমানভাবে সকলের স্রষ্টা, মালিক, প্রভু এবং ইলাহ তখন তাঁর রহমত সকলের জন্যে সমানভাবে প্রাপ্য এবং তাঁর ইনসাফ পক্ষপাতিত্বের বহু উর্ধে।

প্রকাশ থাকে যে, প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূলের আগমনের অর্থ হলো তাদের কোন না কোন পুরুষে অবশ্য অবশ্যই একজন নবী এসেছেন।

রসূলের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

রসূল দ্বীন এবং শরীয়াতের নামে মানুষকে যা কিছু শিক্ষা দেন, তা সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে। কোন কথাই তাঁর মনগড়া হয় না।

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى ۝ (النجم : ٣-٤)

"নবী দ্বীনের ব্যাপারে মনগড়া কোন কথা বলেন না। তিনি যা কিছু বলেন তা সবই অহীর ভিত্তিতে, যা তার উপর নাযিল করা হয়।"

–(সূরা আন নাজম ঃ ৩-৪)

www.pathagar.com

নবীর যাবতীয় শিক্ষা আল্লাহরই পক্ষ থেকে হওয়ার অর্থ ব্যাপক ঃ

o এক হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তায়ালা তার আহকাম নির্দিষ্ট শব্দমালার দ্বারা স্বয়ং সরাসরি অথবা ফেরেশতার মাধ্যমে নবীকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

o দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীকে যে আহকাম শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তাকে সামনে রেখে তিনি ইজতেহাদ করেন এবং আল্লাহর মরযীর প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে তার থেকে তিনি স্বয়ং অতিরিক্ত আহকাম বের করেন।

o প্রথম ধরনের শিক্ষা মূলতঃ আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয় এবং তা হয় সরাসরি।

o দ্বিতীয় ধরনের শিক্ষা যদিও আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়, তা হয় নবীর ইজতেহাদের মাধ্যমে।

নবীগণ ছিলেন নিষ্পাপ

নবী নিষ্পাপ হন। তাঁর চিন্তা ও ইজতেহাদে কোন ভুল হয় না এবং তাঁর কাজ-কর্মে ও চরিত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয় না। তাঁর প্রবণতা তাঁর চরিত্র, চিন্তাধারা ও কাজ-কর্ম সবকিছুই প্রবৃত্তি ও শয়তানের প্রভাব প্ররোচনা থেকে দূরে থাকে। তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতি যদিও বা হয়, তা হতে পারে ঐসব চিন্তা-ভাবনা ও আন্দাজ অনুমানের মধ্যে, শরীয়তের কাজ-কর্মের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। অথবা হতে পারে কোন চেষ্টা তদবীরের মধ্যে।

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা ও আন্দাজ অনুমানে কোন ভুল-ভ্রান্তি তাঁর নিষ্পাপ হওয়াকে ক্ষুণ্ন করে না। কারণ নিষ্পাপ হওয়ার অর্থ শুধু এই যে, আল্লাহ তায়ালার আহকাম বুঝতে এবং তার থেকে অতিরিক্ত আহকাম বের করতে তিনি কোন ভুল করেন না। বাস্তব জীবনে আল্লাহর মরযী মুতাবিক চলতেও তাঁর কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয় না। এ জন্যে শরীয়ত বহির্ভূত অন্যান্য ব্যাপারে কিয়াস ও আন্দাজ অনুমানে ভুল হওয়াটা নিষ্পাপ হওয়া না হওয়ার সাথে কোনই সম্পর্ক রাখে না।

নবী মাসুম নিষ্পাপ এ জন্যে নন যে, ভুল চিন্তা করার এবং ভুল কাজ করার কোন শক্তিই তাঁর মধ্যে নেই। পক্ষান্তরে প্রকৃত ব্যাপার এই যে, প্রতিটি মানুষের মতো আম্বিয়া আলাইহিস সালামের মধ্যেও এ শক্তি প্রকৃতিগতভাবে অবশ্যই বিদ্যমান থাকে। কিন্তু আসলে সে শক্তি ও যোগ্যতা সফলতা লাভ করতে পারে না। তার কারণ এই যে, নবীর চিন্তাধারা, দুরদর্শিতা ও নৈতিক শক্তি সকল দিক দিয়ে হয় পরিপূর্ণ ও সিদ্ধ (কামেল)। একদিকে তো আহকামে এলাহীর তাৎপর্য অনুধাবন করা এবং তার থেকে ইজতেহাদের দ্বারা অতিরিক্ত আহকাম বের করার তিনি প্রভূত যোগ্যতা রাখেন, অপর দিকে নিজের প্রবৃত্তির

www.pathagar.com

উপর তাঁর পূর্ণ কন্ট্রোল থাকে। তদুপরি তাঁর নৈতিক অনুভূতি, খোদাভীতি এবং আখেরাতের চিন্তা-ভাবনা ও আশংকা এত অধিক পরিমাণে থাকে যে, গুনার কোন প্রবণতাই মাথা তুলতে পারে না।

তবুও নবীগণের নিষ্পাপ হওয়ার সকল কারণ শুধু এই নয়। বরঞ্চ আরো একটি আছে যা তাঁদের 'মকামে মাহমুদে' (প্রশংসিতের স্থান) উন্নীত করে। সেটা হলো আল্লাহ তায়ালার বিশেষ তদারক। এই তদারক বা সার্বক্ষণিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁদেরকে চিন্তা ও ইজতেহাদের ভুল-ভ্রান্তি থেকেও বিরত রাখে।

তারপর প্রকৃত ব্যাপার এও নয় যে, নবীর পক্ষ থেকে কোন সময়েই ইজতেহাদী ভুল হতেই পারে না। বরঞ্চ হতে পারে। কিন্তু যখনই এরূপ হয়, তক্ষুণি সংগে সংগে তাঁকে সাবধান করে দেয়া হয়। নবীর এই ইজতেহাদ (ভুল ইজতেহাদ) শরীয়তের হুকুমের রূপ নিয়ে উম্মতের মধ্যে পৌঁছাবার আগে আল্লাহ তায়ালা ইলহাম অথবা অহীর মাধ্যমে তা সংশোধন করে দেন।

অনুরূপভাবে মন্দ কাজের প্রবণতাও যখন মস্তক উত্তোলন করতে চায়, তখন স্বীয় ঈমান ও আখলাকের শক্তি তাকে দমিত ও নিষ্পেষিত করার জন্যে সম্মুখে অগ্রসর হয়। এ শক্তি কিন্তু একাকী সম্মুখে অগ্রসর হয় না। বরঞ্চ তার সাথে থাকে আল্লাহর খাস মদদ। এরপর আর সে প্রবণতা জীবন্ত থাকা সম্ভব হয় না।

চিন্তা করলে নিজেই বুঝতে পারবেন যে, যে উদ্দেশ্যে রেসালাত কায়েম করা হয়েছিল, তার জন্যে নবী নিষ্পাপ ও নির্দোষ হওয়াটা ছিল একেবারে অনিবার্য।

এমন এক ব্যক্তি, যার সম্পর্কে সর্বদা এ আশংকা থাকে যে, সে মিথ্যা কথা বলতে পারে, প্রবৃত্তির ফাঁদে পড়তে পারে, আল্লাহর ইচ্ছা ও মরযীর ভুল ব্যাখ্যা করতে পারে, তার উপরে কিভাবে আস্থা রাখা যায় যে, সে তার নবুয়তের দাবীতে সত্য এবং কোনরূপ ধোঁকা প্রবঞ্চনা সে করবে না ? অথবা খোদার নাম করে আমাদেরকে যেসব হেদায়েতের কথা সে বলছে তাকি প্রকৃতপক্ষে সবই খোদার তরফ থেকে এসেছে, না তার মধ্যে নিজের তরফ থেকে কিছু কম বেশী ও হেরফের করে বলছে ? অতপর এ ধরনের লোক আমলের কোন উচ্চ আদর্শও পেশ করতে পারে না। কারণ যার নিজের চরিত্রই কলুষ কালিমা থেকে মুক্ত নয়, সে কেমন করে অপরকে কলুষমুক্ত থাকার উপদেশ দেবে ? বস্তুত নবুয়তের কাজই চলতে পারে না যতোক্ষণ পর্যন্ত নবী তাঁর অনুসারী অনুগামীদের সামনে ইসলাম এবং আহকামে এলাহীর পরিপূর্ণ আনুগত্যের বাস্তব নমুনা পেশ না করেছেন।

www.pathagar.com

কথা এটা নয় যে, নবী নিষ্পাপ হন। বরঞ্চ নিষ্পাপ একমাত্র নবীই হয়ে থাকেন। চিন্তা ও ইজতেহাদ এবং চরিত্র ও কাজ কারবার ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত হওয়া শুধুমাত্র আল্লাহর সব খাস বান্দারই গুণ। অন্যান্য লোক দ্বীনের জ্ঞান, দূরদর্শিতা এবং নেকী ও তাকওয়ার যতোই উচ্চ শিখরে আরোহণ করুক না কেন, উচ্চতার সর্বশেষ স্তরে, যার নাম 'মাসুমিয়াত' (নিষ্পাপতা) তাঁরা কিছুতেই আরোহণ করতে পারবেন না। আবার হয়তো এমনও হতে পারে যে, কারো আখলাক ও আমল নিষ্পাপতার সীমার নিকটবর্তী হয়েছে। কিন্তু এ কিছুতেই সম্ভব নয় যে, তার চিন্তা ও ইজতেহাদী শক্তিসমূহ ত্রুটির উর্ধে হবে এবং তিনি যা কিছুই চিন্তা-ভাবনা করেন, তা অবশ্যই দ্বীন এবং আল্লাহর ইচ্ছা ও মরযী মুতাবিক।

এ আলোচনার শেষ কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ "নবী ছাড়া আর কেউ নিষ্পাপ নয়"—এ সত্যটি যতোক্ষণ পর্যন্ত অন্তরের গভীরতম প্রদেশে স্থান লাভ না করেছে ততোক্ষণ নবীর মহব্বত ও আনুগত্যের হক আদায় করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এও হতে পারে যে, মানুষ শেষে "শির্ক ফিন্নবুয়ত" (নবুয়তের অংশীদার বানানো) এর গুমরাহিতে লিপ্ত হয়ে যাবে।

নবীদের পজিশন বা মর্যাদা

নবীর নিরংকুশ আনুগত্য ও পায়রবি অবশ্য জরুরী এবং এরূপ মনে করা ঈমানের শর্ত। দ্বীন ও শরীয়তের গণ্ডির মধ্যে নবী যা কিছু বলেন, দ্বিধাহীনচিত্তে তা মেনে চলা প্রত্যেক মুসলমানের ফরয। নবীর কোন উক্তির তাৎপর্য সে বুঝতে পারুক আর না-ই পারুক, তাকে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, তা অবশ্যই মংগলজনক এবং পরিপূর্ণ সত্য ও ন্যায়সংগত। নবীর এ পজিশন স্বয়ং আল্লাহ দিয়েছেন ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط(النساء : ٦٤)

"আমি যে রসূলকেই পাঠিয়েছি, তা এ জন্যে যে, আল্লাহর নির্দেশেই তার আনুগত্য করতে হয়।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৬৪)

আবার এ আনুগত্য বাহ্যিক দিক দিয়ে হলে চলবে না। তা হতে হবে সন্তুষ্ট চিত্তে। আল্লাহ তাঁর শেষ নবীর আনুগত্যের অধিকার বর্ণনা প্রসংগে এরশাদ করেছেন ঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا○ (النساء : ٦٥)

www.pathagar.com

"অতপর, না, হে নবী ! তোমার প্রভু সাক্ষী যে, এরা কিছুতেই মুমেন হতে পারে না, যতোক্ষণ না তারা নিজেদের বিতর্কমূলক বিষয়গুলোতে তোমাকে সিদ্ধান্তকারী মেনে নেয়। অতপর তুমি যা কিছুই সিদ্ধান্ত কর, সে সম্পর্কে তাদের অন্তরে কোন দ্বিধা সংকোচ সৃষ্টি না হয়। বরঞ্চ তা তারা স্বেচ্ছায় পুরোপুরি নতশিরে মেনে নেয়।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৬৫)

আর এমন হওয়াও প্রয়োজন ছিল। এ ছাড়া নবীর অন্য কোন পজিশন বা পদমর্যাদা বিবেক চিন্তাই করতে পারে না। মানুষকে যদি আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্যের জন্যেই পয়দা করা হয়ে থাকে, আর যদি সে বন্দেগীর নিয়ম-পদ্ধতি ও তাঁর নির্দেশাবলী জানার মাধ্যমে নবী হয়ে থাকেন, তাহলে নবীর পরিপূর্ণ আনুগত্য ব্যতীত আল্লাহর আনুগত্য ও বন্দেগীর কোনই উপায়ন্তর নেই। যদি পথ চলা ব্যতীত গন্তব্যস্থানে পৌছতে না পারেন, আকাশে উড়বার যন্ত্রাদি ব্যবহার না করে যদি আকাশ পথে ভ্রমণ করতে না পারেন, তাহলে নবীর সব কথা মানা এবং তাঁর অনুসরণ ব্যতীত আল্লাহর বন্দেগীও করতে পারবেন না। এ কারণেই আপনি কোরআন মজিদে দেখতে পান যে, প্রত্যেক নবী তাঁর নবুয়তের ঘোষণা করার সাথে সাথেই দাবী করেন ঃ

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ۝(شعراء : ١٢٦)

"খোদাকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।"–(সূরা শুয়ারা ঃ ১২৬)

আসলে তাঁর (নবীর) পক্ষ থেকেই এ সত্যকে প্রকট করে দেয়া হয়— তাকওয়া এবং বন্দেগীর পথ আমার আনুগত্যের মাধ্যমেই পেতে পারো। আমিই বলতে পারি তোমাদের প্রভুর আহকাম কি এবং সেসব আহকাম কিভাবে আমল করা যেতে পারে।"

এটাই একমাত্র কারণ যার জন্যে আল্লাহ তার নিজের আনুগত্যের আদেশ করেই ক্ষান্ত হননি। বরঞ্চ اَطِيعُوا اللّٰهَ (আল্লাহর আনুগত্য কর)-এর সংগে সংগেই اَطِيعُوا الرَّسُولَ (রসূলের আনুগত্য কর)-এরও আদেশ করেছেন।

অতপর আর একটা সত্য হচ্ছে এই যে, নবী দ্বীন এবং শরীয়তের গণ্ডির মধ্যে যা কিছুই বলেন, তা সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়। একথাটি নবীর পজিশনকে আরও সুদৃঢ় ও আবশ্যক বানিয়ে দেয়। কারণ এমতাবস্থায় তা আর নবীর আনুগত্য থাকছে না, বরঞ্চ প্রকৃতপক্ষে হয়ে যাচ্ছে খোদারই আনুগত্য।

আল্লাহ বলেন ঃ

www.pathagar.com

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ج(النساء : ٨٠)

"যে রসূলের আনুগত্য করে, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য করে।"
–(সূরা আন নিসা ঃ ৮০)

এ ব্যাপারে সন্দেহের আর কোন অবকাশ নেই যে, যার আনুগত্য প্রকৃতই খোদার আনুগত্য সে আনুগত্য হতে হবে পরিপূর্ণ শর্তবিহীন ও নিরংকুশ।

মোটকথা রেসালাতের উপর ঈমান আনার এ একটা প্রকাশ্য ও বড়ো বুনিয়াদী দাবী যে, রসূলের পরিপূর্ণ আনুগত্য করতে হবে। এমন আনুগত্য যার মধ্যে কোন বাধাবন্ধন, কোন শর্ত বা উদাসীনতা থাকবে না। যে ব্যক্তি নবীর পজিশন এর নীচে মনে করে, সে সত্যিকার অর্থে নবীর উপরে ঈমানই রাখে না বলতে হবে। তার একেবারেই জানা নেই যে, নবুয়ত কাকে বলে।

একজন নবীকে অস্বীকার করাও কুফরী

রেসালাতের উপর ঈমান অর্থহীন হয়, যদি তা সমস্ত নবীগণের উপর না হয়। কোরআন ঐসব লোককে মোমেন বলে স্বীকার করে না যারা কতিপয় আম্বিয়াকে আল্লাহর রসূল মানে এবং কতিপয়কে মানে না।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ج(النساء : ١٥٠-١٥١)

"যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলদের সাথে কুফরী করে এবং আল্লাহ এবং তাঁর নবী-রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে, 'আমরা পয়গম্বরদের মধ্যে কয়েকজনকে মানব এবং কয়েকজনকে মানব না' এবং তারা ঈমান ও কুফরের মধ্যে এক (তৃতীয়) পথ আবিষ্কার করতে চায়, নিঃসন্দেহে তারাই হলো পাকা-পোক্ত কাফের।"
–(সূরা আন নিসা ঃ ১৫০-১৫১)

একথাগুলো গভীরভাবে তলিয়ে দেখুন। এ পরিষ্কার ঘোষণা করছে যে, কোন নবীকে অস্বীকার করা নিকৃষ্ট ধরনের কুফরী। আর এই একজন নবীকে অস্বীকার করার জন্যে সমস্ত নবীগণকে মেনে নেয়াটা অর্থহীন হয়ে পড়ছে। আপাতদৃষ্টিতে এ একটা বড়ো কঠোর সিদ্ধান্ত বলে মনে হয়। কিন্তু সত্যের দাবী এই ছিল যে, সিদ্ধান্ত এছাড়া আর কিছু হতে পারে না এবং একজন নবীকে অস্বীকার করাকে তার চেয়ে লঘু অপরাধ বলা যায় না।

www.pathagar.com

জানা গেল যে, যে কোন নবীই হোক না কেন, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসেন এবং তাঁরই হুকুম আহকাম মানুষের মধ্যে প্রচার করেন। অন্য কথায় সৃষ্টিজগতের প্রকৃত মালিকের পক্ষ থেকে নিযুক্ত করা প্রতিনিধি তিনি। তাকে অস্বীকার করা আসলে তাকে অস্বীকার করা হলো না, বরঞ্চ অস্বীকার করা হলো সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা ও প্রভুর কর্তৃত্ব প্রভুত্বকে। করা হলো তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা। এ ধরনের অস্বীকার ও বিদ্রোহ ঘোষণার পরে অন্যান্য নবীকে স্বীকার করার অর্থ দাঁড়ালো এই যে, যেন কোন গভর্নমেন্টের নিযুক্ত কিছু-সংখ্যক অফিসারকে তো গভর্নমেন্টের প্রতিনিধি ও প্রশাসক বলে মেনে নেয়া হলো। আর কোন একজন অফিসারকে প্রতিনিধি ও প্রশাসক বলে অস্বীকার করা হলো। এটা তো সে গভর্নমেন্টের আনুগত্য হলো না। হলো আপন মত ও প্রবৃত্তির আনুগত্য। এর অর্থ তো এই হলো যে, যেসব অফিসারকে গভর্নমেন্টের প্রতিনিধি বলে স্বীকার করা হলো সে স্বীকারোক্তি গভর্নমেন্টের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে করা হলো না, বরঞ্চ করা হলো আপন প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে। এ জন্যে এ স্বীকারোক্তিরও প্রকৃতপক্ষে কোন মূল্য রইলো না।

যারা কোন একজন রসূলকে অস্বীকার করে, আল্লাহ তাদেরকে সকল রসূলের অস্বীকারকারী বলে ঘোষণা করেন। যেমন নূহের (আ) জাতি সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنَاهُمْ ـ(الفرقان : ٣٧)

"তারা যখন আমার রসূলগণকে মিথ্যা মনে করলো (অর্থাৎ অস্বীকার করলো,) তখন তাদেরকে আমি নিমজ্জিত করলাম।"

–(সূরা আল ফুরকান ঃ ৩৭)

অথচ ঘটনা হলো এই যে, তারা তো শুধু একজন রসূলের অর্থাৎ হযরত নূহ আলাইহিস সালামের উপর মিথ্যা দোষারোপ করেছিল। অন্যান্য নবীদের প্রশ্নই তাদের সামনে ছিল না।

এখন আমরা যখন জানতে পারলাম যে, যে নবীই আসুন না কেন, খোদার নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর আনুগত্য করতে হবে। উপরন্তু, "যে আল্লাহর রসূলের আনুগত্য করে, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আনুগত্য করে"—মর্মকথা যখন এই, তখন এর সুস্পষ্ট অর্থ কি হয় না যে, কোন রসূলকে স্বীকার না করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আনুগত্য অস্বীকার করা ? এমতাবস্থায় একজন রসূলকে অস্বীকার করা কুফর ও বিদ্রোহের চরম কেন বলা হবে না ? আল্লাহর একজন রসূলকে রসূলে বরহক না মেনেই ঈমানের সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে—এটা কি নীতি ও ইনসাফের কথা ?

www.pathagar.com

রেসালাতে মুহাম্মদী

রেসালাত সম্পর্কে উপরে বিশদ ব্যাখ্যা করা হলো তা এই আকীদার শুধু একটা সাধারণ এবং নীতিগত ব্যাখ্যা। পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা নয়। এ জন্যে রেসালাতের ইসলামী আকীদার পুরাপুরি ব্যাখ্যা এটা নয়। উপরের কথাগুলোই শুধু মেনে নেয়াকে রেসালাতের ইসলামী আকীদাহ বলা যাবে না। যে কথার দ্বারা রেসালাতের ইসলামী আকীদার অর্থ পরিপূর্ণ হবে তাহলো সর্বশেষ রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই আনুগত্যকে অপরিহার্য মনে করা। অর্থাৎ নীতিগতভাবে যদিও তাঁকে আল্লাহর একজন ঐরূপ রসূল মনে করা হবে যেমন অন্যান্য রসূলকে মনে করা হয়, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে বাস্তব আনুগত্যের দিক দিয়ে দেখতে গেলে আনুগত্যের জন্যে একমাত্র তাঁকেই বেছে নিতে হবে। তার সাথে এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে যে, এখন তাঁরই আনুগত্য অত্যন্ত জরুরী। অন্যান্য সমস্ত রসূলই ছিলেন 'আল্লাহর রসূল এবং তিনিও আল্লাহর রসূল। যখন কোন ব্যক্তি উপরোক্ত আকীদায়ে রেসালাতের সাধারণ ও নীতিগত দফাগুলো মেনে নেয়ার সাথে এই খাস দফাটিও মেনে নেবে [অর্থাৎ মুহাম্মদও (সা) আল্লাহর রসূল] তখন তাকে রেসালাতের ইসলামী আকীদার উপর ঈমান আনয়নকারী বলে স্বীকার করা হবে।[১]

---

১. নবী মুহাম্মদ মুস্তফার (সা) এই স্বতন্ত্র মর্যদা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা "ইসলাম ও অন্যান্য মযহাবসমূহ" শীর্ষক অধ্যায়ে করা হয়েছে।–গ্রন্থকার

www.pathagar.com

বুনিয়াদী আমল

আরকানে ইসলাম

আকায়েদের পরে স্বাভাবিকভাবেই আমলের কথা আসে। এজন্যে ইসলামের আকীদাহ সংক্রান্ত অংশগুলো জেনে নেয়ার পর আমাদের মন আপনা আপনি তার আমল সংক্রান্ত অংশগুলোর দিকে ধাবিত হবে এবং জানতে চাইবে যে, আকীদাসমূহের পরে আমলগুলো কি যা ইসলাম পালন করার আদেশ করে। প্রকাশ্যতঃ এ একটা অত্যন্ত ব্যাপক বিষয় এবং এর জন্যে যে বিষদ আলোচনার প্রয়োজন তা পূরণ করতে গেলে তো হাজার পৃষ্ঠার একখানি গ্রন্থেও তা কুলাবে না। কিন্তু ইসলামের সাধারণ ও মোটামুটি পরিচয় জানতে হলে যা দরকার তার জন্যে এত দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন নেই। বরঞ্চ এতটুকু যথেষ্ট হবে যদি শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ ও সুস্পষ্ট হুকুমগুলোর বিশ্লেষণ করা হয়।

ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ ও সুস্পষ্ট আহকাম দু' প্রকারের ঃ

০ ঐসব আহকাম যার গুরুত্ব বেশীর ভাগ বুনিয়াদী ধরনের এবং যার স্থান ইসলামী শিক্ষার মধ্যে ঈমানিয়াতের পরে পরেই।

০ ঐসব আহকাম যার ধরন কিছুটা পৃথক এবং যার স্থান পরে আসে।

স্বাভাবিকভাবেই প্রথমত ঐসব আহকামের বিশ্লেষণ করা যাক যার দ্বীনি গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী এবং যা বুনিয়াদী ধরনের।

এমন আমল কোন্‌গুলো হতে পারে ? এ ব্যাপারে আমাদের কিয়াস ও আন্দাজ অনুমানের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা নবী করীম (সা) এসব বিষয়ের প্রতি স্বয়ং অংগুলি নির্দেশ করে গেছেন। তিনি এরশাদ করেছেন ঃ

بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدً رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ -(بخارى)

"ইসলামের প্রতিষ্ঠা পাঁচটি বস্তুর উপর। একথা ঘোষণা করা যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া, হজ্জ করা এবং রমযানের রোযা রাখা।"–(বুখারী)

একটি রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ এর পরে دَعَائِم শব্দটি বলেছেন। এ অবস্থায় বাক্যটির অর্থ এই দাঁড়ায়—ইসলামের প্রতিষ্ঠা পাঁচটি স্তম্ভের উপরে।"

www.pathagar.com

কোন প্রাসাদের স্তম্ভ না পরিপূর্ণ প্রাসাদ হয় আর না তার থেকে আলাদা বস্তু হয়। বরঞ্চ অন্যান্য বস্তুর ন্যায় সেও গোটা প্রাসাদেরই অংশ বটে। তথাপি প্রাসাদের অন্যান্য অংশ এবং এই স্তম্ভগুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। অন্যান্য বস্তুগুলো অপেক্ষা তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্বাতন্ত্র আছে। সেটা হলো এই যে, যদিও এগুলো প্রাসাদের অংশ, তথাপি এমন অংশ যে অন্যান্য অংশগুলোর অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব এসবের (স্তম্ভগুলোর) উপরে নির্ভর করে।

অতএব তওহীদ ও রেসালাতের ঘোষণা, নামায, যাকাত, হজ্জ এবং রোযা যে ইসলামের স্তম্ভ তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই ঃ

০ যেমন কোন প্রাসাদের স্তম্ভ তৈরীর পূর্বে আপনি অতিরিক্ত কোন কিছু তৈরী করেন না ; ঠিক তেমনি এই আমলগুলো (নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি) করা ব্যতীত দ্বীনের অন্যান্য শিক্ষার উপরে আমল করা যায় না। যদি কোন আমল করা হয়, তো তা হবে নামকা-ওয়াস্তে, প্রকৃত আমল হবে না।

০ এই আমলগুলো ঠিক ঠিক করা হলে, অবশিষ্ট আমল করা সম্ভব হবে। বরঞ্চ জরুরী হয়ে পড়বে। এ কারণেই একটি দ্বিতীয় হাদীসে এগুলোকে 'ইসলাম' বলা হয়েছে।

اَلْاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَآاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً ـ(مسلم)

"ইসলাম হচ্ছে এই যে, তুমি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই এবং শক্তি সামর্থ থাকলে কা'বা ঘরের হজ্জ করবে।"

–(মুসলিম)

প্রথম হাদীসে এগুলোকে 'মুসলিম' না বলে বরঞ্চ ইসলামের স্তম্ভ বলা হয়েছে। এখানে শুধু ইসলাম বলার সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, এ পাঁচটি বস্তু এমন বুনিয়াদী শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত যে, এগুলো সম্পন্ন হওয়া প্রকৃতপক্ষে গোটা ইসলাম সম্পন্ন হওয়ার নিশ্চয়তা স্বরূপ। এভাবে এগুলো ইসলামের অংশ হওয়া সত্ত্বেও যেন গোটা ইসলাম।

এগুলো ইসলামের স্তম্ভ এবং অন্য দিক দিয়ে পূর্ণ ইসলাম কেন এবং কিভাবে এর বিশদ আলোচনায় তা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। সে আলোচনা সামনে আসছে।

www.pathagar.com

শরীয়তের আমলসমূহের মধ্যে এই আমলগুলোর স্থান সকলের প্রথমে এবং এগুলোর গুরুত্ব সর্বাধিক। এসব সম্পর্কে কেতাব ও সুন্নাতের বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

১. তওহীদ ও রেসালাতের স্বীকারোক্তি

তওহীদ ও রেসালাত মুহাম্মদীর সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তি এমন এক আমল যা মুখ দিয়ে সম্পন্ন করা হয়। এ সাক্ষ্য যদিও শুধুমাত্র তওহীদ ও রেসালাতে মুহাম্মদীর সাক্ষ্য, তবুও কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ রেসালাত পরম্পরার, যাবতীয় আসমানী কেতাবসমূহের, ফেরেশতা ও আখেরাতের, আল্লাহর নির্ধারিত ব্যবস্থা সমূহের অর্থাৎ সমস্ত ঈমানিয়াতের সাক্ষ্য। কেননা যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদের (সা) নবী হওয়ার সাক্ষ্য দেবে, সে যে আপনা আপনি নবীর বর্ণিত ঐসব অদেখা গূঢ় তত্ত্ব বরহক বলে মেনে নেবে, তা বিশ্বাস করা যাবে।

আল্লাহর তওহীদ এবং রেসালাতে মুহাম্মদী প্রভৃতির উপরে অন্তর থেকে বিশ্বাস রাখা এক কথা, আর এই বিশ্বাস মুতাবিক মুখ দিয়ে তা বরহক বলে স্বীকারোক্তি করা অন্য কথা। হাদীসে আছে এবং আলেম সমাজ এ বিষয় বিশদ ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, মুমেন এবং মুসলিম বলে স্বীকৃত হতে হলে শুধু অন্তরের বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়। বরঞ্চ মৌখিক স্বীকারোক্তিও আবশ্যক। তা না হলে কারো ইসলাম নির্ভরযোগ্য হবে না। মৌখিক স্বীকারোক্তির গুরুত্ব এতটা এজন্যে যে ইসলাম এমন কোন দ্বীন নয় যে, সে শুধু কানে কানে বলে এবং তার চাহিদাও কানে কানে পূরণ হয়ে যায়। বরঞ্চ তা এমন এক দ্বীন যা মানুষকে এক উচ্চতর স্থান থেকে সম্বোধন করে এবং তাকে জীবন সংগ্রামের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দেয়। হক ও বাতিলের পারস্পরিক সংঘর্ষের মধ্যে তাকে নিক্ষেপ করে এবং কুফর ও পাপাচারের বিরুদ্ধে এক অবিরাম ও অফুরন্ত সংগ্রামের জন্যে তাকে নিযুক্ত করে। অবস্থা যখন এই তখন যারা সেই দ্বীনকে মানে তাদের কাছে সে দ্বীন অবশ্যম্ভাবীরূপে এ দাবী করবে যে, তারা তাদের নিজেদের পরিচয় উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করুক। উপরন্তু সে প্রথম দিনেই দুনিয়ার সামনে সুস্পষ্টরূপে একথা ঘোষণা করার আদেশ করবে, "আমরা ঐ জামায়াতের সদস্য এবং ঐ যুদ্ধ ক্ষেত্রের সিপাহী। আমরা ঐসব কাজ করার দৃঢ়সংকল্প নিয়ে জীবন ক্ষেত্রে অবতরণ করেছি যা করার দাবী আমাদের আকীদাহ করে।"

এদিক দিয়ে চিন্তা করলে স্বীকার করতে হবে যে, ইসলামী আকায়েদের মৌখিক স্বীকৃতি ও ঘোষণার বিরাট গুরুত্ব রয়েছে।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দিক থেকে দেখতে গেলে এ স্বীকৃতি ও ঘোষণার অধিকতর গুরুত্ব দেখতে পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি তার মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ব্যবহারিক দিক দিয়ে সে এ কালেমার চাহিদা পূরণ না-ইবা করুক এমন কি অন্তর দিয়ে তা বিশ্বাসও না করুক, কিন্তু সকল অবস্থাতেই তাকে মুসলিম সমাজের একজন লোক মনে করা হবে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সকল প্রকার অধিকার সে লাভ করবে যা একজন মুসলমান লাভ করে থাকে। কিন্তু যদি কেউ মুখ দিয়ে এ স্বীকৃতি ও ঘোষণা না করে, অন্তরে সে ইসলামের প্রতি যতোই গভীর বিশ্বাস রাখুক না কেন, তাকে মুসলমান বলে গণ্য করা হবে না। তাকে একজন অমুসলমানই মনে করা হবে। রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে তার সংগে সেই আচরণই করা হবে যা একজন অমুসলমানের সংগে করা উচিত। মুসলমানের সংগে যে আচরণ করা হয়, তা তার সংগে কিছুতেই করা হবে না।

যে ব্যক্তি ইসলামী আকায়েদ অন্তর থেকে সত্য বলে মেনে নিল, সে ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করলো। অতপর যখন সে মনের একথাটি মুখ দিয়ে ঘোষণা করলো এবং দুনিয়ার সামনে তার সত্য হওয়ার সাক্ষ্য দিল, তখন সে দ্বীনের প্রথম স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করলো।

২. নামায

দ্বীনে নামাযের গুরুত্ব

ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ নামায। এ ব্যবহারিক রুকনগুলোর তালিকার শীর্ষস্থানীয়। দ্বীনের মধ্যে তার যে স্থান, অন্য কোন আমলের সে স্থান নেই। মুমিনের প্রতিটি কাজ হয় আল্লাহর বন্দেগীর কাজ, কিন্তু নামাযের মতো বন্দেগীর মর্যাদা অন্য কোন কাজের নেই। এর শুধু বাতেনই (আভ্যন্তরীণ দিক) নয়, যাহের (বাহ্যিক দিক) ও পরিপূর্ণ বন্দেগী।

নামাযের ধরনটা দেখুন। তার দোয়া, তসবীহ এবং কেরাতের প্রতি লক্ষ্য করুন। বিনয় নম্রতা এবং মস্তক লুটিয়ে দেয়ার এমন কোন প্রকাশ ভংগী নেই, যা নামাযের যাহের এবং বাতেনের মধ্যে পাওয়া যায় না। বুকে হাত বেঁধে দৃষ্টি অবনমিত করে আদবের সাথে দাঁড়ানো ; কোমর অবনত করা, মাটিতে মাথা রাখা; মুখে আল্লাহর প্রশংসা, তসবীহ, তকবীর ও তওহীদের বাণী অহরহ জারী রাখা অন্তর আল্লাহর ভয়, মহত্ব ও মহব্বতে ভরপুর রাখা মোটকথা বন্দেগীর এমন কোন প্রকাশ ভংগী আছে যা নামাযের মধ্যে পাওয়া যায় না। কোরআন হাদীস অধ্যয়ন করে দেখুন। নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলতে সে সবের পৃষ্ঠা ভরপুর দেখতে পাবেন। তার মধ্যে কয়েকটি বিশিষ্ট বিষয় নিম্নে দেয়া হলো ঃ

www.pathagar.com

নামাযই ঈমানের প্রথম প্রকাশ। উপরের আলোচনায় দেখতে পাওয়া গেল যে, ঈমানের সাক্ষ্য দেয়ার পরই যে বস্তুটির উল্লেখ আছে তাহলো নামায। একথার দিকেই ইংগিত করে যে, যদি মানুষের মধ্যে ঈমান বিদ্যমান থাকে এবং আল্লাহ যে মাবুদ এবং নিজে যে তাঁর বান্দাহ—একথার দৃঢ় প্রত্যয় যদি অন্তরে থাকে, তাহলে তা সর্বপ্রথম নামাযেরই রূপ ধারণ করে। একথা শুধু একটি বা দু'টি হাদীসে পাওয়া যায় না, বরঞ্চ প্রায় প্রত্যেকটি এমন হাদীসে পাওয়া যাবে যার মধ্যে দ্বীনের বুনিয়াদী আমল গণনা করা হয়েছে।

এভাবে কোরআন মজিদের প্রতি লক্ষ্য করলেও দেখতে পাওয়া যাবে যে, তার স্থানে স্থানে ঈমানের পরেই নামাযের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ ـ(الخ)

"এবং ঐসব যারা ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে এবং নামায কায়েম করেছে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৭)

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتَابِ وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ ـ(اعراف : ١٨٠)

"এবং যারা আল্লাহর কেতাব মযবুত করে ধরেছে এবং নামায কায়েম করেছে।"–(সূরা আল আরাফ ঃ ১৭০)

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى ۝ (قيامة : ٣١)

"সেতো না ঈমান এনেছে, আর না নামায কায়েম করেছে।"
–(সূরা আল কিয়ামাহ ঃ ৩১)

এ বর্ণনা ভংগীতে একথাই বুঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, অন্তরে যদি ঈমানের বীজ নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে তার থেকে যে প্রথম চারাটি উৎপন্ন হবে, তাহলো নামায।

নামায যে শুধু ঈমানের সর্বপ্রথম অভিব্যক্তি তাই নয়। বরঞ্চ তা ঈমানের এক অনিবার্য অভিব্যক্তি। এ কখনো হতে পারে না যে, অন্তরে ঈমান আছে অথচ রুকূ' সেজদার জন্যে মাথা ছটফটানি নেই। ঈমান অন্তরের এক রূপান্তরের নাম। এ রূপান্তর বাইরে নামাযের রূপ ধারণ করে। অতএব যেখানে ঈমান থাকবে সেখানে নামায অবশ্যই হবে। ঠিক যেমন সূর্য থাকলে সেখানে আলোক এবং উষ্ণতা অবশ্যই থাকে। নামায যে ঈমানের অবশ্যম্ভাবী ফল, তা নবীর (সা) সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত, কোন আন্দাজ-অনুমানের কথা নয়।

www.pathagar.com

مَنْ تَرَكَ صَلٰوةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ ـ(احمد)

"যে ব্যক্তি জেনে শুনে ফরয নামায ছেড়ে দেবে, তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক নেই।"–(আহমদ)

اِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلٰوةِ ـ(مسلم)

"বস্তুতঃ মানুষ, শির্ক এবং কুফরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী হলো নামায।"
–(মুসলিম)

জিহাদ অভিযান পরিচালনার সময় নবীর (সা) নীতি ও সুস্পষ্ট ঘোষণা এই ছিল যে, কোন লোকালয় হতে যদি আযান ধ্বনি শুনা যায় তাহলে তাকে একটা মুসলিম লোকালয় মনে করতে হবে এবং তার উপর কোন আক্রমণ চালানো হবে না। পক্ষান্তরে যে লোকালয় হতে আযান ধ্বনি শুনা যাবে না, তাকে একটা কাফের লোকালয় মনে করে তার উপর আক্রমণ চালাতে হবে। নবীর এ নির্দেশ একথারই সুস্পষ্ট প্রমাণ যে নামাযই একমাত্র বস্তু যা স্বাভাবিক অবস্থায় ঈমানের এক সিদ্ধান্তকারী আলামত। একটি লোক মুসলমান না অমুসলমান, তা প্রথম সাক্ষাতেই অনুমান করা যাবে।

অনুরূপভাবে কোরআন মজিদে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিনে ফেরেশতাগণ যখন জাহান্নামীদের জিজ্ঞেস করবেন ঃ

مَاسَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ○(مدثر : ٤٢)

"কোন্ বস্তু তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে এলো।"
–(সূরা আল মুদ্দাসির ঃ ৪২)

তখন তার জবাবে তারা বলবে ঃ

لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ○ (مدثر : ٤٣)

"আমরা নামাযী ছিলাম না।"–(সূরা আল মুদ্দাসসির ঃ ৪৩)

এর থেকে জানা গেল যে, নামাযী হওয়া এবং মুমেন ও তওহীদ পন্থী হওয়া একই কথা। কেননা এ এক সর্ববাদীকৃত সত্য যে, বেহেশতী এবং জাহান্নামী হওয়া নির্ভর করে ঈমান ও কুফরের উপর। এখন অদৃশ্য গূঢ় রহস্য প্রকাশিত হওয়ার পর যদি জাহান্নামবাসীগণ একথা বলে যে, তারা নামায না পড়ার কারণে জাহান্নামে এসেছে, তাহলে কিয়ামতের দিনে ঈমান এবং নামায যে ওতপ্রোত জড়িত সেকথাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। কারণ তারা প্রত্যুত্তরে "আমরা

www.pathagar.com

মুমেন ছিলাম না।" বলার পরিবর্তে একথা বলেই শুরু করবে "আমরা নামাযী ছিলাম না।"

এসবই হচ্ছে কোরআন থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ যার ভিত্তিতে ওলামায়ে কেরাম এতটা পর্যন্ত বলেছেন যে, যে ব্যক্তি জেনেশুনে নামায ছেড়ে দিয়েছে এবং কিছুতেই পড়তে চায় না, তাকে কতল করা উচিত, দ্বীন থেকে যারা ফিরে যায় (মুরতাদ) তাদেরকে যেমন কতল করা হয়।

কেতাব ও সুন্নাত থেকে নামাযের আর একটি গুরুত্ব প্রমাণিত হয়। তাহলো এই যে, নামায গোটা শরীয়ত অনুসরণে প্রেরণার উৎস এবং তার রক্ষকও বটে। নামায আদায় হলে শরীয়তের অন্যান্য হুকুমগুলোও আদায় হতে পারবে। আর যদি নামাযের হক আদায় করা না হয়, তাহলে শরীয়তের অবশিষ্ট হুকুমগুলোরও অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করা হবে। এরূপ মনে করুন যে, মানব দেহে হৃৎপিণ্ডের যে স্থান, শরীয়তের যাবতীয় আহ্কামের মধ্যে নামাযের সেই স্থান। হৃৎপিণ্ডে যদি স্পন্দন থাকে, উত্তাপ ও জীবনীশক্তি থাকে, তাহলে দেহের অন্যান্য অংশে রক্ত চলাচল অব্যাহত থাকবে। ফলে সে দেহ জীবিত থাকবে। কিন্তু যখন এই হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও জীবনী শক্তি বন্ধ হয়ে যায়, তখন দেহের অন্যান্য অংশও শীতল এবং প্রাণহীন হয়ে পড়ে।

নামাযের এ মর্যাদার বিষয় কোরআন মজীদের কয়েক স্থানে উল্লেখ আছে এবং নবী করিমও (সা) এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। উপরের হাদীসটিতে তিনি যেমন বলেছেন যে. "ইসলামের প্রতিষ্ঠা পাঁচটি স্তম্ভের উপরে, তেমনি একথাও বলেছেন, "নামাযই দ্বীনের স্তম্ভ।"

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُوْدُهُ الصَّلٰوةُ -(ترمذى)

"দ্বীনের মস্তক হলো ইসলাম (অর্থাৎ তওহীদ ও রেসালতের স্বীকৃতি) এবং তার স্তম্ভ হলো নামায।-(তিরমিযি)

এর থেকে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, যাকাত, হজ্জ ও রোযা যদিও নামাযের মতোই দ্বীনের স্তম্ভ এবং এসব ব্যতীত দ্বীনের প্রাসাদ তৈরীই হতে পারে না, তথাপি নামাযের এমন এক বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, যার জন্যে একথা বলা যেতে পারে যে, শুধু একাকী নামাযই দ্বীনের স্তম্ভ। নামায থাকলে পরিপূর্ণ দ্বীন থাকলো মনে করতে হবে। নামায না থাকলে দ্বীনেরও অস্তিত্ব রইলো না।

হযরত ওমর (রা) তাঁর অধীন সরকারী কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে লিখিত নির্দেশনামায় বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

اِنَّ اَهَمَّ اُمُوْرِكُمْ عِنْدِى الصَّلٰوةُ مَنْ حَفِيْظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِيْنَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا ضَيِّعٌ -(مالك)

"আমার কাছে তোমাদের যাবতীয় বিষয়ের মধ্যে নামায সবচেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে ব্যক্তি নামাযের রক্ষণাবেক্ষণ করলো এবং তার পুরোপুরি হক আদায় করলো, সে তার গোটা দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণ করলো। আর যে ব্যক্তি তার নামায নষ্ট করলো, সে অবশিষ্ট সবকিছুই আরো নষ্ট করে ফেলবে।-(মালেক)

নামাযের এ গুরুত্ব কেন

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কেতাব ও সুন্নাতের যেসব সাক্ষ্য আমাদের সামনে এসেছে, তাতে নামাযের এরূপ স্থান ও মর্যাদাই প্রমাণিত হয়। ফলে মনের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে এ প্রশ্ন জাগে যে নামাযের এ স্থান ও মর্যাদা কেন? এ কেমন কথা যে শরীয়তের একটা অংশ হয়ে গোটা শরীয়ত এবং একটা আমল হয়েও আসল ঈমান সেই?

এ প্রশ্নের উত্তর আর একটি প্রশ্নের মধ্যে পাওয়া যাবে। তা হচ্ছে এই যে, এ নামায বস্তুটি কি এবং তার মর্মকথাই বা কি?

কোরআন মজিদ বলে, আল্লাহর স্মরণের নাম নামায ঃ

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ٥ (طه : ١٤)

"আমার স্মরণের জন্যে নামায কায়েম কর।"-(সূরা ত্ব-হা ঃ ১৪)

আরও বলে যে নামায বান্দাহকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয় ঃ

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (العلق : ١٩)

"সেজদা কর এবং নিকটবর্তী হয়ে যাও।"-(সূরা আল আলাক ঃ ১৯)

নামায নামাযীকে খোদার এতটা নিকটবর্তী করে দেয় যে, অন্য কোন আমলের দ্বারা এবং অন্য কোন অবস্থায় এতটা নিকটবর্তী কিছুতেই হওয়া যায় না।

اَقْرَبُ مَايَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهٖ وَهُوَ سَاجِدٌ -(مسلم)

"বান্দাহ যখন সেজদায় থাকে, তখন সে তার প্রভুর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়।"-(মুসলিম)

www.pathagar.com

এতটা নিকটবর্তী হয় যে, সে সময়ে অন্য সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার প্রভু ও মালিকের সান্নিধ্যে হাযীর হয় এবং তাঁর সংগে কথোপকথনে লিপ্ত হয়।

اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا صَلّٰى يُنَاجِىْ رَبَّهُ ـ(بخارى)

"অবশ্য অবশ্যই তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ে তখন সে তার প্রভুর সাথে কথা বলে।"–(বুখারী)

আল্লাহর স্মরণ, তাঁর নৈকট্য, তাঁর সান্নিধ্য, তাঁর সাথে কথোপকথন—এ কয়টি ব্যতীত দ্বীনের রূহ এবং বন্দেগীর মেরাজ (সর্বোচ্চ সোপানে আরোহণ) কি সম্ভব ? না, কখোনই না। খোদার বন্দেগীসূলভ আমল ঈমানেরই ফল এবং আল্লাহর স্মরণের দ্বারাই ঈমান বৃক্ষের মূলে আর্দ্রতা ও সজীবতা লাভ হয়। যেমন নবী (সা) বলেছেন ঃ

جَدِّدُوْا اِيْمَانَكُمْ بِقَوْلِ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ(بخارى)

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জপ করে ঈমানকে সতেজ কর।"–(বুখারী)

যে বৃক্ষমূলে আর্দ্রতা ও সজীবতা পৌঁছে না, তা শুষ্ক হয়ে যায়। ফুলফল দেয়া তার বন্ধ হয়ে যায়। অতএব যে ব্যক্তির হৃদয় আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ, তার ঈমান শুষ্ক হয়ে যায়। আর ঈমান শুষ্ক হয়ে পড়লে তার আমল নেকি এবং খোদাভীতির আমল হতে পারে না। নেকি ও খোদাভীতির আমল শুধু সেই ব্যক্তিরই হতে পারে, যার মধ্যে ঈমানের সজীবতা বিদ্যমান আছে। আর ঈমান সজীব থাকে আল্লাহর ইয়াদ বা স্মরণের দ্বারা। নামায শুধু আল্লাহর ইয়াদই নয়। বরঞ্চ তাঁর ইয়াদের সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে পূর্ণাংগ এবং সবচেয়ে ফলপ্রসু পন্থা। অতএব নেকি এবং খোদাভীতি নামাযের উপরই নির্ভর করে।

এ মর্মকথা আর একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাবার চেষ্টা করি। বাদশাহর যে পারিষদ তাঁর দরবারে হাযীরি দেয় না, এবং হাযীরি দিলেও আন্তরিক শ্রদ্ধা ও আস্থা সহকারে নয়, তার থেকে কখনো এ আশা করা যায় না যে, সে বাদশাহর ফরমান পালন করে চলবে এবং আন্তরিকতার সাথে তাঁর আনুগত্য করবে। এ আশা তো ঐ ব্যক্তির কাছে করা যায়, যে প্রতিদিন দরবারে হাযীর হতে এবং সালাম ও আদাব করতে কুণ্ঠিত হয় না। একথা সত্য যে, যে ব্যক্তি আপনার সামনে হাযীর হয়ে আপনার প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যের গতানুগতিক অভিব্যক্তিও করে না, সে আপনার ইচ্ছা ও আদেশ পালনের জন্যে নিজের রক্ত তো দূরের কথা, ঘর্ম দিতেও পারবে না।

www.pathagar.com

নামায প্রকাশ্যভাবেই আল্লাহর দরবারে হাযীরি, সালামি এবং আনুগত্যের শপথ। যে ব্যক্তি এই হাযীরি এবং সালামির জন্যে আন্তরিক কোন আগ্রহ প্রকাশ করে না, সে জীবনের বিশাল ক্ষেত্রে পদে পদে তাঁর কঠিন আদেশাবলী কিভাবে পালন করতে পারবে?

নামাযের কিছু অতিরিক্ত উদ্দেশ্য

নামাযের আসল গুরুত্ব ও তার প্রকৃত মহত্ব উপরের আলোচনায় সুস্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু সে অনেক অতিরিক্ত বরকতও ধারণ করে। এসব বরকত নামাযের আসল উদ্দেশ্যের তুলনায় অবশ্যি অতিরিক্ত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান। এগুলো মানুষকে সঠিক ইসলামী মন-মস্তিষ্ক এবং বাঞ্ছিত ইসলামী জীবন দান করার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ভূমিকা পালন করে। এ জন্যে এসব জানা দরকার। নামাযের এসব "অতিরিক্ত বরকতকে" তার "অতিরিক্ত উদ্দেশ্য" বলাই ঠিক হবে। তার কিছু নিম্নে দেয়া হলো ঃ

☐ ইসলাম তার অনুসারীদেরকে একথা বলে যে, তারা সকলে যে একই মিশনের ধ্বজাবাহক—এ গভীর অনুভূতি যেন তাদের মধ্যে থাকে। এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজন যে তারা একটা সুসংগঠিত সামাজিক জীবন যাপন করে। তাদের একজন নেতা বা পরিচালক হবেন, যিনি নিজে শরিয়তের হুকুম মেনে চলবেন এবং গোটা সমাজকে শরিয়তের উপরে চালাবেন। শরিয়তের ব্যবস্থা কায়েম রাখবেন। মানুষ একটি সুসংগঠিত ও ট্রেনিং প্রাপ্ত সেনাবাহিনীর মতো হবে। আর ইনি হবেন তাদের সেনাধ্যক্ষ। তিনি যখনই তাদেরকে চলার আদেশ করবেন, তখন তারা চলতে শুরু করবে। আর যখনই থামতে বলবেন, থেমে যাবে। নামায শৃংখলা এবং আনুগত্যের ঠিক এ ধরনেরই পাকাপোক্ত মেজাজ মানসিকতা তৈরী করে। আযান হওয়ার সাথে সাথেই লোক তাদের ঘর-বাড়ী, দোকান-পাট ও ক্ষেত-খামার থেকে বেরিয়ে পড়ে। সকলে মসজিদের দিকে চলতে থাকে। এখানে আসার পর একজন ইমামের পেছনে তীরের মতো সোজা কাতারবন্দী হয়ে যায়। ইমামের সাথে সাথে, তাঁর ইশারায় সকলেই এক সাথে ওঠে, বসে এবং অবনত হয়। কারো সাধ্য নেই যে, সে ইমামের আনুগত্য থেকে মনের দিক দিয়ে হোক, অথবা আমলের দিক দিয়ে হোক, এক রতি সরে যেতে পারে। আর এসব কিছুই করা হয় আল্লাহর হুকুম, দ্বীনের ফরয কাজ এবং আখেরাতের কাজ মনে করে। নামাযের মধ্যে যে ধরনের শৃংখলা, ডিসিপ্লিন এবং হুকুম পালনের মানসিক এবং ব্যবহারিক ট্রেনিং পাওয়া যায়, তার চেয়ে উন্নত ধরনের আর কোন প্রকারে হতে পারে কি?

☐ এভাবে ইসলাম তার অনুসারীদের মধ্যে অত্যধিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ দেখতে চায়। সত্যিকার মুমেন হওয়ার চিহ্ন এই বলা হয়েছে যে,

www.pathagar.com

প্রত্যেকে তার মুসলমান ভাইয়ের জন্যে তাই পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্যে করে। নামায ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের এই অনুভূতি পূর্ণ শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করে এবং সর্বদা সে অনুভূতির লালন পালন করে। মহল্লা এবং বস্তির সমস্ত মুসলমান যখন তাদের প্রভুর দরবারে হাযীর হয়, তখন শুধু তাদের পা ও কাঁধই পরস্পর মিলিত হয় না, বরঞ্চ একদিক দিয়ে তাদের হৃদয়ও পরস্পর মিলিত হয়ে যায়। তারা তাদের প্রভুর কাছে শুধু নিজেদেরই জন্যে দোয়া ও প্রার্থনা করে না। বরঞ্চ সকলেরই হেদায়েত কামনা করে। সকলের জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা চায় এবং সকলের জন্যে সাহায্য প্রার্থনা করে। খোদার অন্যান্য বান্দাহদের মহব্বত ভালোবাসার হক আদায় করার এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর ও উন্নততর আর কোন পন্থা হতে পারে কি যে, মানুষ তার মালিক প্রভুর কাছে সবিনয়ে তাঁর করুণা ভিক্ষার সময়ে অন্যদেরকে ভুলে যায় না ? এ বিশেষ মুহূর্তগুলোতে সে অবিরাম ডাকতে থাকে ঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ

"(হে খোদা !) আমাদের সকলকেই তুমি সঠিক পথ দেখাও।"

وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ـ

"আমাদের সকলের উপরে এবং নেক বান্দাহদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক।"

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً ـ(البقرة : ٢٠١)

"আমাদের সকলকে দুনিয়াতেও মংগলদান কর এবং আখেরাতেও।"

দুনিয়ায় পারস্পরিক চরম ভালোবাসার কোন উচ্চতম মান নির্ধারিত থাকলে, নিশ্চিতরূপে জেনে রাখা দরকার যে, তা উপরোক্ত মান থেকে অবশ্যই নিম্নস্তরের হবে।

□ ইসলাম সমগ্র মানবজাতিকে একই প্রভুর গোলাম এবং একই মা-বাপের সন্তান বলে ঘোষণা করে। তাদের প্রতি এ আদেশ দেয়া হয়েছে যেন তারা সকলে নিজেদেরকে এরূপই মনে করে ঃ

كُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا ـ (حديث)

"তোমরা সকলে আল্লাহর বান্দাহ এবং পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও।"
–(হাদীস)

www.pathagar.com

কেউ যেন কাউকে নীচ এবং নিকৃষ্ট মনে না করে। বর্ণ, দেশ, বংশ, গোত্র অথবা ধন-দৌলতের ভিত্তিতে কেউ বড় এবং ছোট যেন না হয়। উচ্চমর্যাদা কারো লাভ হলে হতে পারে একমাত্র খোদাভীতি এবং নেকির ভিত্তিতে ঃ

الاَّ بِدِيْنٍ اَوْ تَقْوٰى

নামায এই মর্মকথার অনুভূতি ভেতর ও বাহির থেকে জাগ্রত করে দেয়। প্রকাশ থাকে যে, এভাবে নামাযের মধ্যে না কেউ 'গোলাম' থাকে, আর না কেউ 'গোলামের মনিব'।

ফারূকে আযম (রা) এবং একজন হাবশী গোলাম উভয়ে একত্রে একই কাতারে দাঁড়িয়ে যান। একই মাটিতে সকলের কপাল লুণ্ঠিত হয়। বাতেনী দিক দিয়ে নামাযের মধ্যে সকলের অন্তকরণে উচ্চতা ও নীচতার একই ধারণা প্রতিফলিত হয়। তা হচ্ছে এই যে সমস্ত উচ্চতা ও মহত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ এবং এমন আর কেউ নেই যে, প্রকৃত মহত্বের কণামাত্র অধিকারী হতে পারে। আমাদের প্রত্যেকের কোন পজিশন থাকলে তা হচ্ছে এই যে, আমরা শুধু তাঁর বান্দাহ্ ও গোলাম। নামায যে ব্যক্তিকে তার পজিশন সম্পর্কে এ অনুভূতি দান করে, সে বর্ণ, বংশ অথবা ধন-দৌলতের নেশায় কখনো প্রবঞ্চিত হতে পারে না। অন্যান্যের তুলনায় নিজকে উচ্চও মনে করতে পারে না।

বাঞ্ছিত নামায

যে নামাযের এসব প্রকৃত ও অতিরিক্ত উদ্দেশ্য-উপকারিতা বর্ণনা করা হলো, তা ভালো করে জেনে নিতে হবে। কেননা প্রত্যেক নামাযই নামায নয়। যেমন প্রত্যেক মানুষকে মানুষ বলা যায় না। যে নামাযের হুকুম আল্লাহ দিয়েছেন, যে নামায দ্বীনের শুধু স্তম্ভই নয়, স্তম্ভ শ্রেষ্ঠ, তা অস্তিত্বই লাভ করে না যদি তা ঠিক মত আদায় করা না হয়। ঠিকমত আদায় করার জন্যে কেতাব ও সুন্নাত একটি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করেছে। তাহলো "একামত" অর্থাৎ নামায কায়েম করার শব্দ। উপরে বর্ণিত হাদীসগুলোতে এবং কোরআন মজীদের স্থানে স্থানে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। নামায কায়েমের মর্ম দু'টি কথায় বলা যেতে পারে। তা এই যে, নামাযকে তার সমুদয় যাহেরী আদাব (বাহ্যিক প্রকাশ পদ্ধতি) এবং বাতেনী গুণাবলীসহ আদায় করা।

এসব আদব কায়দা ও গুণাবলীর বিশদ বিবরণ কোরআন সুন্নাহ এবং ফেকার গ্রন্থাবলীতে তালাশ করলে সহজেই পাওয়া যাবে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, নামায কায়েম করা হবে যদি তা ঠিক সময়ে এবং জামায়াতের সংগে পড়া হয়। ধীরে ধীরে ও থেমে থেমে এবং তার যাবতীয় কায়দা-কানুন

www.pathagar.com

সহ যদি পড়া হয়। যদি পড়া হয় কেরাত স্পষ্ট করে এবং আল্লাহর প্রতি মনের পূর্ণ একাগ্রতার সাথে। যদি দীর্ঘ করা হয় কিয়াম, রুকূ' এবং সেজদা। শরীরে যদি পরিস্ফুট হয় আদব-শিষ্টাচার এবং বিনয়-নম্রতা। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, অন্তকরণ যদি ডুবে থাকে আল্লাহর স্মরণে, ভীত-সন্ত্রস্ত হয় তাঁর ভয়ে এবং ভরপুর থাকে বিনয়-নম্রতায়। যে নামাযের মধ্যে এসব বিষয়ের ব্যবস্থা থাকবে, সেই নামাযই হবে প্রকৃত অর্থে নামায। যার মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলী যত বেশী পরিমাণে থাকবে, নামায হবে তত বেশী উচ্চমানের। যে নামাযে এসব গুণাবলী ন্যূনতম পরিমাণেও পাওয়া যাবে না, সে নামায দেখতে নামাযের মতো হলেও তা প্রকৃত নামায কখোনই হবে না। আর নামাযের যে উপকারিতা তাও সে নামায থেকে পাওয়া যাবে না। এ ধরনের নামায ইসলামের ঐরূপ স্তম্ভ হতে পারে, যেমন একটি দুর্গের জন্যে বালুর প্রাচীর।

উপরে নামাযের প্রকৃত এবং অতিরিক্ত যেসব উপকারিতার কথা বলা হলো, তা শুধু নামাযের উপকারিতাই নয়। বরঞ্চ নামাযের কষ্টিপাথর। এসব সামনে রেখেই বুঝতে পারা যাবে, আমাদের নামাযের দেহ কাঠামোর মধ্যে আত্মা কতটুকু আছে এবং তা কতদূর পর্যন্ত কায়েম করা হচ্ছে। আর এটাও জানতে পারা যাবে যে, আমাদের নামায ইসলামের স্তম্ভ হতে পেরেছে কিনা। যদি হয়ে থাকে তো কি পরিমাণে।

৩. যাকাত

যাকাতের গুরুত্ব

ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ হলো যাকাত। বলা হয়েছে যে, শরীয়তের মধ্যে কোন আমলের অতটা গুরুত্ব নেই, যতটা আছে নামাযের। অতএব একথা কিছুতেই বলা যায় না যে, যাকাতও দ্বীনের মধ্যে নামাযের মতোই মর্যাদা রাখে। কিন্তু এ সম্পর্কে কেতাব ও সুন্নাতে যা কিছু বলা হয়েছে, তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে তার স্থান নামায হতে একধাপ নীচে মাত্র। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দু'টি বিষয়ে লক্ষ্য রাখুন ঃ

☆ কোরআন মজীদের অধিকাংশ স্থানে ঈমানের পরে শুধু দু'টি নেক আমলের কথা আছে। একটি নামাযের। অপরটি যাকাতের। অর্থাৎ যখন একটি উচ্চমানের মুমেনের ধারণা সামনে আসে তখন সাধারণতঃ এ ধরনের শব্দাবলী ব্যবহার করা হয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج(البقرة : ٢٧٧)

www.pathagar.com

"বস্তুতঃ যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, নামায কায়েম করেছে ও যাকাত দিয়েছে, তাদের জন্যে তাদের প্রভুর কাছে রয়েছে বিরাট প্রতিদান।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৭)

অথচ নামায এবং রোযার সাথে এমন অনেক নেক আমল ও আখলাক আরও আছে, যা থাকা একজন উচ্চস্তরের মুমেন ও মুসলিম হওয়ার জন্যে জরুরী। তাহলে কোরআন হাকিম এমন বর্ণনাভংগী কেন অবলম্বন করলো ? এবং উচ্চস্তরের মুমেন ও মুসলিমের ধারণা দিতে গিয়ে অনেক সময় ঈমানের পরে নামায ও যাকাতের নাম নিয়ে নীরব কেন ? অন্যান্য নেক আমলের কথা কেন বলে না ? মনে রাখতে হবে যে, আলোচনার এ প্রকাশভংগী সে অযথা অবলম্বন করেনি। চিন্তা করলে তার কারণ এছাড়া আর কিছু হতে পারে না যে, আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে নামায এবং যাকাত—এ দু'টি বস্তু দ্বীনের আসল বাস্তব ভিত্তি। যে ব্যক্তি এ দু'টি ভালোভাবে আদায় করলো, সে যেন গোটা দ্বীনের উপর পাকাপোক্ত নিশ্চয়তা এবং বাস্তব সাক্ষ্যদান করলো। এখন তার থেকে এ বিষয়ের আর কোন আশংকা রইলো না যে, শরীয়তের অন্যান্য আহকাম থেকে সে বেপরোয়া থাকবে। এরূপ কেন ? এর জবাব এক দিকে দ্বীনের এবং অপর দিকে নামায ও যাকাতের মর্মকথা ও উদ্দেশ্যের দিকে নজর দিলে আপনি পেয়ে যাবেন। দ্বীনের আহকাম নীতিগতভাবে ভাগ করলে তা দু' প্রকার হতে পারে। এক প্রকার যার সম্পর্ক আল্লাহর হকের সংগে এবং দ্বিতীয় প্রকারের সম্পর্ক বান্দাহর হকের সংগে। এমনি দ্বীনের অনুসরণ হলো আসলে এই যে, বান্দাহ একাধারে আল্লাহর এবং বান্দাহর হকসমূহ আদায়ের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করবে। নামাযের যে মর্মকথা আমরা জানতে পারলাম এবং যাকাতের যে মর্মকথা সামনে আসছে এ দু'টি থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, নামায আল্লাহর হক আদায়ের এবং যাকাত বান্দাহর হক আদায়ের সর্বোত্তম পন্থা। যদি এক ব্যক্তি মসজিদে নামাযের হক আদায় করলো, তাহলে এটা আর সম্ভব নয় যে, সে ব্যক্তি মসজিদের বাইরে এসে আল্লাহর হক ভুলে যাবে। ঝর্ণা থেকে যেমন পানির স্রোত প্রবাহিত হয়, তেমনি আল্লাহর হক অবিরাম আদায় হতে থাকবে। ঠিক তেমনি যে ব্যক্তি যাকাতের হক আদায় করলো, তার থেকে এ আশংকা করা যায় না যে, সে খোদার বান্দাহদের হক নষ্ট করতে থাকবে। যে ব্যক্তি তার কষ্টে উপার্জিত অর্থ তার আপন ভাই-বেরাদর ও পাড়া-প্রতিবেশীদের জন্যে সন্তুষ্টচিত্তে ব্যয় করে এবং ব্যয় করে তাদেরকে কৃতজ্ঞ বানাবার পরিবর্তে নিজেই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার জন্যে সে তাদের এক একটি করে হক আদায় করেই নিশ্চিন্ত হবে।

তারপর আর এক দিক দিয়ে দেখুন। কোরআন এ সত্যটিকে বারবার তুলে ধরেছে যে, দ্বীন এবং ঈমানের মধ্যে সজীবতা তখনই আসতে পারে যখন

www.pathagar.com

আল্লাহর ভালোবাসা প্রত্যেক ভালোবাসার উপর বিজয়ী হবে এবং দুনিয়ার চাহিদার উপরে আখেরাতের চাহিদা অগ্রগামী হবে। মানুষকে এ ধরনের খোদাভক্ত এবং আখেরাত অভিলাষী করে তৈরী করার জন্যে নামায ও যাকাত অত্যন্ত ফলপ্রসু পন্থা। একটা ইতিবাচক। অন্যটা নেতিবাচক। নামায মানুষকে আল্লাহ এবং আখেরাতের দিকে নিয়ে যায় এবং যাকাত তাকে দুনিয়ার দিকে যাবার জন্যে নিরাপদে ছেড়ে দেয় না। অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের সাফল্যের পথ যদি অত্যন্ত খাড়া হয়, তাহলে এ দু'টি বস্তু ঐপথে ভ্রমণকারী মানুষের আমলের দু'টি ইঞ্জিন স্বরূপ হয়ে যায়। নামাযের ইঞ্জিন তাকে আগের দিকে টানে এবং যাকাতের ইঞ্জিন তাকে পেছন দিক থেকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে দেয়। এভাবে এ গাড়ী বরাবর সামনের দিকে এগুতে থাকে। অবস্থা যখন এই, তখন এ দু'টিকে ন্যায়সংগতভাবেই দ্বীনের আসল বাস্তব ভিত্তি বলা যেতে পারে।

☆ কোরআন যখন মুসলমানদেরকে কাফেরের সংগে যুদ্ধ করার শেষ আদেশ দেয়, তখন একথা বলা হয়, "ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের তরবারি কোষবদ্ধ হতে পারবে না যতোক্ষণ পর্যন্ত না দুশমন খতম হয়েছে। অথবা ঐ দ্বীন তারা কবুল না করেছে যা তাদেরকে বুঝার জন্যে বিশ বাইশ বছরের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে।"

তাদের ইসলাম গ্রহণ কখন নির্ভরযোগ্য হবে এবং এর ভিত্তিতে কখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহাদি বন্ধ করে দেয়া হবে, একথা বলার জন্যে কোরআন ঘোষণা করলো ঃ

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ـ(توبه : ٥)

"অতপর যদি তারা কুফর থেকে তাওবা করে, নামায কায়েম করতে থাকে এবং যাকাত দিতে থাকে, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।"

–(সূরা আত তওবা ঃ ৫)

সামনে অগ্রসর হওয়ার পর আবার ঘোষণা করা হলো ঃ

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ـ(توبه : ٥)

"অতএব যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তাহলে এখন তারা তোমাদের ভাই হবে।"–(সূরা আত তওবা ঃ ১১)

কোরআনের এ বিশদ বর্ণনা থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, কোন কোন মুসলমানের মুসলমান ঘোষিত হওয়াটা কালেমায়ে শাহাদাত আদায় করার

www.pathagar.com

পরেও দু'টি জিনিসের উপর নির্ভর করে। একটি নামায কায়েম করা এবং অপরটি যাকাত দেয়া। যতোক্ষণ পর্যন্ত সে এরূপ না করেছে ততোক্ষণ পর্যন্ত তার মুসলমান হওয়াটা স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য হতে পারে না। এখন বুঝতে পারা গেল যে, কুফর থেকে তওবা করার পর ইসলামের গন্ডির মধ্যে প্রবেশ করার জন্যে যাকাত একটি জরুরী আলামত এবং অপরিহার্য শর্ত। নবী করীম (সা) এর বিশ্লেষণ করে বলেন ঃ

اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ فَاِذَا فَعَلُوْاهُ عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَائَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ ـ(مسلم)

"আমাকে আদেশ করা হয়েছে যেন আমি ওদের (আরববাসীর) সংগে যুদ্ধ করতে থাকি, যতোক্ষণ না তারা আল্লাহ তায়ালার মাবুদ হওয়ার এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছে, যতোক্ষণ না নামায কায়েম করেছে এবং যাকাত দিয়েছে। যখন তারা এসব করবে, তখন তারা আমার কাছ থেকে নিজেদেরকে এবং নিজেদের ধন-সম্পদকে নিরাপদ মনে করবে। তারপর তাদের হিসাব নিকাশ আল্লাহর হাতে।"–(মুসলিম)

শুধু এই নয় যে, যাকাত আদায় ব্যতীত কোন কাফেরের মুসলমান হওয়াটা নির্ভরযোগ্য নয়, বরঞ্চ যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে, তারাও যদি যাকাত দিতে অস্বীকার করে, তাহলে ইসলামী হুকুমত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে।

হযরত আবু বকরের (রা) খেলাফতের সময় কিছু লোক (মুসলমান) যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল বলে তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। হযরত ওমর (রা) তাঁর সিদ্ধান্ত নির্ভুল হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তখন তিনি বলেন ঃ

وَاللّٰهِ لَاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ـ(مسلم)

"খোদার কসম, আমি ঐসব লোকের বিরুদ্ধে লড়বো যারা নামায এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে।"–(মুসলিম)

একথার পর হযরত ওমর (রা) এবং সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম হযরত আবু বকরের (রা) সাথে একমত হন। এর থেকে জানা গেল যে, কোন মুসলমানেরও জানমাল ঐ সময় পর্যন্ত শ্রদ্ধার যোগ্য হয় না, যতোক্ষণ না সে

www.pathagar.com

নামাযের ন্যায় যাকাতও আদায় করে। কোন ব্যক্তি নামাযের হুকুমের উপর আমল করে, কিন্তু যাকাতের হুকুত পালন করে না এবং এভাবে দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য করে, তাহলে অবশ্য অবশ্যই তার সাথে সেই ব্যবহার করা হবে যা করা হয় একজন বে-নামাযীর সাথে। অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।

এ ব্যাপারে কোরআনের দু'টি আয়াত প্রণিধানযোগ্য ঃ

.....وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ

"ধ্বংস ঐসব মুশরিকদের জন্যে যারা যাকাত দেয় না এবং আখেরাতকেও যারা অস্বীকার করে।"–(সূরা হা-মীম-সিজদা ঃ ৬-৭)

..... فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ -

"অতএব আমি আমার রহমত ঐসব লোকদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেব যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাকাত দেয় এবং যারা আমার আয়াতসমূহের উপর আস্থাবান।"–(সূরা আল আরাফ ঃ ১০৬)

প্রথম আয়াতে আমরা দেখছি যে, যাকাত না দেয়াকে শির্ক এবং আখেরাত অবিশ্বাসের একটি সিদ্ধান্তকর আলামত বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আয়াতে যাকাত দানকে তাকওয়া এবং ঈমানের অকাট্য সাক্ষ্য বলে গণ্য করা হয়েছে। এভাবে এ দু'টি আয়াত একই সত্য উদঘাটিত করেছে এবং একথা ঘোষণা করছে যে, যাকাতও ঈমানের একটা অপরিহার্য অভিব্যক্তি। যেখানে ঈমান থাকবে সেখানে যাকাত অবশ্যি আদায় হবে।

কেতাব ও সুন্নাতের এ দু'টি বর্ণনা দ্বীনের মধ্যে যাকাতের স্থান সুস্পষ্ট করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। এ দু'টির আলোকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, যাকাত ব্যতীত দ্বীনের প্রাসাদ কিছুতেই নির্মাণ করা যায় না এবং তাকেও যে ইসলামের একটা স্তম্ভ হিসাবে গণ্য করা হবে এ এক অনস্বীকার্য সত্য।

যাকাতের উদ্দেশ্য

এখন এটাও বুঝে নেয়া উচিত যে, যাকাত কি জন্যে ফরয করা হয়েছে এবং কোন্ উদ্দেশ্য এর থেকে হাসিল করা যায়। এ সম্পর্কে কেতাব ও সুন্নাতে যা কিছু বলা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে যে, যাকাতের তিনটি উদ্দেশ্য একটি বুনিয়াদী ও ব্যক্তিগত। অন্য দু'টি স্থানীয় ও সামাজিক।

১. **আত্মশুদ্ধি ঃ** যাকাতের সত্যিকার এবং বুনিয়াদি উদ্দেশ্য, যার সম্পর্ক সাধারণতঃ ব্যক্তি সত্তার সাথে তাহলো এই যে, যাকাত দাতার অন্তর দুনিয়ার

www.pathagar.com

লোভ-লালসা থেকে পাক হবে এবং পাক হওয়ার পর নেকী ও তাকওয়ার জন্যে তৈরী হয়ে যাবে।

কোরআন মজীদ বলে ঃ

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَىۙ الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰىۚ (ليل : ١٧-١٨)

"এবং এই জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে ঐ ব্যক্তিকে যে আল্লাহকে ভয় করে, যে নিজের মাল অপরকে দান করে নিছক পাক হওয়ার জন্যে।"

-(সূরা আল লাইল ঃ ১৭-১৮)

আর একস্থানে নবীকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا -(توبه : ١٠٣)

"তাদের ধন-সম্পদ থেকে তুমি সদকা গ্রহণ কর, যাতে করে তুমি তাদেরকে পাক-সাফ করতে পার এবং তাদের আত্মশুদ্ধি করতে পার।"

-(সূরা আত তওবা ঃ ১০৩)

এসব আয়াত থেকে জানা গেল যে, সদকা ও যাকাতের আসল উদ্দেশ্য হলো দিলকে পাক-সাফ করা এবং আত্মশুদ্ধি করা। প্রত্যেকে জানে যে, দুনিয়ার মহব্বতই খোদাপুরস্তির আসল দুশমন। এ মানুষকে খোদা এবং আখেরাত থেকে দূরে সরে রাখে। যেমন নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

حُبُّ الدُّنْيَا رَاْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ -

"দুনিয়ার মহব্বত প্রত্যেক পাপের মূল।"-(মিশকাত)

এ মহব্বত যদিও দুনিয়ার বহু কিছুর সাথেই হয়, কিন্তু সবচেয়ে অধিক শক্তিশালী এবং ভয়ংকর মহব্বত হয় ধন-সম্পদের সাথে। নবী করীমও ধন-সম্পদকে উম্মতের জন্যে সবচেয়ে বড়ো ফেৎনা বলে উল্লেখ করেছেন।

فِتْنَةُ اُمَّتِىَ الْمَالُ -

"আমার উম্মতের জন্যে ধন-সম্পদই হলো ফেৎনা।"-(তিরমিযী)

এ জন্যে যদি কোন ঈমানদার ব্যক্তি ধন-সম্পদের আকর্ষণ থেকে নিজকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, তাহলে অন্যান্য বহুবিধ জিনিসের মহব্বত থেকে বাঁচার পথ আপনা আপনি খুলে যাবে। এভাবে একটি ফাঁদ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারলেই অন্যান্য বহু ফাঁদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। দুনিয়ার এসব ফাঁদ থেকে মনের স্বাধীনতাকে বলা হয় মনের পবিত্রতা। যাকাত যেহেতু মানুষের মনকে

www.pathagar.com

এ স্বাধীনতাই দান করে, এ জন্যে সত্যি সত্যি সে মনকে পাক-সাফ করে। অতপর যেহেতু দুনিয়ার বন্ধন থেকে আযাদ ও পাক-সাফ হয়ে যাওয়ার পর মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতের সাফল্যের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয় ও নেক কাজের দিকে আকৃষ্ট থাকে, সে জন্যে যাকাতের প্রভাব দিলকে পাক করার একটা নেতিবাচক প্রচেষ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরঞ্চ নিশ্চিতরূপেই তাকে পাক-সাফ করে রেখে দেয়। অতপর মনের শুভশক্তি কর্মতৎপর হয়ে পড়ে। এই হলো মনস্তাত্বিক মর্মকথা যা উপরে বর্ণিত আয়াত দু'টির মধ্যে পাওয়া যায়।

যাকাতের এই হলো বুনিয়াদী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যার জন্যে শরীয়ত এ আমলটির নাম দিয়েছে যাকাত।

যাকাতের শাব্দিক অর্থ পবিত্রতা ও বর্ধন। আপন অর্জিত অর্থের একটা অংশ অভাবগ্রস্তদের মধ্যে নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে বন্টন করাকে যাকাত এজন্যে বলা হয় যে, তার থেকে পবিত্রতা লাভ হয় এবং ধন বর্ধিত হতে থাকে।

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, যাকাতের এই মৌলিক উদ্দেশ্য শুধু এতটুকুতেই হাসিল করা যায় না যে, আপন অর্থের একটা অংশ কোন গরীবকে দিয়ে দেয়া হলো। বরঞ্চ তখনই হাসিল করা যায়, যখন এই 'দিয়ে দেয়ার' পশ্চাতে ঐ মৌলিক উদ্দেশ্য হাসিল করার ইচ্ছা এবং বাস্তব ব্যবস্থাপনা দেখতে পাওয়া যাবে। এই ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং বাস্তব ব্যবস্থাপনা কি, যাকাত দেবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে ? কোরআন হাকিম এ বিষয়ে বিস্তারিত হেদায়েত দিয়েছে। তার সংক্ষিপ্ত সার এই ঃ

☐ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক কথা এই যে, যাকাত দেবার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি যেন এ কাজে প্রেরণার উৎস হয়। আর কোন কিছু যেন প্রেরণার উৎস না হয়।

مَا تُنْفِقُوْنَ اِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ ط (البقرة : ٢٧٢)

"তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে ব্যয় কর।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭২)

কোরআন সাচ্চা ও উন্নতমানের মুসলমানদের পরিচয় দেবার সময় স্থানে স্থানে একাধিকবার পুনরুক্তি করেছে যে, তারা যাকাত এবং সদকা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে দিয়ে থাকে। এ কারণে যাকাতকে 'ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহর পথে ব্যয়' বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

☐ দ্বিতীয় কথা এই যে, যাকাত যা কিছু দেয়া হবে, তা পাক কামাইয়ের মাল থেকে দিতে হবে। এর মধ্যে হারাম কামাইয়ের নাম গন্ধ যেন না থাকে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَاكَسَبْتُمْ

"তোমরা যারা ঈমান এনেছ, শুনে রাখো। তোমরা যা কামাই রোজগার কর, তার থেকে পাক-পবিত্র জিনিসই খরচ কর।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৭)

একথাটাকে নবী (সা) আরও পরিষ্কার করে বলেছেন ঃ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَايَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا ـ

"হে লোকেরা ! আল্লাহ নিশ্চয় পাক-পবিত্র। তিনি শুধু পাক-সাফ মালই সদকা গ্রহণ করেন।"–(মুসলিম)

☐ তৃতীয় কথা এই যে, যাকাত হিসাবে যা কিছু দেয়া হবে, তা হতে হবে উৎকৃষ্ট বস্তু। রদ্দি এবং খারাপ জিনিস যাকাতের জন্যে বেছে রাখলে যাকাত দেয়া হবে না। তাহলে যাকাতকে খুঁতো করা হবে।

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ ـ(البقرة : ٢٦٧)

"এবং তোমরা নাপাক জিনিস তালাশ করো না তার থেকে খরচের জন্যে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৭)

☐ চতুর্থ কথা হলো, এই যে, যাকাত গ্রহণকারীর প্রতি খুব দয়া প্রদর্শন করেছে—একথা বলে বেড়ানো চলবে না। না তার মনে কোন কষ্ট দেয়া চলবে, আর না তার মান-সম্ভ্রমে কোন আঘাত দেয়া চলবে। এরূপ করা হলে যাকাত ব্যর্থ হয়ে যাবে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ ـ(البقرة : ٢٦٤)

"তোমরা যারা ঈমান এনেছো, শুনে রাখ। লোকের কাছে বলে বেড়িয়ে অথবা (যাকাত গ্রহণকারীর) মনে পীড়া দিয়ে তোমাদের সদকা-খয়রাত বরবাদ করো না। ঠিক তারই মতো যে শুধু লোক দেখানোর জন্যে খরচ করে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৪)

হাদীসে আছে যে, কিয়ামতের দিনে তিন ব্যক্তি সকলের আগে জাহান্নামে যাবে। তার মধ্যে একজন ঐ ব্যক্তি, যে এ জন্যে বহুত দান খয়রাত করে যাতে করে লোকে তাকে বড়ো দাতা ও গরীবের বন্ধু মনে করে।

www.pathagar.com

আর একটি হাদীসে এর চেয়েও কড়া কথা বলা হয়েছে।

مَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ۔

"যে লোক দেখানোর জন্যে সদকা খয়রাত করে, সে শির্ক করলো।"
–(মিশকাত)

এ হলো ঐসব খাস হেদায়েত যার উপর আমল করলে মনের পবিত্রতা এবং আত্মশুদ্ধি লাভ করা যেতে পারে। চিন্তা করুন যে, এ হেদায়েতগুলো কত উন্নতমানের চরিত্রের জন্যে করা হয়েছে। তা ছাড়া দেখুন, সাধারণ দান-খয়রাত আর ইসলামী যাকাতের মধ্যে কতখানি আসমান-যমীন পার্থক্য। এসব হেদায়েত দৃষ্টে প্রত্যেকে অনুভব করতে পারে যে, যাকাত দেবার সময় নফসের কত বড়ো কঠিন হিসাব-নিকাশ নেবার প্রয়োজন। কেননা এ এমন এক এবাদত যা নফসের অসংখ্য অগ্নি পরীক্ষার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়। আর চতুর্দিক থেকে তার উপরে মারাত্মক আক্রমণের আশংকা থাকে। এ কারণেই এ অধ্যায়ে আল্লাহর মুখলেস (সৎ ও নিষ্ঠাবান) বান্দাদের অবস্থা কোরআন তুলে ধরেছে।

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًاo اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَانُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًاo (الدهر ۸-۹)

"আর তারা আল্লাহরই ভালোবাসার জন্যে গরীব-মিসকীন, এতিম ও কয়েদীদেরকে আহার দিয়ে থাকে। (আর তাদেরকে মৌখিক অথবা ভাব-ভংগীতে বলে) "আমরা তোমাদেরকে আহার খেতে দিই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে। তার বিনিময়ে আমরা তোমাদের কাছে না কোন প্রতিদান পারিশ্রমিক চাই, আর না কোন কৃতজ্ঞতা।"–(সূরা আদ দাহর ঃ ৮-৯)

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآاٰتَوْ وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رَاجِعُوْنَ۔

"এবং এসব লোক (আল্লাহর পথে) যা কিছু খরচ করে, তা এ অবস্থায় করে যে, তাদের দিল ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। তাদের মধ্যে এ ধারণা থাকে যে, তাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে।"–(সূরা আল মুমেনুন ঃ ৬০)

অর্থাৎ কোন গর্ব-অহংকার প্রকাশ, নিজেকে বড়ো মনে করার কোন অনুভূতি লোক দেখানোর কোন প্রবণতা, কৃতজ্ঞতা লাভের কোন আশা, অথবা কারো মনে কোন পীড়া দেবার কোন প্রশ্নই আসে না। যাকাত দেবার সময় একজন মুমেনের দিল বরঞ্চ এই ভয়ে কাঁপতে থাকে যে, কি জানি যদি ভেতর থেকে শয়তান কোন কারসাজি করে বসে এবং যখন সে তার প্রভুর দরবারে

www.pathagar.com

হাযীর হবে, তখন যদি সে জানতে পারে যে, তার পানাহার করানো সবই ব্যর্থ হয়েছে।

২. **গরীবের সচ্ছলতা বিধান ঃ** এখন যাকাতের দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্দেশ্যগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা যাক এসবের মধ্যে একটা উদ্দেশ্য হলো সমাজের নিঃস্ব লোকদের সাহায্য করা এবং তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা। নবী করীম (সা) এরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّنِيْ فُقَرَائِهِمْ -

"বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন। এ যাকাত তাদের ধনবানদের কাছ থেকে নেয়া হবে এবং বিতরণ করা হবে তাদের মধ্যে যারা অভাবগ্রস্ত।"-(মুসলিম)

এভাবে কোরআন মজীদ 'যাকাত দান'কে মুসলমানের প্রয়োজনীয় গুণ ও আলামত বলে বর্ণনা করেছে। এর বিশদ বিররণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

.....وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ج (البقرة : ١٧٧)

"এবং তারা আল্লাহর প্রেমে ধন-সম্পদ দান করে আত্মীয়-স্বজনকে, এতীম-মিসকীন, মুসাফির ও সাহায্য প্রার্থীকে এবং মুক্তি লাভের জন্যে।"
-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৭)

এসব বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, যাকাতের একটা নিখুঁত সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকও আছে ; এছাড়া যাকাতের ইসলামী ধারণা পূর্ণ হয় না। এক ব্যক্তি পুরোপুরি আল্লাহর ওয়াস্তে তার মালের একাংশ বের করে রাখলো। নিঃসন্দেহে এভাবে মূলতঃ সে তার মনের পবিত্রতা এবং আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করলো। কিন্তু তার এ কাজ শরীয়তের দৃষ্টিতে এখনো যাকাত আদায় হলো না। যখন তা যাকাত আদায় হলো না তখন মনে রাখতে হবে যে, তা ইসলামের একটি প্রয়োজনীয় স্তম্ভ তৈরীর উপায়ও হলো না। তার এ কাজ 'যাকাত আদায়' হিসাবে তখনই গণ্য হতে পারে এবং তার দ্বারা ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ তখনই তৈরী হতে পারে, যখন সে তার পৃথক করা এই ধন হকদারদের মধ্যে বিতরণ করে দেবে। অর্থাৎ যাকাতের মৌলিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যে মনের পবিত্রতা ও আত্মশুদ্ধি তা এক সর্বস্বীকৃত সত্য। কিন্তু এই যাকাতের মাল গরীবদের অভাব পূরণের উপায় হয়ে যাওটাও একেবারে জরুরী। এ ছাড়া যাকাতের সচ্ছল ব্যক্তিদের ধনের মধ্যে গরীবের হক বা অধিকার বলে ঘোষণা করেছে।

www.pathagar.com

وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۙ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝ (المعارج : ٢٤)

"যাদের মালের মধ্যে সাহায্য প্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক আছে।"

–(সূরা আল মা'আরিজ ঃ ২৪)

এ হক বা অধিকার এমন যার জন্যে ইসলামী হুকুমাত যুদ্ধ ঘোষণাও করতে পারে। যেমন হযরত আবু বকরের (রা) উত্তম আদর্শ আমাদের সামনে রয়েছে।

মোটকথা, যাকাতের এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি যদিও দ্বিতীয় পর্যায়ের মর্যাদা রাখে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও দ্বীনের মধ্যে এর যে গুরুত্ব আছে তা সাধারণ বলা যায় না, আপনি তা আখেরাতের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখুন অথবা পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে। এ বিষয়ে পূর্ণ ধারণা অর্জন করার জন্যে নিম্নের হাদীসগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন ঃ

০ মুমেন ঐ ব্যক্তি হতে পারে না যে তৃপ্তি সহকারে আহার করে অথচ তার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে।–(মিশকাত)

০ আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন, হে আদম সন্তান ! আমি তোমার কাছে খানা চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খেতে দাওনি। বান্দাহ বলবে, হে খোদা ! আমি তোমাকে কি করে খাওয়াতে পারি ! তুমি তো নিজেই সমগ্র জাহানের পালনকর্তা। জবাব হবে, তোমার মনে নেই যে আমার অমুক বান্দাহ তোমার কাছে খানা চেয়েছিল, তুমি তাকে খানা খাওয়াতে অস্বীকার করেছ ?"–(মুসলিম)

যে দ্বীন বান্দার ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে স্বয়ং আল্লাহর ক্ষুধা-তৃষ্ণা বলে উল্লেখ করে, তার কাছে গরীব মিসকীনের অভাব মোচন কোন সাধারণ গুরুত্বের বিষয় নয়।

৩. দ্বীনের সাহায্য ঃ যাকাতের দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্দেশ্যগুলোর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণ ও সাহায্য করা। যাকাত কোন্ কোন্ খাতে ব্যয় করতে হবে এ সম্পর্কে কোরআন বলে ঃ

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۭ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ

"এ সাদকাসমূহ (যাকাত) গরীব মিসকীন ও সদকা আদায়কারী কর্মচারীদের আর যাদেরকে সন্তুষ্ট করা আবশ্যক তাদের জন্যে। গোলাম

www.pathagar.com

মুক্ত করার জন্যে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের ঋণমুক্ত করার জন্যে, আল্লাহর পথে এবং বিদেশ ভ্রমণকারীদের জন্যে।"–(সূরা আত তওবা ঃ ৬০)

"আল্লাহর পথে" অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনের জন্যে যত চেষ্টা চরিত্র ও সংগ্রাম করা হবে তার জন্যে। বিশেষ করে দ্বীনের জন্যে যুদ্ধ বিগ্রহাদির প্রয়োজনে।

এর থেকে জানা গেল যে, আল্লাহর পথে জিহাদের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করাও যাকাতের উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্গত। কোরআনের স্থানে স্থানে ঈমানদারদের কাছে এরূপ দাবী করা হয়েছে ঃ

وَجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط(التوبه : ٤١)

"এবং তোমরা তোমাদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর।"–(সূরা আত তওবা ঃ ৪১)

ঈমানদারদের যখন বুনিয়াদী গুণ বর্ণনা করা হয়, তখন তার মধ্যে আল্লাহর পথে নিজের মাল দিয়ে জেহাদ কর—একথাটি অবশ্যই থাকে। আল্লাহর পথে আপন মাল দিয়ে জেহাদ করার মর্ম অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তা হচ্ছে এই যে, দ্বীনের জন্যে জিহাদ করতে হলে যে খরচ পত্রাদির প্রয়োজন তা নিজের থেকে পূরণ কর।

প্রত্যেকেই জানে যে, দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণ ও সাহায্য যেমন তেমন কাজ নয়। অতএব তার জন্যে স্বীয় অর্থ সম্পদ ব্যয় করাও কোন সাধারণ স্তরের কাজ হতে পারে না। কোরআন জিহাদের আদেশ প্রসংগে বলে ঃ

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ج(البقرة : ١٩٥)

"আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং হাত গুটিয়ে রেখে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৫)

এ কথার অর্থ এই যে, দ্বীনের হেফাজত ও সাহায্য কল্পে প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন না করা ধ্বংস ডেকে আনে। দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও। যে কাজ দুনিয়া এবং আখেরাতের ধ্বংস থেকে নিরাপদ থাকার নিশ্চয়তা দান করে, তাকে কে বলতে পারে সাধারণ কাজ?

যাকাতের হার

যাকাতের উদ্দেশ্য জানার পর প্রশ্ন হতে পারে, যাকাতের হার কি?

এ প্রশ্নের প্রকৃতপক্ষে একটা জবাবই হতে পারে। তা এই যে, যাকাত একটা বের করতে হবে যার দ্বারা এ তিনটি উদ্দেশ্য পূরণ হয়। যথা, প্রথমতঃ

www.pathagar.com

ধন লিপ্সার অক্টোপাস থেকে মনকে মুক্ত করা। দ্বিতীয়তঃ সমাজ থেকে ক্ষুধা ও অভাব অনটন দূর করা। তৃতীয়তঃ দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণ ও সাহায্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা।

মনে রাখতে হবে যে, যাকাত আদায়ের এ মান কোন নির্দিষ্ট হার দ্বারা নির্ধারিত করা যায় না। কারণ এসব উদ্দেশ্যের সম্পর্ক অবস্থার সংগে স্বল্পতার সংগে নয়। আর এই অবস্থায় অনুমান কোন সংখ্যা অথবা হার নির্ণয়ের দ্বারা করা যায় না। এ অবস্থায় স্বাভাবিক চাহিদা এই যে, মানুষ যতটা সম্ভব দিতে থাকবে। কারণ একজন মুমেন তার আমলের ব্যাপারে কখনোই নিশ্চিত হতে পারে না। কেউ যদি এমন নিশ্চয়তা দিয়ে বলে যে, সে শরীয়তের অমুক দাবীর হক পুরোপুরি আদায় করেছে তাহলে সেটা হবে ঈমানের প্রকৃতির খেলাপ। এ কারণেই কোরআন হাকিম মুসলমানদেরকে বারবার এমন উপদেশ দিয়ে এসেছে "আল্লাহর পথে খরচ কর" "আল্লাহর পথে খরচ কর।" যে কথা শুনতে শুনতে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা এই হয়েছিল যে, তাঁরা মালের সর্ব বৃহৎ কোরবানী দেয়া সত্ত্বেও নিশ্চিত হতে পারতেন না। অবশেষে ঈমানের অনুভূতিতে অস্থির হয়ে এ প্রশ্ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, আমাদের কাছে ব্যয়ের যত বড়ো দাবীই করা হোক, তার একটা সুস্পষ্ট এবং নির্ধারিত রূপ বলে দেয়া হোক।

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ـ(البقرة : ٢١٩)

"তার জবাবে বলা হলো, তোমাদের নিজেদের প্রকৃত প্রয়োজন পূরণ এবং হকদারের হক আদায়ের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা পুরোপুরি আল্লাহর পথে ব্যয় কর। قُلِ الْعَفْوَا এ জবাবের পর এ বিষয়ে পুরোপুরি অনুমান করা যেতে পারে আল্লাহর পথে খরচ করার বাঞ্ছিত মান কি হতে পারে। বিশেষ করে দ্বিতীয় পর্যায়ের উভয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে কথা তো বিলকুল পরিষ্কার হয়ে যায় অর্থাৎ যে পর্যন্ত গরীবদের ব্যক্তিগত অভাব এবং দ্বীন ও মিল্লাতের সামাজিক প্রয়োজন পূরণ না হয় সে পর্যন্ত সচ্ছল ও সামর্থবান মুসলমানদের কাছ থেকে খরচের দাবী প্রকৃতই বাকি রয়ে যাবে। অতপর তারা অনেক কিছু দেয়া সত্ত্বেও এ ফরয থেকে সত্যিকার অর্থে অব্যাহতি পাবে না। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় দ্বীন ও মিল্লাত এবং উম্মতের সকল লোকের সকল প্রয়োজন যে পূরণ হয়েছে এমন নিশ্চয়তা লাভের পথ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তার অর্থ এই হলো যে, সামর্থবান মুসলমানদের কাছে আল্লাহর পথে খরচ করার জন্যে ঈমানের দাবী প্রতি মুহূর্তে বাকি থাকে। এবং তাদের ফরয কাজের অনুভূতি সে দাবী পূরণের জন্যে তাদেরকে সবসময়ে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। অতপর তারা কখনো এ ধারণা করে না যে, এ ফরয কাজ তারা বাঞ্ছিত মান অনুযায়ী আদায় করতে পেরেছে।

www.pathagar.com

অতএব যাকাত কত দেয়া হবে তার সিদ্ধান্ত করা প্রকৃতপক্ষে ঈমানের অনুভূতির উপর নির্ভর করে।

যেহেতু ইসলাম তত্ত্বমূলক থেকে অধিক ব্যবহারিক, সে জন্য সে মানবীয় চিন্তা ও কাজের শুধু উচ্চতার প্রতিই দৃষ্টি দেয় না। বরঞ্চ অন্যান্য তত্ত্বের প্রতিও তার দৃষ্টি থাকে। অতএব সে অন্যান্য স্তম্ভগুলোর ন্যায় যাকাত স্তম্ভকেও সকল লোকের আপন অনুভূতির উপর ছেড়ে দেয়নি যে, সে যতটুকু পারে ততটুকু করবে। পক্ষান্তরে ইসলাম ও এবাদতের সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণ করার অবিরাম প্রেরণা দেবার সাথে সাথে তার সীমাও নির্ধারণ করে দিয়েছে যা তার সর্বনিম্ন স্তর হতে পারে।

এসব উদ্দেশ্যাবলী সামনে রেখে এ ছিল একেবারে অনিবার্য। এ জন্যে একে দ্বীনের একটি স্তম্ভ বলা হয়েছে। বিভিন্ন প্রয়োজন ও তাৎপর্যের খাতিরে এ সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এর একটা কারণ হচ্ছে এই যে, এ দ্বীনের অনুসারীদের মধ্যে বিভিন্ন মান বিভিন্ন মানসিকতা ও যোগ্যতার লোক ছিল। মানুষের অধিকাংশই যে এরূপ হয়, সে সত্যও অস্বীকার করার উপায় নেই। আর এ জন্যেই এ সীমা নির্ধারণের প্রয়োজন ছিল। আর শরীয়তের হুকুমসমূহের সংখ্যা ও পরিমাণ নির্ধারণ করে তা সুস্পষ্ট করে দিলে তখনই তার উপর আমল করা সম্ভব হয়।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, ঈমানের শক্তির দিক দিয়েও সকল ঈমানদার একই স্তরের হয় না। তাদের মধ্যে এমন কমজোর লোকও হয় যাদের মন ব্যাখ্যা এবং অবকাশ থেকে বেশী বেশী সুযোগ গ্রহণ করতে চায়। এ জন্যে একথা বলার প্রয়োজন ছিল যে, দ্বীনের বুনিয়াদী আমলসমূহের সর্বনিম্ন পরিমাণ কি, যা অবশ্যই পূরণ করা উচিত এবং যা মুমেন দলের শেষ সারিতে স্থান পাওয়ার জন্যে অনিবার্য হয়ে পড়ে।

তৃতীয় কারণ এই যে, যাকাত শুধু একজন ব্যক্তির নিজের সংস্কার সংশোধন এবং তার আত্মশুদ্ধির জন্যেই ফরয করা হয়নি। বরঞ্চ গরীবের প্রতিপালন এবং দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণ ও সাহায্য করাও তার উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে শামিল। এসব কিছুই উপরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যাকাতের প্রথম উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে চিন্তা করলে, এমন হতে পারতো যে, তা ব্যক্তির স্বীয় ফরযের অনুভূতির উপরে ছেড়ে দেয়া যেত। সে যদি তার আখেরাত বানাবার ইচ্ছা করতো, তাহলে যাকাত দিত। নতুবা তার অশুভ পরিণাম ভোগ করার জন্যে তৈরী থাকতো। কিন্তু যার উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে গরীবের অভাবমোচন এবং দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণ ও সাহায্য শামিল আছে, আর এ উভয় বিষয়ের

www.pathagar.com

সম্পর্ক আখেরাতের সাথে নয়, বরঞ্চ দুনিয়ার সাথে। সে জন্যে এ ব্যাপারটিকে একেবারে লোকের আপন আপন অনুভূতির উপরে কিছুতেই ছেড়ে দেয়া যায় না।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর মিসকীন ও নিঃস্ব বান্দাদের বস্তুগত প্রয়োজন এবং দ্বীনের রাজনৈতিক স্বার্থের প্রতি কম গুরুত্ব দেননি যে, এ বিষয়ে মানুষের শুধু উপদেশ আর অনুপ্রেরণাই দেবেন। আর এ ব্যাপারটা সমুদয় তাদের মরযীর উপর ছেড়ে দেবেন। যখন তারা ইচ্ছা করলো এবং যতটুকু ইচ্ছা করলো ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পীড়িত লোকের দিকে ছুঁড়ে মারলো। অথবা দ্বীনের হেফাযত ও সাহায্যের নাম করে কয়েক টাকা চাঁদা দিয়ে দিল। আর ইচ্ছা করলে এতটুকু কষ্ট স্বীকার নাও করতে পারে। কিন্তু এসব যাকাতের গৌণ উদ্দেশ্য হোক, তথাপি ইসলাম তার যে গুরুত্ব দিয়েছে তা অত্যন্ত বিরাট। এ জন্যে যাকাতের এমন একটা সীমা নির্ধারণ করে দেয়া অবশ্যই প্রয়োজন ছিল যাতে করে যাকাত আদায় করার দায়িত্ব নৈতিক দিক থেকে আইনগত হয়ে পড়ে। এবং এভাবে গরীবের ভরণ-পোষণ এবং দ্বীনের হেফাযত ও সাহায্যের জন্যে অন্ততঃ প্রাথমিক পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা যাতে অবশ্যই থাকে।

যাকাতের আইনগত এবং অপরিহার্য হার সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

০ কৃষিজাত ফসল উৎপন্নের জন্যে সেচ ব্যবস্থার প্রয়োজন হলে উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ। বৃষ্টির পানিতে ফসল উৎপন্ন হলে, তার এক-দশমাংশ।

০ সঞ্চিত টাকা-পয়সা, সোনা-চাঁদির অলংকার এবং তেজারতি মালের শতকরা আড়াই ভাগ।

০ বনে-জংগলে চরে বেড়ানো গৃহপালিত পশু শতকরা প্রায় দেড় থেকে আড়াই ভাগ।

০ খনিজ পদার্থের শতকরা বিশ ভাগ।

এতটুকু যাকাত দেয়া প্রত্যেক সাহেবে নেসাব (মালদার) মুসলমানের জন্যে নৈতিক দিক দিয়ে নয়—আইনগতভাবে অপরিহার্য। এর থেকে কম করা যেতে পারে না। কেননা ঐ ফরযটি আদায় করার এ হচ্ছে সর্বনিম্ন সীমা ও অপরিহার্য পন্থা। এর মধ্যেও যদি কিছু কম থেকে যায়, তাহলে ইসলাম, যাকাতের দিক দিয়ে দেখতে গেলে, স্তম্ভহীন হয়ে পড়বে। তারপর এ প্রাসাদ আর কখনো দাঁড়াতে পারবে না। নির্ধারিত হার কম করার যে কোন অবকাশই নেই শুধু তাই নয়, বরঞ্চ যাকাতের উদ্দেশ্যের দিক থেকে দেখতে গেলে এ হার পুরোপুরি আদায় করার পরও নিশ্চিত হওয়া যায় না। আর এ উদ্দেশ্য-

www.pathagar.com

গুলোর দাবী হচ্ছে এই যে, আইনগত সীমার উপরে স্থির থাকা চলবে না, বরঞ্চ সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে হবে। অতপর সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার এই চেষ্টাকে অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে ঐসব উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা থাকে। সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার এ চেষ্টা যদিও লোকের মরযীর উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে—ইচ্ছা করলে কেউ এ চেষ্টা চালাতে পারে অথবা নাও চালাতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এখানে এ নয় যে, তার মরযীই সবকিছু এবং এখন আইন তাকে কোন অবস্থাতেই বাধ্য করতে পারবে না। প্রথম উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে দেখতে গেলে কথা তো তাই হয় বটে এবং আইন এ ব্যাপারে কোন দাবী উত্থাপন করতে পারে না। কিন্তু দ্বিতীয় এবং উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করলে ব্যাপার এমনটি দাঁড়ায় না। এ দু'টির জন্যে আইন এখন দাবী করতে পারে। নবী করীমের (সা) এরশাদ হচ্ছে ঃ

اِنَّ فِى الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكٰوةِ ـ

"একজন মুসলমানের মালের মধ্যে যাকাত দেয়ার পরও অন্যান্যের হক থাকে।"–(মিশকাত)

এর থেকে জানতে পারা গেল যে, একজন মুসলমান তার মালের নির্ধারিত যাকাত দেয়ার পরও দ্বীনের আর্থিক দাবী থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে না। তারপরও তার মালের উপর হক বাকি থেকে যায়।

মনে রাখতে হবে যে, এই হক তিন প্রকারেরই হতে পারে। প্রথমতঃ নিজের মনে হক তার পবিত্র করণের দিক দিয়ে। দ্বিতীয়তঃ গরীবের ভরণ-পোষণের ব্যাপারে। তৃতীয়তঃ দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণ ও সাহায্যের ব্যাপারে। অর্থাৎ এ 'হক' এ জন্যে বাকি থেকে যাচ্ছে যে, মানুষ যদিও বা যাকাতের নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ আদায় করে দিল, কিন্তু তথাপি তার মন ধন লিপ্সা থেকে মুক্ত হতে পারলো না। আর এ কারণেও যে, তার নির্ধারিত যাকাতের পরিমাণ অনুযায়ী অর্থ দান করার পরও সমাজে অনাহার এবং দুরবস্থার অবসান হলো না। অধিকন্তু এ কারণেও যে যাকাতের সাধারণ আইনগত দাবী অনুযায়ী যে অর্থ সংগৃহীত হলো, তার দ্বারা দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সাহায্যের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা করা গেল না।

কিন্তু ব্যাপার যদি আত্মার পবিত্রকরণ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে পরিষ্কার কথা এই যে, এ আইনগত অধিকারে বাধ্য হয়ে মানুষ যদি তার সমুদয় সম্পদ গরীবের মধ্যে বিতরণ করে দেয়, তবুও তার দ্বারা তার আত্মার পবিত্রতা সম্ভব হবে না। এ পবিত্রতা তো তখনই সম্ভব, যখন আইনের চাপে নয় বরঞ্চ অন্তরের চাপে ও ব্যাকুলতায় এ খরচ করা হয়। অবশ্যি দ্বিতীয় ও

www.pathagar.com

তৃতীয় উদ্দেশ্য যেহেতু আইনের চাপেও হাসিল হতে পারে এ জন্যে তাদের বেলায় এ 'হক' আইনগতও হবে। তার অর্থ এই যে, যদি মানুষের নৈতিক অনুভূতি সমাজ থেকে অনাহার ও অভাব জনিত হাহাকার বন্ধ করতে সামর্থ না হয়, অথবা দ্বীনের হেফাযত ও সাহায্য করার দায়িত্ব পালনে সক্ষম না হয়, তাহলে এ অবস্থায় এ 'হক' অবশ্যই নৈতিক দিক থেকে আইনগত হয়ে পড়বে। অতপর নবীর এরশাদ মুতাবিক ইসলামের হুকুমতের এ অধিকার থাকবে এমন কি এটা তার দায়িত্ব হয়ে পড়বে যে, তখন সে গরীবদের প্রয়োজন এ দ্বীনের স্বার্থের খাতিরে মালদারের উপর অধিকতর বোঝা চাপাবে এবং তাদের কাছ থেকে নির্ধারিত যাকাত বাদেও ট্যাক্স আদায় করবে।

এখানে একথাও পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার যে, ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী 'মালদার' শব্দের অর্থ দুনিয়ায় প্রচলিত সাধারণ ধারণা থেকে অনেকটা পৃথক। যে ব্যক্তির কাছে তার আর্থিক বছরের শেষে সাড়ে বায়ান্ন তোলা চাঁদি, মোহর অথবা কারেন্সি নোটের আকারে বিদ্যমান থাকবে, অথবা এতটা মূল্যের ব্যবসার পণ্য দ্রব্য থাকবে, ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে সেও 'মালদার'।

যাকাতের ব্যবস্থাপনা

যাকাত কিভাবে আদায় এবং বন্টন করা হবে, শরীয়ত এ বিষয়েও নির্দিষ্ট হেদায়েত দিয়েছে। যেসব সদকা আইনগত ধরনের (আইনগতভাবে নির্ধারিত হারে দেয় যাকাত) নয়, সেগুলো আপনি যেভাবে ইচ্ছা দিতে পারেন। কিন্তু আইনগত যাকাত সম্পর্কে আপনার এ স্বাধীনতা নেই। বরঞ্চ যেভাবে নামায কায়েম করার জন্যে তা জামায়াতসহ আদায় করার প্রয়োজন হয়, তেমনি যাকাতেরও একটা সামাজিক বা সমষ্টিগত ব্যবস্থপনা নির্ধারিত আছে। এ জন্যে প্রয়োজন এ ব্যবস্থাপনার মুতাবিক তা ব্যয় করা। সমগ্র দেশের যাকাত ইসলামী হুকুমত তার তহশিলদারদের মাধ্যমে আদায় করবে। অতপর হুকুমতই হকদারদের মধ্যে বিতরণ করবেন। কোন ব্যক্তির এ অধিকার থাকবে না যে, সে তার নিজের যাকাত গভর্নমেন্টের (ইসলামী হুকুমতের) হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করবে এবং নিজের মরযী মতো যেখানে খুশী ও যেভাবে খুশী বন্টন করবে।

কোরআন মজীদে যেখানে একথা বলা হয়েছে যে, কোন্ কোন্ খাতে যাকাত ব্যয় করা হবে, সেখানে ইসলামী সরকারের যাকাত বিভাগের সরকারী কর্মচারীদের وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا উল্লেখ ও একটা স্থায়ী খাত হিসেবে করা হয়েছে। একথারই প্রমাণ যে, যাকাত সরকার কর্তৃক আদায় করার পর বন্টন করাও দ্বীনের একটা সর্বস্বীকৃত দফা এবং ইসলামী শাসন প্রকৃতির একটা সর্ব

www.pathagar.com

পরিচিত দাবী। নবী করীম (সা) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের (রা) কর্ম-পদ্ধতিও একথার সাক্ষ্য দেয়। এমন বিশদভাবে দেয় যে, অনিবার্য রূপে তা এরূপই হওয়া উচিত।

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খেলাফত আমলে কিছু লোক তাদের যাকাত সরকারের হাওলা করে দিতে অস্বীকার করলো। তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বলেন ঃ

وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْا فِىْ عِقَالاً كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهِ - (مسلم)

"খোদার কসম ! যদি এসব লোক উট বাঁধার একগাছি রশিও যা তারা নবীকে (সা) দিত, আমাকে না দিয়ে আটকিয়ে রাখে, তাহলে আমি তার জন্যে হলেও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।"–(মুসলিম)

"আমাকে না দিয়ে আটকিয়ে রাখে—কথার পরিষ্কার অর্থ এই যে, যাকাত অবশ্যই সরকারের হাতে দিতে হবে এবং 'যুদ্ধ করব'—কথার অর্থ হলো এ আদেশ লংঘন করা আর ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা সমান আর এর পরিণাম না দুনিয়াতে এবং না আখেরাতে ভালো হতে পারে।

যাকাতের জন্যে এ ধরনের উচ্চাংগের সামাজিক ব্যবস্থা কেন প্রয়োজন মনে করা হয়েছিল তার দু'টি কারণ বুঝতে পারা যায়।

এক তো এই যে, যেহেতু ইসলাম অতিমাত্রায় সামাজিকতা পছন্দ করে, সে জন্যে তার মেজাজ প্রকৃতির এই ছিল দাবী।

এর আর একটা কারণ এই যে, ইসলাম দুনিয়াকে যা কিছু দিতে চায় তা দুনিয়া তখনই পেতে পারে, যখন ইসলামের অনুসারিগণ একটা সুসংগঠিত ও মজবুত দল হিসাবে বিদ্যামন থাকে এবং তার কোন কাজ যথাসম্ভব শৃংখলা ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার বাইরে না থাকে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, গরীবদের স্বার্থরক্ষা এবং দ্বীনের আত্মরক্ষামূলক ও প্রচারমূলক বিধি-ব্যবস্থার সন্তোষজনক সংরক্ষণ এভাবেই হতে হবে। কারণ আগে বলা হয়েছে, এরূপ বাস্তব আশংকা আছে যে, মালদারের দায়িত্বানুভূতি হয়তো নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে এবং সে গরীবদের হক আদায় সম্পর্কে হয়ে পড়বে উদাসীন। এ আশংকা দূর করার একমাত্র উপায় এই হতে পারে, যদি সরকার স্বয়ং এ 'হক' সংরক্ষণ করে এবং যাকাত আদায়ের দায়িত্ব নিজের উপর ন্যস্ত করে।

www.pathagar.com

যদি যাকাতের সামাজিক ব্যবস্থার এসব তাৎপর্য সামনে রাখা যায় তাহলে তার থেকে এ প্রশ্নেরও জবাব পাওয়া যাবে যে, ইসলামী সরকার যদি কায়েম না থাকে তাহলে যাকাত আদায়ের কি অবস্থা হবে।

একামতে সালাত (নামায প্রতিষ্ঠা) চায় যে ইমামতির জন্যে খলিফাতুল মুসলেমীন অথবা তাঁর স্থালাভিষিক্ত নায়েব থাকবেন। বিশেষ করে জুমা এবং দুই ঈদের নামাযের ইমামতির জন্যে। কিন্তু এ দু' ব্যক্তি উপস্থিত না থাকলে কখনো এমন মনে করা হয় না যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ মরযী মতো নামায আদায় করবে। বরঞ্চ এটাই প্রয়োজন মনে করা হয়েছে যে, মহল্লা অথবা বস্তির সব মুসলমান ছোট মতো একটা স্থানীয় সামাজিক ব্যবস্থা কায়েম করবে এবং একজনকে ইমাম নিযুক্ত করে নামায জামায়াতের আকারে সমাধা করবে। ঠিক এই ব্যবস্থা যাকাতেরও হবে। দেশের সকল মুসলমানের যাকাত একত্রে আদায় ও বন্টন করার যদি কোন সরকারী ব্যবস্থা না থাকে তাহলে ইসলামের মেজাজ প্রকৃতি ও দাবী তো বিদ্যমান আছে। তার দাবী হচ্ছে এই যে, যেভাবে মুসলমান বস্তি ও লোকালয় মসজিদের, জামায়াতের এবং ইমামতির ব্যবস্থা করে থাকে, ঠিক সেভাবে যাকাতের জন্যেও তারা বায়তুলমাল কায়েম করবে। কিন্তু সমস্ত লোকের যাকাত একত্র করে তা হকদারের মধ্যে বিলি-বন্টনের ব্যবস্থা করবে। এভাবে ইসলামের এ গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভটির যা উদ্দেশ্য তা সরকারী ব্যবস্থাপনার অভাবেও যথাসম্ভব হাসিল করা যাবে। যদি এমন ব্যবস্থা করা না হয়, তাহলে তা একটা সামাজিক বা সমষ্টিগত পাপ বলে গণ্য হবে।

যাকাতের বিভিন্ন পরিভাষা

ইসলাম যাকাতের জন্যে আরও দু'টি শব্দ ব্যবহার করেছে। একটি 'সদকা' অপরটি 'ইনফাক্ ফি সাবিলিল্লাহ্'। উপরে এসবের উল্লেখ করা হয়েছে। যাকাতের আভিধানিক অর্থ আলোচনার শুরুতে বলা হয়েছে। এখন এ দু'টি শব্দও বুঝে নেয়া দরকার। 'সদকা' শব্দটি 'সিদক' থেকে উদ্ভূত। তার অর্থ সত্যতা এবং আন্তরিকতা। সদকা এ জন্যে বলা হয়েছে যে, তা যাকাত দাতার ঈমানের মধ্যে সত্যতা এবং আন্তরিকতা সৃষ্টি করে এবং এটা ঈমানের অস্তিত্বের প্রমাণও বটে। এভাবে 'ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহর' অর্থ হলো আল্লাহর পথে খরচ করা।

একটু পূর্বে আমরা জানতে পারলাম যে, যাকাতের আসল আত্মা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভ। যাকাতকে 'ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ' বলা হয়ে থাকলে এ জন্যে বলা হয়েছে যেন তার আসল আত্মার দিকে অংগুলি নির্দেশ করা হয়। এভাবে এ তিনটি শব্দ একই বস্তুর শুধু তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নামই নয়। বরঞ্চ তার আসল মর্মের বিভিন্ন দিক পরিস্ফুটকারীর।

www.pathagar.com

কোরআন হাকিমেও এ তিনটি শব্দকে সাধারণতঃ একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্যে যা কিছুই খরচ করা হবে তা যাকাত ও সদকাও এবং ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহও। এ খরচ যাকাতের আইনানুগ দাবী অনুযায়ী হোক অথবা নৈতিক প্রেরণায় হোক। এর মধ্যে কোন একটি শব্দ আইনানুগ অথবা নীতিগত (অর্থাৎ ফরয কিংবা নফল) খরচের জন্যে নির্দিষ্ট নয় যে সেটি আর অন্যটির জন্যে ব্যবহার করা যাবে না। এর কারণ এই যে, কোরআন ও সুন্নাতের দৃষ্টি বেশীর ভাগ মর্ম ও আসল উদ্দেশ্যের দিকে থাকে, কোন বিষয়ের আইনানুগ দিকের উপর নয়। কিন্তু ফেকাহ এ শব্দগুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছে। তার ভাষায় যাকাত শুধু ঐ খরচকে বলা হয়, যা ফরয এবং আইনগতভাবে অবশ্য করণীয়। পক্ষান্তরে সদকা এবং ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহর পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে শুধু ঐ খরচের জন্যে যা স্বেচ্ছামূলকভাবে করা হয়। মনে রাখতে হবে যে, ফেকাহ আইনেরই দ্বিতীয় নাম। এ জন্যে এ ধরনের পারিভাষিক পার্থক্যকরণ তার জন্যে প্রয়োজনও ছিল। আর কেতাব ও সুন্নাতের ব্যাপার এর থেকে অনেকটা পৃথক।

৪. রোযা

ইসলামের চতুর্থ রুকন (স্তম্ভ) রোযা। রোযার শরীয়ত সম্মত পরিভাষা হচ্ছে 'সওম' অথবা 'সিয়াম'। তার আভিধানিক অর্থ বিরত রাখা বা থাকা। এ আমলকে 'সিয়াম' এ জন্যে বলা হয়েছে যে, মানুষ উষার আলোক প্রতিভাত হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার এবং যৌন সম্মিলন থেকে বিরত থাকে।

রোযার বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য

রোযা সম্পর্কে কোরআন এবং সাহেবে কোরআন অর্থাৎ নবী (সা) যেসব হুকুম ও হেদায়াত দিয়েছেন তার প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, এসব বিভিন্ন দ্বীনি গুরুত্ব ও তাৎপর্যে পরিপূর্ণ। তার কিছু মর্যাদা মৌলিক এবং তার থেকেও বৈশিষ্টপূর্ণ। রোযাকে বুঝতে হলে তার এসব মৌলিক এবং বিশিষ্ট গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝতে হবে। তা নিম্নরূপ ঃ

রোযা তাকওয়ার উৎস ঃ সবচেয়ে প্রথম এবং সুস্পষ্ট জিনিস এই যে, রোযা মানুষের মধ্যে খোদাভীতির গুণ ও তাকওয়ার অমূল্য সম্পদ সৃষ্টি করে। এ সম্পর্কে কেতাব, সুন্নাত এবং বিবেক—এ তিনেরই সাক্ষ্য পাওয়া যাবে। কোরআন মজীদ রোযা ফরয হওয়ার যে ঘোষণা করেছে তার মধ্যে এ তত্ত্ব বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ (البقرة : ١٨٣)

"তোমরা যারা ঈমান এনেছ শুনে রাখ। তোমাদের উপরে রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন করে হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপরে যাতে করে তোমাদের মধ্যে তাকওয়া পয়দা হতে পারে।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৩)

নবী বলেন ঃ

اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ (مسلم)

"রোযা (দুনিয়াতে গুনাহ থেকে এবং আখেরাতে জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী) ঢাল স্বরূপ।"–(মুসলিম)

এ ব্যাপারে আরও এরশাদ হচ্ছে ঃ

فَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَسْخَبْ فَاِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ صَائِمٌ اِنِّىْ صَائِمٌ (مسلم)

"তোমাদের মধ্যে কেউ যদি রোযা রাখে, তাহলে তার উচিত সে যেন না কোন অশ্লীল কথা বলে, আর না ঝগড়া-ঝাটি করে। যদি কেউ তাকে গালি-গালায করে অথবা তার সাথে ঝগড়া করতে আসে তাহলে (তাকেও এবং নিজের মনকে) যেন বলে, আমি রোযা আছি, আমি রোযা আছি।"–(মুসলিম)

এর মর্ম এই যে, যদিও অশ্লীল কথা, গালি-গালাজ, লড়াই ঝগড়া প্রভৃতি মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকা প্রত্যেক মুমেনের জন্যে সকল অবস্থাতেই প্রয়োজনীয় কিন্তু যখন সে রোযা রাখে, তখন শান্তিপ্রিয়তার এ আচরণ তার জন্যে অধিকতর প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। স্বাভাবিক অবস্থায় যদি সে এ ধরনের পদস্খলন থেকে পুরোপুরি রক্ষা না পায়, তাহলে অন্ততঃ রোযা থাকা অবস্থায় এসবের নিকটবর্তী হওয়া তার কিছুতেই উচিত নয়। নবী করীমের (সা) একথা বলার অর্থ আসলে এ ঘোষণা করা যে, রোযা নেক কাজের প্রবণতা এবং খোদাভীতির এমন নির্ঘাৎ অস্ত্র যার তুলনা নেই।

কেতাব ও সুন্নাতের সাক্ষ্যের পর যদিও আর কোন যুক্তি প্রমাণের মোটেই প্রয়োজন করে না, কিন্তু মনের অধিকতর সন্তোষলাভের জন্যে বিবেকের দৃষ্টি

www.pathagar.com

দিয়ে এ তত্ত্ব অবলোকন করা বাঞ্ছনীয় মনে করি। অর্থাৎ সহজ কথায় জেনে নেয়া দরকার যে, রোযার দ্বারা তাকওয়া কেন এবং কিভাবে পয়দা হয়।

এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম মেনে নেয়া দরকার যে, স্বয়ং তাকওয়া বস্তুটি কি। এটা জানার পরই বুঝতে পারা যাবে যে, রোযার দ্বারা কিভাবে তাকওয়া পয়দা হয়। তাকওয়া আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার সেই গভীর অনুভূতি, যা মানুষকে প্রত্যেক ভালো কাজের জন্যে উদ্বুদ্ধ করে এবং প্রত্যেক মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। অথবা এভাবে বলা যেতে পারে যে, তাকওয়া মনের একটা বিশেষ অবস্থার নাম, যার থেকে আমল করার একটা বিশেষ মনোভাব পয়দা হয়। এই বিশেষ অবস্থার দ্বারা যে মন অভিভূত হয়, সে হর-হামেশা এ দেখতে চায় যে তার খোদা যেন কখনো তার প্রতি নারায না হয়। সে যেন কখনো এমন কাজ না করে বসে যা খোদা পছন্দ করেন না এবং এমন কোন কাজ থেকে বিরত না হয় যা খোদা পছন্দ করেন।

চিন্তা করুন, আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করার এ বাসনা ও চেষ্টা বাস্তবে কখন পূর্ণ ও সফল হতে পারে? এতে সন্দেহ নেই যে, তা পূর্ণ ও সফল হতে পারে তখনই, যখন মানুষ নিজকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং খুশী মতো কাজ করা থেকে আপন প্রবৃত্তিকে বিরত করে। তাকওয়ার স্থান অধিকার করার একমাত্র পন্থা এই যে, প্রবৃত্তির মুখে লাগাম লাগাতে হবে এবং তার ইচ্ছার উপরে তাকে ছেড়ে দেয়া চলবে না। কোরআন মজীদের নিম্ন আয়াত থেকে একথা পরিষ্কার জানা যায়।

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوٰى

"এখন ঐ ব্যক্তির কথা বলা যাক। যে তার মনে এ ভয় পোষণ করলো যে তাকে তার প্রভুর সামনে দাঁড়াতে হবে এবং সে তার মনকে প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে বিরত রাখলো, নিশ্চিতরূপে তার স্থান হবে জান্নাত।"

-(সূরা আন নাযিয়াত ঃ ৪০-৪১)

এখন রোযার দিকে দৃষ্টিপাত করুন যে, সে কোন্ বস্তু। রোযার বুনিয়াদী এবং আইনগত অস্তিত্ব তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত—

- কিছু না খাওয়া।
- কিছু পান না করা।
- যৌন বাসনা পূর্ণ না করা।

www.pathagar.com

অন্য কথায় পান-আহার এবং যৌন মিলন—এ তিনটি মনের দাবীকে সংযত করে রাখা। মনের সমগ্র দাবীর মধ্যে এ তিনটি বস্তুর যে স্থান তা যে তাদের জন্যেই নির্দিষ্ট তা বলার দরকার করে না। মনের এমন আর কোন বাসনার নাম করা যেতে পারে না যা এ তিনটির মতো এতটা সর্বব্যাপী, জোরদার এবং এতটা সীমাহীন। প্রথমতঃ তার মধ্যে এমন এক অশুভ শক্তি আছে যা মানুষকে সহজেই ঘায়েল করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এ শুধু একটা বাসনাই নয়, বরঞ্চ মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজনও। এসব প্রয়োজন পূরণের উপর আপন সত্তা ও মানবজাতীয় সত্তা নির্ভরশীল। নিজে বেঁচে থাকার জন্যে খানা-পিনার এবং বংশ বৃদ্ধি অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে যৌন মিলন সর্বাবস্থায় তার প্রয়োজন।

এসব জিনিসগুলোর এই দ্বিতীয় পজিশন এসবের শক্তি ও প্রভাবকেও বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় যার মুকাবিলা করা বড়োই কঠিন হয়ে পড়ে। রোযার মধ্যে বড়ো এ তিনটি কামনা-বাসনার উপরে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। দৈনিক দশ-বারো ঘন্টা করে অবিরাম এক মাস পর্যন্ত মানুষ তার মনের এসব দাবীর মুখে তালা লাগিয়ে রাখে। পিপাসার আধিক্যে কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে যায়। মুখ থেকে ঠিক মতো কথা বেরয় না। কাছে ঠাণ্ডা পানি থাকে এবং অধীর হয়ে তা মুখে চেপে ধরতে চায়। রোযা তখন তার হাত ধরে ফেলে এবং সে তখন একেবারে অসহায় হয়ে পড়ে।

অপর দু'টি বাসনারও এই একই অবস্থা হয়। এখন অনুমান করুন যে, ক্রমাগত তিরিশ দিনের এই অভ্যাস মানুষের মধ্যে ধৈর্য ও সংযমের কত বড়ো শক্তি সৃষ্টি করে। যে ব্যক্তি তার কামনা বাসনার মধ্যে সবচেয়ে মযবুত ও অসহিষ্ণু কামনাকে একটা উল্লেখযোগ্য সময় পর্যন্ত দাবিয়ে রাখার অবিরাম অভ্যাস করে চলে তার থেকে এ আশাই করা যেতে পারে যে, সে তার অন্যান্য বাসনাগুলোকে অধিকতর সহজে এবং সফলতার সাথে দাবিয়ে রাখতে পারবে। এ এমন এক সুস্পষ্ট সত্য যে, তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। আর এ সত্যকে স্বীকার করে নেয়ার অর্থ এ স্বীকার করে নেয়া যে রোযা মনকে এবং তার যাবতীয় কামনা বাসনাকে কন্ট্রোল করার পূর্ণ শক্তি মানুষের মধ্যে পয়দা করে। এমন এক শক্তি যা লাভ করার পর সে দ্বীনের অনুসরণ এবং আহকামে এলাহীর আনুগত্যের মধ্যে প্রবৃত্তি ও শয়তানের যাবতীয় হামলার মুকাবিলা করতে পারে। অর্থাৎ সত্যিকার অর্থে সে একজন খোদাভীরু ও মুত্তাকী ব্যক্তি হয়ে যায়।

এছাড়া আরও একটা কারণ আছে যার জন্যে রোযা তাকওয়ার এক অসাধারণ উপায় বলে প্রমাণিত হয়। তার দিকে নবী করীমের (সা) নিম্নোক্ত ইংগিত লক্ষ্যণীয়ঃ

www.pathagar.com

لَيْسَ فِى الصِّيَامِ رِيَاءٌ

"রোযার মধ্যে রিয়া হতে পারে না।"–(ফতহুল বারী)

রোযার এবাদতে 'রিয়া' না থাকা একথারই বিরাট নিশ্চয়তা দান করে যে, তা বান্দাকে খোদার নিকটবর্তী করে দিয়েছে এবং এ নিশ্চয়তাও যে, এরূপ এবাদত থেকে অধিকতর তাকওয়ার নির্ভরযোগ্য উৎস আর কিছু হতে পারে না। একে তাকওয়ার সবচেয়ে শক্তিবর্ধক টনিক বললেও ভুল হবে না। রসূলে খোদার এরশাদ মুতাবিক রোযার একটা স্থায়ী গুণ এই যে, তার মধ্যে 'রিয়া' হতে পারে না। অতএব তা যে তাকওয়া অর্জনের একটা শক্তিশালী উপায়, তাতে সন্দেহ নেই। যেসব এবাদতের মধ্যে রিয়ার প্রভাব থাকে তা যদি মানুষকে তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত করতে পারে, তাহলে এ রোগ থেকে যে এবাদত মুক্ত, তা অধিকতর গুণে গুণান্বিত করতে পারে।

রোযার মধ্যে 'রিয়া' নেই কেন?

এ কোন গোপন রহস্য নয়। বরঞ্চ এ তত্ত্বটি সহজেই বুঝতে পারা যায়। সকলেই জানে যে, রোযা এমন একটি এবাদত যা আগাগোড়া নেতিবাচক। অর্থাৎ সে কিছু কাজ সমাধা করার জন্যে আসেনি (যেমন যাকাত ও হজ্জ) বরঞ্চ কিছু না করার জন্যে এসেছে। সত্য কথা এই যে, এ ধরনের কাজ অপরে না দেখতে পায় না শুনতে পায়। আর যদি কোন এবাদতের অবস্থা এমন হয় যে, তাকে না কেউ দেখতে পেল, আর না শুনতে পেল, তাহলে তার মধ্যে 'রিয়া' এবং প্রদর্শনীর কোন সম্ভাবনাই রইলো না। অতএব যাবতীয় আরকানে ইসলামের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য শুধু রোযারই আছে যে রিয়া প্রদর্শনের বিপজ্জনক শয়তান তার উপর আঘাত হানতে পারে না।

প্রকাশ্যতঃ রোযার এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান ছিল বলেই কোরআন لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ কথাটি রোযার হুকুমের সাথেই বলে দিয়েছে। অন্য কোন এবাদতের হুকুমের সাথে এ শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। অবশ্যি এ সত্যটি অনস্বীকার্য যে, মানুষের মধ্যে নেকির সম্পদ এবং তাকওয়ার নূর সব এবাদতই পয়দা করে।

আবার সম্ভবতঃ একমাত্র রোযারই এ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান আছে যার জন্যে আল্লাহ এ একটি এবাদত ক্রিয়াকে নিজের অথবা নিজের জন্যে বলে অবিহিত করেছেন এবং প্রতিদান এ ওজনের পাল্লায় সবচেয়ে ভারি আমল বলে উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

كل عَملِ بن ادم يضاعف الحسنة عشر اَمثالهَا الى سبعَ مَائِة ضعف قَالَ اللّٰهُ تَعالى اِلاَّ الصَّومَ فَاِنَّه لِي وَاَنَا اَجزِى بِه يَدع شهوته وطعامه لاجلى -

"মানুষ তার প্রতিটি নেক আমলের প্রতিদান দশগুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত পাবে। আল্লাহ বলেন, কিন্তু রোযা এর ব্যতিক্রম। কারণ ও আমার জন্যে এবং আমিই এর (যতটা চাইব) প্রতিদান দেব। কারণ মানুষ তার নিজের যৌন বাসনা এবং খানাপিনা আমারই জন্যে ঠেকিয়ে রেখেছে।" -(মুসলিম)

রোযার উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, সে মানুষের মধ্যে তাকওয়া পয়দা করবে যেমন জানতে পারা গেল, তাহলে তার অর্থ এই হলো যে, এ তাকওয়াই রোযার আসল কষ্টিপাথর। রোযার রূপ ও আইনগত অস্তিত্ব যদি এই হয় যে, মানুষ পানাহার এবং যৌন সহবাস থেকে দূরে থাকবে তাহলে তার গুরুত্ব এবং প্রকৃত অস্তিত্ব এই যে, ঐসব বিষয় থেকে দূরে থাকতে হবে যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করবে। যদি কোন ব্যক্তি রোযা রেখে শুধুমাত্র নিজের উপরোক্ত তিনটি বাসনাকেই নিয়ন্ত্রিত করে না, বরঞ্চ তার যাবতীয় কামনা বাসনাকে আহকামে ইলাহীর নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেয় তাহলে সেই হবে প্রকৃত অর্থে রোযাদার। কিন্তু যদি সে এরূপ না করে, তাহলে তার রোযা হয় না। হয় শুধু উপবাস অথবা ক্ষুধার্ত হয়ে থাকা। কেননা পানাহার ও যৌনবাসনা থেকে বেঁচে থাকাই আসল রোযা নয়। বরঞ্চ আসল রোযার শুধু বাহ্যিক আকৃতি এবং একটা আইনগত আলামত। যদি কেউ এই বাহ্যিক এবং আইনগত সীমা পর্যন্ত গিয়ে থেমে যায়, তাহলে তার অবস্থা এছাড়া আর কিছু হবে না যে সে রোযার ঘরের চারিদিকে ঘুরাফেরা করে চলে এলো, ঘরের ভেতর প্রবেশ করলো না। নবী (সা) বলেন ঃ

كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهٗ مِنْ صِيَامِهٖ اِلاَّ الظَّمَاءُ -

"কত রোযাদার এমন আছে যাদের পাল্লায় রোযাজনিত পিপাসা ব্যতীত আর কিছুই পড়বে না।"-(দারেমী)

এই তথাকথিত রোযাদার কোন্ ধরনের ? এর বিশ্লেষণ নবীর আর একটি হাদীসে পাওয়া যায় ঃ

مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ -

www.pathagar.com

"যে কেউ (রোযা থাকা অবস্থায়) মিথ্যা বলা এবং মিথ্যার উপর আমল করা ছেড়ে না দিবে, সে যেন জেনে রাখে যে, আল্লাহ তায়ালার এ বিষয়ে দরকার ছিল না যে, সে ব্যক্তি পানাহার ছেড়ে দিক।"–(বুখারী)

নবী পাকের এসব বাণী একথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে, প্রবৃত্তির এই তিনটি দাবীর উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করার উদ্দেশ্য আসলে তার সমগ্র কামনা বাসনা দমন করে রাখা। অতএব যদি কেউ এ অভ্যাস এবং ট্রেনিং এর দ্বারা নিজের প্রবৃত্তির মুখে লাগাম লাগাতে না পারলো এবং রোযার অবস্থাতেও তার কুকর্মগুলো দস্তুর মত জারি থাকলো ; তাহলে তা একথারই প্রমাণ যে, সে রোযার উদ্দেশ্যই বুঝতে পারেনি। অথবা বুঝে থাকলেও তদনুযায়ী কাজ করেনি। যদি সে রোযার উদ্দেশ্য বুঝেও তা কার্যকর করলো না তাহলে নিঃসন্দেহে সে রোযা রেখেও বে-রোযাদার রয়ে গেল এবং প্রকৃতপক্ষে তার এবং বে-রোযাদারের মধ্যে কোন পার্থক্যই রইলো না।

রোযা তাকওয়ার অপরিহার্য পন্থা ঃ রোযার দ্বিতীয় বিরাট গুরুত্ব এই যে, এ মানুষের মধ্যে তাকওয়ার বাঞ্ছিত গুণ পয়দা করার জন্যে অপরিহার্য। অর্থাৎ শুধু এতটুকু নয় যে, রোযা তাকওয়া পয়দা করে। বরঞ্চ রোযা ব্যতীত তাকওয়া পয়দাই হতে পারে না। অবশ্যি এমন অনেক কিছু আছে যা তাকওয়াকে বর্ধিত ও উন্নত করে। কিন্তু রোযা এ ব্যাপারে যে কাজ করে অন্য সবকিছু তারই অংশ। দ্বিতীয় কোন আমল তার সমতুল্য হতে পারে না। এ গুরুত্ব আমরা উপরোক্ত শব্দগুলোর মধ্যে দেখতে পাই।

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ

চিন্তা করে দেখুন, এ আয়াতের উদ্দেশ্য যদি এতটুকু বলা হতো যে, রোযা মুসলমানদের জন্যে এ কারণে ফরয করা হয়েছে, যেন তাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণ পয়দা হয় তাহলে এ শব্দগুলো যোগ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ এ অবস্থায় শব্দগুলোর সংযোজন ইতিহাসের একটা ঘটনা প্রকাশ ও বর্ণনা করার চেয়ে আর অধিক কিছু হতো না। যেহেতু আমরা সকলে জানি যে, কোরআন হাকিমের স্থান ইতিহাস প্রণয়নের বহু উর্ধে। সে এমন শব্দ উচ্চারণ করে না যার সাথে কোন দ্বীনি উদ্দেশ্য জড়িত না থাকে। অতএব এ শব্দগুলোর ব্যাপারেও এটাকে একটা স্থিরীকৃত সত্য মনে করতে হবে যে, এসবের সংযোজন কোন না কোন দ্বীনি উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যের জন্যেই করা হয়েছে। এই দ্বীনি উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না যে, তাকওয়া অর্জনের কথা বলার সাথে সাথে এর অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তাও প্রকাশ করা হয়েছে। রোযার ফরযত্ব ও তার উদ্দেশ্য জানার সাথে সাথে মানুষ এটাও

www.pathagar.com

জানুক যে তাকওয়ার বাঞ্ছিত স্থানে পৌঁছতে হলে রোযা অবশ্যই জরুরী। অন্য কোন জিনিসই এ ব্যাপারে সে কাজ করতে পারে না, যা রোযা পারে। যদি তাই না হতো, তাহলে রোযা প্রত্যেক আসমানী শরীয়তের স্তম্ভ হতো না। অতীতের কোন শরীয়তকেই যদি রোযা থেকে খালি না রাখা হয়ে থাকে তাহলে এটা একথারই প্রমাণ যে, আল্লাহর দ্বীনের সাথে নামায ও যাকাতের মতো রোযাও স্বাভাবিকভাবে ন্যায়সংগত। একে বাদ দিলে আল্লাহর এবাদতের তরবিয়তি নেযাম (প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা) কিছুতেই পূর্ণত্ব লাভ করে না।

তাকওয়ার বাঞ্ছিত গুণ পয়দা করার জন্যে রোযা কেন দরকার তা বুঝতে হলে পেছনের আলোচনা আর একবার স্মরণ করে নেয়া উচিত। এ এক বাস্তব সত্য যে, রোযা মানুষের মধ্যে আত্মসংযম পয়দা করার বড়ো ফলপ্রসূ ও নিকট পন্থা। আর দ্বিতীয় কথা এই যে, রোযাই এমন এক এবাদত যার মধ্যে 'রিয়া' প্রবেশ করতে পারে না। এ দু'টি বস্তু একথা বুঝার জন্যে খুবই যথেষ্ট। পুরোপুরি না হলেও তা এ রহস্য অনেকটা প্রকাশ করে দেয় যে, একজন সাধারণ মানুষের জন্যে রোযা কেন অপরিহার্য। সামনের আলোচনা লক্ষ্য করলে ইনশাআল্লাহ অবশিষ্ট অস্পষ্টতাটুকু দূর হবে।

রোযা তাকওয়ার ইসলামী মতবাদের আয়না স্বরূপ ঃ রোযার তৃতীয় গুরুত্ব এই যে, এ ইসলামের আসল মেজায প্রকৃতির বড়ো ভাষ্যকার এবং দ্বীনের যে ধারণা মতবাদ কোরআন দিয়েছে, তার বিশিষ্ট রূপ রোযার আয়নায় সুস্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হয়। তার মর্ম এই যে, রোযা মানুষকে শুধু আমলের মুত্তাকীই বানায় না, চিন্তা ও দৃষ্টিভংগীর মুত্তাকীও বানায়। সে মানুষকে শুধু তাকওয়াই দান করে না—তাকওয়ার সামগ্রিক মর্মার্থও জানিয়ে দেয়। নবী করীমের (সা) এরশাদ থেকে আমরা এর ব্যাখ্যা পাই।

لَاصَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ

০ যে সারাজীবন অবিরাম রোযা রাখলো, তার রোযা রোযাই হলো না।"
• –(বুখারী)

اِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ-

০ দুই অথবা দু'য়ের অধিক দিন মিলিয়ে (নফল) রোযা রাখা থেকে তোমাদের দূরে থাকা উচিত।"–(মুসলিম)

একবার এক সফরে নবী করীম (সা) দেখলেন লোক এক জায়গায় ভিড় করে আছে এবং একজনের মাথার উপর ছায়া করে আছে। ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করা হলে বলা হলো—উনি একজন রোযাদার। এরশাদ হলো ঃ

www.pathagar.com

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِى السَّفَرِ -

"এটা কোন নেকির কাজ নয় যে, সফরে রোযা রাখতে হবে (যার কষ্ট বরদাশত করা সাধ্যাতীত হয়ে পড়ে)।"–(বুখারী)

০ মদীনার বাইরে অবস্থানকারী এক সাহাবী একদা নবীর খেদমতে হাযীর হলেন। তারপর সাক্ষাত করে ফিরে গেলেন। এক বছর পর আবার দ্বিতীয়বার এলেন। এবার এমন অবস্থায় এলেন যে, তাঁর চেহারা সুরত অন্য রকম হয়েছিল। নবীকে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি আমাকে চিনতে পারেননি ?"

নবী বললেন, "তুমি কে ?"

তিনি বললেন, "আমি সেই ব্যক্তি যে গত বছর আপনার খেদমতে হাযীর হয়েছিল।"

নবী বললেন, "তোমার এ চেহারা কিসে পরিবর্তন করে দিল ? তুমি তো দেখতে শুনতে বেশ সুন্দর ছিলে ?"

তিনি বললেন, "এখান থেকে যাবার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি কখনো রাত ব্যতীত খানা খাইনি (অর্থাৎ অবিরাম রোযা রেখেছি)।"

নবী এরশাদ করলেন ঃ

لِمَ عَذَّبْتَ نَفْسَكَ -

"তুমি তোমার নিজকে কেন এ আযাব দিলে ?"–(আবু দাউদ)

এসব হাদীসে সুদূরপ্রসারী চাহিদার প্রতি লক্ষ্য করুন। তাহলে জানতে পারবেন যে, রোযা তার আপন মুখে দ্বীনদারির এক ধারণা ঘোষণা করেছে। সে দৃপ্তকণ্ঠে বলেছে, যে তাকওয়াকে আমার উদ্দেশ্য বলে অভিহিত করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য হলো নফসকে হত্যা করা নয়, শুধু আত্মসংযম।

বস্তুতঃ রোযা তাকওয়া শুধু পয়দাই করে না, বরঞ্চ তার এক গূঢ়তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে যা সাধারণতঃ খুব কমই বুঝতে পারা যায়। কেননা তাকওয়া শব্দটি শুনার সাথে সাথে মনের মধ্যে সাধারণতঃ এমন একটা ধারণা ঘুরপাক খেতে থাকে যে, মানুষ আপন নফসের দাবীসমূহ ঠেলে ফেলার জন্যে সম্মুখে অগ্রসর হয়, যে ব্যক্তি তার নফসকে যতবেশী আঘাত করতে থাকবে, সে তাকওয়ার ততবেশী উচ্চস্থান অর্জন করবে। কোরআন বলেছে ঃ

اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى

www.pathagar.com

"আপন নফসকে তার কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখতে না পারলে খোদার ভয় বা তাকওয়া হাসিল করা যায় না।" কিন্তু রসূলে খোদার (সা) এই এরশাদসমূহ বলে এবং রোযাও তার অস্তিত্বের দ্বারা বলে যে আয়াতটির মর্ম এবং দাবী তা কখনো নয় এবং ইসলামের তাকওয়ার যে মর্ম তা এর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। মানুষের কাছে সে যে ধরনের আমল দাবী করে এবং যে বস্তুকে নেকি এবং তাকওয়া বলে অভিহিত করে তা শুধু এই যে নসফকে অবাধ্য হতে দেয়া হবে না। তাকে ইচ্ছা মতো কাজ করা থেকে বিরত রেখে শরীয়তের আহকামের অনুগত বানাতে হবে। এ নয় যে, তাকে কষ্ট দিয়ে দিয়ে একেবারে পংগু করে দিতে হবে এবং তার ভালো কাজ করার দাবীগুলোকেও নস্যাৎ করে দিতে হবে। অপরের চোখে এ ধরনের দ্বীনদারির যতোই উচ্চ ও মহান ধারণা পোষণ করা হোক না কেন, ইসলামের কাছে এ একেবারেই অবাঞ্ছিত। এটাকে সে প্রকৃত দ্বীনদারি এবং বন্দেগীর সঠিক পদ্ধতি বলে স্বীকার করে না। তার দ্বীনের ধারণার দৃষ্টিতে এটা তাকওয়া নয় বরঞ্চ নিজে নিজের উপরে শাস্তি দেয়া। রোযার অস্তিত্ব এ মর্মকথা চিরদিনের জন্যে স্মরণ করিয়ে দেয়।

এরপরে কিছু মূল্যবান কথা শুনন ঃ

تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السَّحُوْرِ بَرَكَةً ـ

"তোমরা সেহরী খেতে থাকবে। কারণ এর মধ্যে নিশ্চয় বড়ো বরকত আছে।"–(মুসলিম)

لَايَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَّا عَجَّلُوا الْفِطْرَ ـ

"যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা ইফতার করার জন্যে ক্ষীপ্রতা করতে থাকবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তারা মঙ্গলপূর্ণ অবস্থায় থাকবে।"–(মুসলিম)

لَايَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرِ ـ

"দ্বীন ততদিন পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে যতদিন মানুষ ইফতার করার জন্যে ক্ষীপ্রতার সাথে কাজ করবে।"–(আবু দাউদ)

قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَحَبُّ عِبَادِىْ اِلَىَّ اَعْجَلُهُمْ فِطْرًا ـ

"আল্লাহ বলেন, "আমার সবচেয়ে প্রিয় বান্দাহ সেই, যে ইফতার করতে সবচেয়ে বেশী তাড়াতাড়ি করে।"–(তিরমিযি)

পূর্বের হাদীসগুলোতে যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী তত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, এসব সেগুলোকে আরও বেশী সুস্পষ্ট করে দিচ্ছে। বরঞ্চ বলতে হয়

www.pathagar.com

যে সেগুলোর পূর্ণতা বিধান করছে। ঐ হাদীসগুলোর দৃষ্টিতে রোযা একথা ঘোষণা করছিল যে, তাকওয়ার উদ্দেশ্য নফসকে হত্যা করা নয়, আত্মসংযম। আর এ হাদীসগুলোর দৃষ্টিতে সে আত্মসংযমের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছে যে, তার মধ্যে মতামতের সংযম এবং রুচির সংযমও শামিল আছে। অর্থাৎ যেভাবে নিজের নফসকে আহকামে এলাহীর অধীন রাখতে হবে ঠিক তেমনি, আহকামে এলাহী অনুসরণের ব্যাপারে নিজের রুচি, প্রবণতা এবং মতামতেরও কোন স্বাধীনতা থাকবে না। প্রকৃত তাকওয়ার আসল স্থান শুধু একথাটুকুর দ্বারা অর্জন করা যায় না যে, খোদা ও রসূলের আহকামের বিরোধিতা থেকে নফসকে বিরত রাখা হোক। তার জন্যে এটাও জরুরী যে, এসব হুকুম মেনে চলার এবং খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করার ব্যাপারে আপন মতামত, প্রবণতা ও রুচি জ্ঞানকে তখনো কোন কিছু বলার অধিকার দেয়া যাবে না, যখন বাহ্যতঃ তাদেরকে খোদার আনুগত্য করতে দেখা যাবে।

নেতিবাচক ও ইতিবাচক সর্বাবস্থায় খোদার বন্দেগী করা মানুষের উচিত এবং ঠিক ঐ পদ্ধতিতেই উচিত যেমনভাবে তাকে করতে বলা হয়েছে। নফসের কামনা বাসনা তাকে দ্বীনের হুকুম পালনে বিরত রাখতে চাইলে, তাকে যেমন আছড়ে মারতে হবে, ঠিক তেমনি এ হুকুম পালনের পদ্ধতি এবং সীমা নির্ধারণেও সে মনের কোন কথা শুনবে না। সে আল্লাহর বন্দেগী এবং তাকওয়ার জীবন শুধু এটাই মনে করবে যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যে কাজকে যেভাবে এবং যে পদ্ধতিতে করতে বলেছেন তা ঠিক সেভাবেই এবং সে পদ্ধতিতেই করতে হবে। আর যে কাজ থেকে যে সীমারেখা পর্যন্ত গিয়ে যেভাবে নিবৃত্ত থাকতে বলা হয়েছে, সে সীমারেখা পর্যন্ত গিয়ে সেভাবেই নিবৃত্ত হতে হবে। তার মনকে এ তত্ত্ব কথায় নিশ্চিত হতে হবে যে, যেভাবে অমুক কাজটি দ্বীনের একটা হুকুম এবং তা করা নেকী ও বন্দেগীর দাবী, আনুগত্যের প্রেরণার দ্বারা পরিচালিত হলেও তার সীমারেখা ও পরিমাণ সম্পর্কে নিজের পক্ষ থেকে কমবেশী না করাও ঠিক তেমনি নেকি ও বন্দেগীর দাবী।

রোযা নফসের সংযমের সাথে 'মতামত' ও 'অভিরুচির' সংযমকেও যেভাবে তাকওয়ার অর্থের মধ্যে শামিল করে, তার দীর্ঘ বিশ্লেষণের প্রয়োজন করে না। একদিকে রোযা ফরয করার উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন করা। অপরদিকে এ সতর্কবাণী করা হচ্ছে যে, সেহরী না খেয়ে রোযা রাখা এবং ইফতারে বিলম্ব করা মংগলময় অবস্থার অবসান ও দ্বীনের পরাজয়ের লক্ষণ বলা হয়েছে। এ দু'টি কথাকে এক সাথে চিন্তা করলে জানা যাবে যে, সেহরী না খাওয়া এবং ইফতার বিলম্বে করা তাকওয়ার পরিপন্থী। অথচ এ দু'টি ব্যাপারে নফসের যে কিছু সুবিধা হচ্ছে তা নয়। বরঞ্চ তার অবাধ্যতা খতম করতে কিছু

www.pathagar.com

সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে। অতএব একথাগুলো প্রকাশ্যতঃ রোযার উদ্দেশ্য (তাকওয়া) অর্জনের জন্যে অনুকূলই মনে হচ্ছে। কিন্তু আল্লাহর রসূল বলেন যে, প্রকৃত ব্যাপার এর বিপরীত। তা কেন ? এই 'কেন'র জবাব এ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে যে, এভাবে রোযার মধ্যে আপন মতামত ও অভিরুচিকে হস্তক্ষেপের অধিকার দেয়া হচ্ছে। তা এভাবে যে, আল্লাহ তায়ালা রোযার যে শুরু ও শেষ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেহরী না খাওয়ার এবং ইফতার বিলম্বে করাতে তা পুরোপুরি মেনে চলা হচ্ছে না তাঁরই নির্ধারিত রোযার শুরু ও শেষ পছন্দনীয় বলে মনে হচ্ছে না। এগুলোকে সিদ্ধান্তকর গুরুত্ব দিতে দেখা যাচ্ছে না। বরঞ্চ এর দ্বারা একথাই প্রকাশ হচ্ছে যে, তাঁর নির্ধারিত সময়সূচীকে যথেষ্ট মনে করা হচ্ছে না এবং তার বাড়িয়ে দেয়াকে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যে অধিকতর উপযোগী ও মংগলকর মনে করা হচ্ছে। এ যে পরিষ্কার এবাদতের ব্যাপারে নিজের মতামত ও অভিরুচিকে হস্তক্ষেপের অধিকার দেয়া হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। সেহরী না খাওয়াকে এবং বিলম্বে ইফতার করাকে বরকতহীন তাকওয়ার পরিপন্থী মনে করার কারণ এই একটি ছাড়া আর কিছু নয়। তাই যদি হয়, তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, রোযা শুধু আত্মসংযমকেই তাকওয়ার সঠিক অর্থ ও উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করে না। বরঞ্চ মতামত ও অভিরুচির সংযমকেও অনিবার্যরূপে তার মধ্যে শামিল করে। সে তাকওয়ার ব্যাখ্যা এই করে যে, মনের কামনা-বাসনার মতো অভিরুচি ও মতামতের স্বাধীনতার উপরেও আহকামে এলাহীর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ থাকবে।*

রোযার এ অসাধারণ গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করলে এ অনুমান করা কঠিন হবে না যে, তাকে ইসলামের একটা স্তম্ভ কেন বানানো হয়েছে এবং তাকে বাদ দিয়ে দ্বীনের প্রাসাদ কেন নির্মিত হতে পারে না।

---

* মাযহাব সম্পর্কে যে সাধারণ মানসিকতা বিরাজ করে, সত্যিকার তাকওয়া উপরোক্ত ধারণা ও রসূলের বাণী তার কাছে বড়ো আজীব মনে হবে। কিন্তু এই বিস্ময়বোধই হলো দ্বীনের সেই গুণ বৈশিষ্ট্য যা একে অন্যান্য ধর্মীয় মতবাদ থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। সত্য কথা এই যে, সাধারণ প্রবণতাকে সামনে রেখেই আল্লাহর নবী এ ধরনের এরশাদ করেছেন। এসব বলার সময়ে অতীত উম্মতসমূহের ইতিহাস তাঁর সামনে ছিল। ছিল দ্বীন বিকৃতির অভিজ্ঞতা। ছিল প্রবৃত্তি হত্যা ও রাহবানিয়াতের (বৈরাগ্য) দর্শন। তাঁর জানা ছিল, আল্লাহর দ্বীনকে শুধু প্রবৃত্তি পূজকরাই ধ্বংস করতো না। বরঞ্চ ধার্মিক ব্যক্তিদের অতিশয় বাড়াবাড়িও তাকে একটা নতুন রূপে রূপান্তরিত করতো এবং সৃষ্টি করতো এক নতুন রুচিবোধ। যে বস্তু ও এবাদতের মধ্যে এ বাড়াবাড়ির মানসিকতা স্থান পেত তাহলো এই রোযা। এই রোযার এবাদতকে মানুষ অবিরাম ও নিরবচ্ছিন্ন উপবাসের একটা রূপ দিল। আর এই নিষ্পাপ বিশ্বাসের সাথে একথা যোগ দিল যে অনাহার যত দীর্ঘ হবে, রোযার উদ্দেশ্য ততোই পূর্ণতা লাভ করবে। অতপর এ চিন্তাধারা সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে প্রবৃত্তি হত্যা ও রাহবানিয়াতের রূপদান করলো। এ ছিল পশ্চাৎ পটভূমিকা যার ভিত্তিতে শেষ নবী হিসাবে আল্লাহর রসূল (সা) ন্যায়সংগতভাবেই প্রয়োজন বোধ করলেন যে, মানুষকে তিনি সতর্ক করে দেবেন এবং ওসব বিপদাশংকা থেকে ইসলামকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করবেন যার

www.pathagar.com

রোযার কিছু বিশিষ্ট সুফল

রোযা মানুষকে সত্যিকার তাকওয়ার অমূল্য রত্নে ভূষিত করে একথা জানার পর আর কিছু জানা বাকি থাকে না। কেননা যার মধ্যে তাকওয়ার নূর পয়দা হয়েছে, তার থেকে এমন সব কাজই হতে থাকবে যা আল্লাহ এবং তাঁর রসূল চান আর এ এমন এক বস্তু যার অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে দ্বীনের সমুদয় বাঞ্ছিত বস্তুসমূহ। কিন্তু তথাপি কিছু গুণাবলি ও আমল এমন আছে যা রোযার বিরাট উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ফল স্বরূপ। অতএব রোযার উচ্চমর্যাদা পুরোপুরি অনুভব করা সহজ হবে—যদি এসবের প্রতিও এক নযর দেয়া যায়।

☐ রোযা আল্লাহ তায়ালার প্রভুত্ব কর্তৃত্বের বিশ্বাসকে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত করে।

সেহরীর সময় হয়েছে। উঠ খেয়ে-দেয়ে নাও। পূর্বাকাশে উষার শুভ্র আলোকচ্ছটা দেখা যাচ্ছে, এখন খানাপিনা বন্ধ কর। এখন থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন রকমের পবিত্র ও উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী থাকা সত্ত্বেও ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকা।—সূর্য ডুবেছে। রোযা খতম কর এবং ঝটপট কিছু না কিছু খেয়ে নাও।

আদেশ ও আদেশ পালনের এবং প্রভুত্ব ও গোলামির এ এমন এক অভিব্যক্তি যার দৃষ্টান্ত শরীয়তের অন্য কোন আমলের মধ্যে দেখা যায় না। এ

সম্মুখীন খোদার দ্বীনকে হর হামেশা হতে হয়েছে এবং যার কারণে দ্বীনের রূপ পরিবর্তন করে অন্যরূপ দেয়া হয়েছে। রোযাকে প্রবৃত্তি হত্যা, ভোগবিলাস পরিহার এবং রাহবানিয়াতের মনোমুগ্ধকর আশ্রয়স্থল বানাবার প্রবণতাকে তিনি দৃঢ়তার সাথে রুখতে চাইলেন। এ জন্যে তিনি মানুষের মনে একথা বদ্ধমূল করাতে চাইলেন যে, আল্লাহ তায়ালা রোযার যে শুরু এবং শেষ নির্ধারণ করেছেন, বাস্তবে তা ঠিক রাখতে হবে এবং নিজের ইচ্ছামত তার মুদ্দত বাড়ানো কিছুতেই চলবে না। নতুবা মানুষ এরূপ ভালো ধারণা পোষণ করবে যে, এ আমল করা হচ্ছে আল্লাহরই জন্যে। আর এতে তাদের মংগলই হবে। কিন্তু সত্যিকার অবস্থা হবে অন্যরূপ। কেননা কাজ তাদের যতবড়ো নেকি ও আনুগত্যের কাজ হোক না কেন এবং নিয়তের দিক দিয়ে যতই আল্লাহর ওয়াস্তে ও আল্লাহতে বিলিয়ে দেয়া হোক না কেন, তা দ্বীনের আসল মেজায প্রকৃতি এবং বন্দেগীর সত্যিকার ধারণা অবশিষ্ট থাকতে দেবে না। আর এটা এতবড়ো বঞ্চনা যার থেকে অব্যাহতি নেই। দ্বীনের ধ্বজাবাহক উম্মত এই যদি না জানে যে, তাদের সঠিক পথ ও গন্তব্যস্থান কি, তাহলে তারা তাদের দায়িত্ব ঠিক ঠিক কিভাবে পালন করবে? এ অতীব গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য সামনে রাখলে দেখা যাবে যে, সেহরী এবং ইফতারের মতো একটা সাধারণ প্রশ্ন বিরাট প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। এটা আসলে দ্বীনের সুষ্ঠু ধারণা জিইয়ে রাখার প্রশ্ন। সেহরী ইফতারের এই শরীয়তী নির্দেশের উপর আমল করা প্রকৃতপক্ষে দ্বীনের সত্যিকার মেজায প্রকৃতি সংরক্ষণের অনিবার্য পন্থা। তাকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করা মানে তার ভাঙনের পথ খুলে দেয়া। এভাবে যদি দ্বীন তার মেজায প্রকৃতি ও ধারণার পরিবর্তন সাধন করে, আংশিকভাবেও রাহবানিয়াত অবলম্বন করে, তাহলে উম্মতের মংগলজনক অবস্থায় থাকার এবং দ্বীনের বিজয়ী থাকার কোন প্রশ্নই বাকি থাকে না।-গ্রন্থকার

www.pathagar.com

অবস্থা নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার সর্বময় শাসনক্ষতার মালিক হওয়াটাকে একটু চাক্ষুষ বিশ্বাসে পরিণত করে।

☐ রোযা ইসলামী সমাজে সহানুভূতির এক স্রোত প্রবাহিত করে। সে মালদারকে ক্রমাগত এক মাস পর্যন্ত ক্ষুধা তৃষ্ণার এক বাস্তব অভিজ্ঞতা শিক্ষা দেয়। অনাহার ও ক্ষুধা কাকে বলে এবং তার কবলে যারা পড়ে সে সব খোদার বান্দাদের কেমন দুঃখ-কষ্ট হয়, তা অন্ততঃ এক মাস পর্যন্ত তারা অনুভব করে। এ বাস্তব অভিজ্ঞতা অনুভূতি স্বাভাবিকভাবে তাদের মধ্যে এ সংকল্প পয়দা করে দেয় যে, তাদের আপন গরীব ও দুস্থ ভাইদেরকে এ অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হবে না। এভাবে তাদের মধ্যে মানবিক সহানুভূতি ও ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহর প্রেরণা বাড়তে থাকে। সে জন্যে নবী (সা) এ রমযান মাসকে "শাহরুল মুয়াসাত" অর্থাৎ সহানুভূতির মাস বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর নিজের অবস্থাও তখন এমন হতো যে জেলখানায় কোন কয়েদী বাকি রাখতেন না এবং কোন সাহায্যপ্রার্থীকে ফিরিয়ে দিতেন না।

اِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ اَطْلَقَ كُلَّ اَسِيْرٍ وَّاَعْطٰى كُلَّ سَائِلٍ۔

"রমযান মাস এলে সব কয়েদীকে তিনি ছেড়ে দিতেন এবং প্রত্যেক সাহায্য প্রার্থীকে সাহায্য করতেন।"–(মিশকাত)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, যদিও সকলের চেয়ে তিনি বড়ো দাতা ছিলেন, তবুও রমযান মাসে তাঁর দান অসাধারণভাবে বেড়ে যেত।

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ اَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِىْ رَمَضَانَ۔(بخارى)

☐ রোযা সহানুভূতির প্রেরণা ক্রমশঃ বাড়িয়ে দেয়। এ মাসে আমীর ও গরীব, রাজা-প্রজা, বড়ো-ছোট, মোটকথা উম্মতের সর্বস্তরের জনসাধারণ দেখতে গেলে একই অবস্থায় থাকে। সকলে গোলামির একই স্তরে এসে দাঁড়ায়। সকলের মুখে একই প্রভুর দাসত্ব করার এবং একই প্রকার দাসত্বের ঘোষণা হতে থাকে। এ অবস্থা মুছে ফেলে দেয় তাদের মন থেকে উচ্চ নীচের ধারণা। এভাবে গোটা পরিবেশের উপরে সহানুভূতির একটা গভীর ছায়াপাত হয়।

☐ রোযা মুমেনকে 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর' (আল্লাহর পথে জিহাদ) জন্যে প্রস্তুত করে। জিহাদে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে ক্ষুধা তৃষ্ণা ও বিরামহীন কষ্ট পরিশ্রম সহ্য করতে হয়। নিজের ধন ব্যয় করতে হয়। নিজের জান কোরবান করতে হয়। এ কঠোর অভিযানে দুঃসাহস সেই করতে পারে যার

www.pathagar.com

মধ্যে ধৈর্য ও কষ্ট স্বীকারের শক্তি থাকে এবং যে এসব কষ্ট স্বীকার করতে ও কোরবানী দিতে পারে। ধৈর্য গুণ সৃষ্টি করার এবং কষ্ট স্বীকারে অভ্যস্ত করার জন্যে রোযা সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এ কারণেই নবী (সা) রমযান মাসকে ধৈর্যের মাস এবং রোযাকে অর্ধেক ধৈর্য বলে অভিহিত করেছেন।

❐ ফরয রোযা রাখার যে পদ্ধতি বলা হয়েছে তা মুসলিম সামাজিকতার অনুভূতি জাগ্রত করে এবং মুসলমানদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে তারা একই মিশনের ধ্বজাবাহক। আদেশ হচ্ছে একই মাসে রোযা রাখার। বলা হয়েছে যে সূর্যোদয়ের খানিক পূর্বে সেহরী খেতে হবে এবং সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ইফতার করতে হবে। এভাবে রোযার পদ্ধতিকে এমন এক ছাঁচে ঢালা হয় যে, সব মানুষ একই নির্ধারিত মাসে একত্রে রোযা রাখে। প্রায় একই সময়ে সেহরী খায় এবং একই সময়ে ইফতার করে। চিন্তা করুন কোন দলের মানুষকে একই উদ্দেশ্যের বাহক ও একই অভিযানের সৈনিক হওয়ার অনুভূতি সৃষ্টি করার এ কোন্ এক অসাধারণ ও সূক্ষ্ম পরিকল্পনা যে, তাদের খাওয়া-দাওয়া হবে একই ধরনের এবং হবে একই উদ্দেশ্যে ?

উদ্দেশ্য অর্জনের শর্তাবলী

অন্যান্য এবাদত ও আমলের ন্যায় রোযারও উদ্দেশ্য তখনই অর্জন করা যায় যখন এ শর্তগুলো পালন করা হবে ঃ

☆ প্রয়োজনীয় কায়দা-কানুন এবং শর্তসহ রোযা রাখতে হবে। মনের এখলাস বা ঐকান্তিকতা থাকতে হবে। আল্লাহ মাবুদ এবং নিজে তাঁর গোলাম —এ দৃঢ় বিশ্বাস মনে থাকতে হবে। প্রকৃত মনিবের আনুগত্যের প্রেরণা থাকতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের বাসনা থাকতে হবে। তার সাথে থাকতে হবে আখেরাতের সাফল্যের আশা-আকাংখা। রসূলে খোদার (সা) ভাষায় রোযা রাখতে হবে ঈমান এবং আত্মসমালোচনার সাথে। মন যদি আল্লাহর 'রব' ও 'ইলাহ' হওয়ার বিশ্বাস এবং আখেরাতের সাফল্য প্রার্থনার ভাবধারায় পরিপূর্ণ না হয়, তাহলে সে রোযা অনাহারে থাকা ব্যতীত আর কিছুই হবে না। দেখতে তো মনে হবে যে, ইসলামের একটা স্তম্ভ নির্মাণ করা হচ্ছে। কিন্তু সেখানে নির্মাণ করার কোন নাম নিশানাই থাকবে না।

☆ শুধু ফরয রোযার উপরেই নির্ভর করা চলবে না। নফল রোযাও রাখতে হবে যাতে করে যে উদ্দেশ্যে রোযা ফরয করা হয়েছে তা যেন থেকে থেকে হর-হামেশা স্মরণ করিয়ে দেয়, আর তার সাথে রমযানের পর অন্যান্য মাসেও নফসের প্রশিক্ষণের বাস্তব কর্মপন্থার অল্প বিস্তর পুনরাবৃত্তি হয়। নফল রোযা কতগুলো এবং কোন কোন দিনে রাখতে হয়, তার বিস্তারিত হেদায়েত হাদীসে পাওয়া যায়। প্রত্যেকে তার আপন শক্তি ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সে সবের যে কোনটার নির্বাচন নিজেই করে নিতে পারে।

www.pathagar.com

৫. হজ্জ

ইসলামের পঞ্চম এবং সর্বশেষ রুকন বা স্তম্ভ হজ্জ। হজ্জের আভিধানিক অর্থ 'যিয়ারতের এরাদা করা।" শরীয়তের ভাষায় হজ্জের এবাদতকে হজ্জ এজন্যে বলা হয়েছে যে, হজ্জে মানুষ পবিত্র যিয়ারতের (দর্শন) এরাদা রাখে।

হজ্জের মর্যাদা

হজ্জ এমন প্রত্যেক বালেগ মুসলমানের জন্যে জীবনে একবার ফরয করা হয়েছে, যে মক্কা পর্যন্ত যাতায়াতের শক্তি রাখে। যদি কেউ শক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করে, তাহলে সে তার মুসলমানি মিথ্যা প্রমাণ করে। কোরআন মজিদের এরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً ۞ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ○

"মানুষের উপর এ আল্লাহ্ তায়ালার হক যে, যে ব্যক্তি ঐ ঘর (কা'বা ঘর) পর্যন্ত পৌছতে পারে, সে হজ্জ করবে এবং যে কুফরির মনোভাব পোষণ করলো, সে যেন জেনে রাখে যে, আল্লাহ তায়ালা সারা জাহানের কোন পরোয়া করেন না।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৭)

রাসূলে খোদা বলেন ঃ

مَنْ لَّمْ يَحْبِسْهُ مَرَضٌ اَوْحَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ اَوْ سُلْطَانٌ بِرٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ اِنْشَاءَ يَهُوْدِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا

"যাকে কোন রোগ, কোন প্রকৃত প্রয়োজন, অথবা কোন যালেম শাসক ঠেকিয়ে রাখেনি—এরপরে যদি সে হজ্জ না করে, তাহলে সে চাইলে ইহুদী হয়ে মরুক অথবা নাসরানী বা খৃষ্টান হয়ে মরুক।"

–(সুনানে কুবরা)

হযরত ওমর (রা)-কে বলতে শুনা গেছে ঃ

لِيَمُتْ يَهُوْدِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا يَقُوْلُهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، رَجُلٌ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ وَوَجَدَ لِذَالِكَ سَعَةً وَخُلِّيَتْ سَبِيْلُهُ ـ

"ঐ ব্যক্তির ইয়াহুদী এবং খৃষ্টান হয়ে মরা উচিত, যে ভ্রমণের শক্তি সামর্থ রাখা সত্ত্বেও হজ্জ না করেই মরলো।" (একথা তিনি তিনবার বললেন।)

–(সুনানে কুবরা)

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এ ফরয কাজটি সুষ্ঠুভাবে সমাধা করলো, তার সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার চেয়ে অধিক আশা করা যায় না।

اَلْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلاَّ الْجَنَّةُ۔

"কবুল করা হজ্জের বিনিময়ে জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়।"-(মুসলিম)

مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ اُمُّهُ۔

"যে ব্যক্তি ঐ ঘরের হজ্জ করলো এবং এ সময়ের মধ্যে না সে কোন যৌনক্রিয়া করলো, আর না কোন গুনাহের কাজ করলো এবং তারপর যখন সে হজ্জ করে ফিরে এলো, তখন এমন হলো যেন আজই তার মা তাকে প্রসব করলো।"-(বুখারী)

আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা) কা'বার হজ্জকে এমন উচ্চ মর্যাদা দিলেন কেন? ইসলামের আনুগত্য এছাড়া কেন গ্রহণযোগ্য নয় এবং হজ্জ কেন ও কিভাবে জান্নাতের গ্যারান্টি হলো?

আমাদের দেখতে হবে যে, হজ্জ বস্তুটি কি, দ্বীনের আত্মার সাথে তার কি সম্পর্ক। ইসলামী মন, চরিত্র ও ভূমিকা সৃষ্টি করতে সে কি অংশগ্রহণ করে? মানুষকে যে এবাদতের জন্যে পয়দা করা হয়েছে, তার থেকে দায়িত্বমুক্ত করার জন্যে সে কি করে?

হজ্জের ব্যাপারে এসব কিছু আমরা দু'টি বস্তুর দ্বারা জানতে পারব ঃ

০ স্বয়ং এ কা'বা ঘরটি কি যার হজ্জ করা হয় এবং কি জন্যে তৈরী করা হয়েছে? ইসলামের সাথে তার কি সম্পর্ক?

০ যেসব নিয়ম প্রণালী পালন করা হয়, তা কি কি? তার পেছনে কোন্ ধারণা—মতবাদ রয়েছে?

যদি এসব বিষয়ের পরিষ্কার ধারণা হয়ে যায়, তাহলে ঐসব কিছু জানতে পারা যাবে, যা হজ্জের এসব মহান গুরুত্বের কারণ।

কা'বা নির্মাণ এবং তার গূঢ় রহস্য

প্রথমে কা'বার নির্মাণ এবং তার গূঢ় রহস্যের কথা আলোচনা করা যাক। আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ) নিজ হাতে কা'বা তৈরী করেছিলেন ঃ

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَاعِيْلُ۔

www.pathagar.com

তৈরী করার আদেশ এবং নির্ণয় স্বয়ং আল্লাহ করেছিলেন وَاِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ- এবং সে সময়েই তাঁকে হুকুম দেয়া হয়েছিল যে, যখন ঘর তৈরী হয়ে যাবে, তখন যেন তিনি মানুষকে বলে দেন যে, এ ঘরের হজ্জ করা তাদের জন্যে ফরয। وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ

এ ঘরের যে মর্যাদা ও উদ্দেশ্য আল্লাহ বর্ণনা করেছেন তা এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى

"এবং যখন আমি এ ঘরকে লোকের জন্যে প্রত্যাবর্তনের ও নিরাপত্তার স্থান বানালাম এবং হুকুম দিলাম যে, ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে তোমাদের নামাযের স্থান বানাও।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১২৫)

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ

"নিশ্চিতরূপে প্রথমে যে ঘর লোকের জন্যে (এবাদতের কেন্দ্রস্থল হিসাবে) বানানো হলো, তা ঐ যা মক্কায় অবস্থিত। তার অবস্থা এই যে, তা বরকতপূর্ণ এবং সমস্ত দুনিয়াবাসীর জন্যে হেদায়েতের উৎস।"

-(সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৬)

وَاِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ○

"এবং যখন আমি ইবরাহীমের জন্যে এ ঘরের স্থান নির্ধারণ করলাম (এ হেদায়েত সহ) যে, কাউকে আমার অংশীদার বানিও না এবং এ ঘরকে যেন শির্কের ভেজাল থেকে পাক-পবিত্র রাখা হয় তাওয়াফকারী এবং রুকূ'কারী ও সেজদাকারীদের জন্যে।"-(সূরা আল হজ্জ ঃ ২৬)

অর্থাৎ এ ঘর পরিপূর্ণ মংগল ও বরকতপূর্ণ সমগ্র বিশ্বের জন্যে হেদায়েতের উৎস, আল্লাহর পূজারীদের কেন্দ্রীয় স্থল, নামায কায়েম করার প্রকৃত স্থান* এবং সত্যিকার তৌহিদের কেন্দ্র। একটু চিন্তা করলে অনুভব করা যাবে যে, এ

* এই হলো কারণ যার জন্যে অন্য কোন স্থানে নামায পড়তে হলে এ ঘরের দিকে মুখ করতে হয়। যাতে করে আসল স্থানে নামায পড়া সম্ভব না হলে অন্ততঃ সেদিকে যেন মুখ করা হয়। আসল নামাযের স্থান অর্থাৎ প্রকৃত মসজিদ হলো এই কা'বা এবং দুনিয়ার যাবতীয় মসজিদগুলো এর স্থলাভিষিক্ত।

www.pathagar.com

গুণগুলো পরস্পর ওতপ্রোত জড়িত। বরঞ্চ এরূপ বলা যেতে পারে যে, এ আসলে একই সর্বব্যাপী গুণের বিভিন্ন দিক। যে জিনিস খাঁটি তওহীদের প্রকৃত কেন্দ্র হবে নামাযের স্থানও আসলে তাই হবে এবং যে জিনিস খাঁটি তওহীদের আসল কেন্দ্র হবে তা যে পুরোপুরি হেদায়েত ও বরকতের মূর্তপ্রতীক হবে তাতে সন্দেহ নেই।

আগের আলোচনায় জানতে পারলাম যে, বিশ্বাসের দিক দিয়ে তওহীদ এবং আমলের দিক দিয়ে নামায—এ দু'টি জিনিস সমগ্র দ্বীনের মাথা। অতএব কা'বা যদি তওহীদ ও নামায—এ উভয়ের কেন্দ্র হয়, তাহলে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তা গোটা দ্বীনেরও কেন্দ্র। বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালা তাকে সুস্পষ্ট রূপে "আমার ঘর" বলে অভিহিত করেছেন। তার পরিষ্কার অর্থ এই যে, তা আল্লাহর দ্বীনের ঘর অথবা কেন্দ্র।

হযরত ইবরাহীমের (আ) তৈরী এ কা'বা আল্লাহর দ্বীনের ঘর এবং ইসলামের কেন্দ্র কেন এবং কিরূপে হলো ? এ বুঝার জন্যে একদিকে তো এ দেখা উচিত যে, তার নির্মাণের পটভূমিকা কি। দ্বিতীয় দিক এই যে, তার নির্মাণের পর তা নির্মাণের উদ্দেশ্যের খাতিরে কি বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

হযরত ইবরাহীমকে (আ) যখন তাঁর জাতি হিজরতের জন্যে বাধ্য করলো, তখন বিভিন্ন দেশে হকের দাওয়াত ছড়াতে ছড়াতে তিনি মক্কার প্রস্তরময় প্রান্তরে উপস্থিত হলেন। প্রথমতঃ সেই সর্বজনবিদিত স্বপ্নের ঘটনা ঘটলো যার মধ্যে তিনি তাঁর একমাত্র প্রিয় পুত্রকে যবেহ করতে দেখলেন। এ স্বপ্নের কথা যখন তিনি তাঁর প্রাণাধিক পুত্রকে জানালেন, তখন তাঁর ভাগ্যবান পুত্র বললেন, 'আব্বাজান ! আল্লাহ তায়ালার যা হুকুম হয়েছে তা বিনা দ্বিধায় পালন করুন। আমার এ মস্তক ধৈর্য ও সন্তুষ্টির সাথে অবনত হবে।'

পিতা পুত্রকে মাটিতে ফেলে তার গলায় ছুরি চালাবেন এমন সময় ঐশীবাণী হলো—'ইবরাহীম ব্যাস এখন হাত সংযত কর। তুমি তোমার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। আমি ইসমাঈলকে একটা বিরাট কোরবানীর বিনিময়ে ছাড়িয়ে নিলাম।

হযরত ইবরাহীম (আ) গোটা জীবন অগ্নি পরীক্ষারই জীবন ছিল। এই শেষ এবং সর্ববৃহৎ পরীক্ষায় যখন তিনি পূর্ণ সাফল্য লাভ করলেন তখন প্রতিদান পাবার পালা শুরু হলো। আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ এলো ঃ

اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ـ(البقرة : ١٢٤)

www.pathagar.com

"ইবরাহীম ! আমি তোমাকে গোটা বিশ্বের মানুষের নেতা বানিয়ে দিচ্ছি।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১২৪)

অতঃপর ইমাম বা নেতা বানাবার পদক্ষেপ এভাবে হলো যে, পূর্বে যেসব ঘোষণা এবং হেদায়েতের উল্লেখ করা হলো তার সাথে কা'বা নির্মাণের আদেশ হলো।

এ পশ্চাৎ পটভূমিকা অর্থাৎ পূর্ণ ঘটনার দু'টি বিষয় বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য ঃ

০ যবেহ করার ঘটনা মারওয়া প্রান্তরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যা মক্কার অতি নিকটবর্তী। এখান থেকে কা'বা শরীফ দেখা যায়।

০ স্বপ্নের পর পিতা-পুত্র আত্মসমর্পণ ও আত্মতুষ্টির প্রেরণাসহ অদৃশ্য ইংগিত অনুসরণের সংকল্প দেখালেন, যার ব্যাখ্যা আল্লাহ তায়ালা ইসলাম শব্দের দ্বারা করেন।

فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ - (الصفت : ١٠٣)

কা'বা নির্মাণ উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো ঃ

যখন কা'বার নির্মাণ কার্য শুরু হলো, সে সময়ে তার উদ্দেশ্য পূরণের ব্যাপারে তার মহান নির্মাতাগণ আল্লাহর দরবারে নিম্নোক্ত দোয়া করলেন ঃ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ط اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ص وَاَرِنَا مَنَا سِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ج اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝ (البقرة : ١٢٧-١٢٨)

"হে আমাদের খোদা ! আমাদের এ আমল কবুল কর। অবশ্য তুমি সবকিছু শুন ও জান। হে খোদা ! আমাদেরকে তোমার মুসলিম (সত্যিকার আনুগত্য) বানাও এবং আমাদের সন্তানদের মধ্য থেকেও এমন একদল পয়দা কর যারা তোমার মুসলিম হবে। এবং আমাদেরকে তোমার এবাদতের তরিকা বাতিয়ে দাও এবং আমাদের দোয়া কবুল কর। অবশ্যই তুমি তওবা কবুলকারী ও রহমকারী।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১২৭-১২৮)

এ দোয়া থেকে জানা যায় যে, যে উদ্দেশ্যের জন্যে কা'বা নির্মাণ করা হয়েছিল তা পূরণ এমন এক দলের দ্বারা হবে যা ঐ বুযর্গদের অর্থাৎ অন্য কথায় হযরত ইসমাঈলের (আ) সন্তানদের মধ্য থেকে হবে।

www.pathagar.com

এখানে একথাও প্রনিধনাযোগ্য যে, যে গুণে এ দলকে গুণান্বিত করার দোয়া করা হলো, তার জন্যে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সে শব্দ ছিল 'মুসলিম' যার অর্থ ইসলামের অনুসারী।

যখন খানায়ে কা'বা নির্মিত হলো, তখন এমন হলো না যে, হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত ইসমাঈলকে (আ) নিয়ে পরিবারের অন্যান্য লোকদের কাছে অথবা অন্য কোন বসতিপূর্ণ স্থানে চলে গেলেন। বরঞ্চ ঐ প্রস্তরময় প্রান্তরে এবং ঐ কা'বার পাশেই তাদের পূর্ণবাসনের ব্যবস্থা করলেন, যাতে করে যে আল্লাহর অনুগত দলের জন্যে দোয়া করলেন, তারা যখন জন্মগ্রহণ করবে তখন তারা যেন এই কা'বার পাশেই বসবাস করতে পারে। হযরত ইবরাহীম (আ) স্বয়ং দোয়া করেছিলেন ঃ

رَبَّنَا اِنِّىْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ (ابراهيم : ٣٧)

"হে খোদা ! আমি আমার সন্তানদের একটি শাখা প্রস্তরময় অনুর্বর ময়দানে তোমার পবিত্র গৃহের পার্শ্বে পুনর্বাসিত করলাম। এ জন্যে যে তারা যেন নামায কায়েম করতে পারে।"–(সূরা ইবরাহীম ঃ ৩৭)

"নামায কায়েম করতে পারে"—অথবা তোমার বন্দেগী করতে পারে দ্বীনের অনুসারী ও ধ্বজাবাহক হতে পারে।

কেননা একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, বাস্তব দিক দিয়ে নামাযই হচ্ছে দ্বীনের মস্তিষ্ক, আর নামায কায়েম করাই প্রকৃতপক্ষে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করা।

হযরত ইসমাঈলের (আ) সন্তানদের মধ্যে আল্লাহর এসব "অনুগত দল' বাস্তবিক পক্ষে কিভাবে অস্তিত্ব লাভ করবে অর্থাৎ কিভাবে আল্লাহ তায়ালার প্রকৃত আনুগত্যের পন্থা (ইসলাম) অবগত হবে, তার জন্যে হযরত ইবরাহীম (আ) দোয়া করলেন ঃ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ (البقرة : ١٢٩)

"হে খোদা ! তাদের ভেতরে তাদেরই মধ্য থেকে এমন একজন রসূলের আবির্ভাব কর, যিনি তাদেরকে তোমার আয়াতসমূহ পড়ে শুনাবেন, তোমার আহকাম শিক্ষা দেবেন, হিকমত বলে দেবেন এবং তাদের আত্মশুদ্ধি করবেন।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১২৯)

www.pathagar.com

একথা বলার দরকার নেই যে, হযরত ইবরাহীমের (আ) এ দু'টি দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার ফলশ্রুতি স্বরূপই ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এবং সাহাবায়ে কেরামের (রা) আবির্ভাব হয়েছিল। বস্তুতঃ এ পুণ্যবান দলটিই 'মুসলিম' এবং উম্মাতে মুসলিমা নামে অভিহিত হয়েছিল। এ জন্যে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর দোয়ার মধ্যে তাঁদেরকে এ নামেই ইয়াদ করেছিলেন। অন্য কথায় তিনিই তাঁদের এ নাম রেখেছিলেন। সূরায়ে হজ্জেও এর বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে।

কা'বা নির্মাণের ব্যাপারে এসব কথার দিকে লক্ষ্য করুন। কা'বা যে দ্বীনের কেন্দ্র এবং ইসলামের উৎস তা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

হজ্জের নিয়ম পদ্ধতি

এখন হজ্জের মধ্যে যেসব নিয়ম-পদ্ধতি পালন করা হয় তার দিকে লক্ষ্য করুন ঃ

যখন কেউ হজ্জের জন্যে রওয়ানা হয় তখন মক্কা থেকে বেশ দূরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে হজ্জের জন্যে যথারীতি নিয়ত করতে হয় যাকে 'এহরাম বাঁধা' বলে। এহরাম বাঁধার আগে সে গোসল অথবা অযু করে। অতপর সাধারণভাবে ব্যবহৃত পোশাকের পরিবর্তে শুধুমাত্র একটি তহবন্দ ও একটি চাদর পরিধান করে। তারপর দু' রাকাত নামায পড়ে। নামাযের পর হজ্জের যথারীতি নিয়তের ঘোষণা করতে গিয়ে খোদাকে সম্বোধন করে উচ্চৈস্বরে বলে ঃ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ ـ

"হাযীর আছি, খোদা, আমি হাযীর আছি। আমি হাযীর আছি। তোমার কোন শরীক নেই। আমি হাযীর আছি। নিশ্চিতরূপে সবপ্রশংসা তোমারই জন্যে। নিয়ামত একমাত্র তোমারই। বাদশাহী একমাত্র তোমারই এবং তোমার কোন শরীক নেই।"

'লাব্বায়কা, লাব্বায়কা' চীৎকার ধ্বনীর সাথে সাথে সে এহরামের রূপ গ্রহণ করে এবং এই চীৎকার ধ্বনী তার সার্বক্ষণিক জপ হয়ে পড়ে। প্রত্যেক নামাযের পর, উঁচুতে উঠবার সময় এবং নীচে নামবার সময়, প্রত্যেক কাফেলার সাথে সাক্ষাতের সময় এবং প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠার সময় এ কলেমাগুলো তার মুখে জারি থাকে।

www.pathagar.com

এহরাম বাঁধার পর তার সাজ-সজ্জা এবং আরাম আয়েশের প্রতিটি জিনিস নিষিদ্ধ হয়ে পড়ে। তার সাধারণ ব্যবহার্য পোশাক তো সে খুলেই ফেলেছে। যে দু'টি কাপড়—তহবন্দ ও চাদর এখন তার পরণে আছে তাও আবার সেলাই করা চলবে না। তা সুবাসিত রঙিন হওয়া চলবে না। তদনুরূপ সে টুপি পাগড়ি অথবা অন্য কিছু দ্বারা তার মাথা ঢাকতে পারবে না। চুল কাটতে পারবে না, নখ ফেলতে পারবে না, সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে না, গোসলের সময় সাবান প্রভৃতি লাগাতে পারবে না। যৌনক্রিয়ার নিকটবর্তীও হতে পারবে না এবং সে সম্পর্কে কোন আলাপ আলোচনাও করতে পারবে না। এভাবে তার কোন পশু-পক্ষী শিকার করার অনুমতিও থাকবে না এবং কাউকে শিকার করার জন্যে ইশারা ইংগিতও করতে পারবে না। এ অবস্থায় সে মক্কার দিকে অগ্রসর হতে থাকবে।

অতপর যেই মাত্র মক্কা তার নজরে পড়বে, ওমনি সে উচ্চৈস্বরে বলবে, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। মক্কায় প্রবেশ করার পর সোজাসুজি কা'বায় চলে যাবে। কা'বা ঘরে যে হিজরে আসওয়াদ (কৃষ্ণ প্রস্তর) স্থাপিত আছে তার উপর হাত রাখবে এবং তাকে চুম্বন করবে। চুম্বন করার পর কা'বা ঘরের তাওয়াফ করবে অর্থাৎ সাতবার তার চারপাশে চক্কর লাগাবে (প্রদক্ষিণ করবে)। তারপর মকামে ইবরাহীম অথবা কা'বার মধ্যে অন্য কোন স্থানে দু' রাকাত নামায পড়বে।

অতপর কা'বা থেকে বের হয়ে আসার পর সে নিকটবর্তী 'সাফা' নামক পাহাড়ে উঠবে। পাহাড়ে ওঠার পর কা'বার দিকে মুখ করে চিৎকার করে বলবে 'আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' তারপর নবীর উপর দুরূদ পড়বে এবং আল্লাহর দরবারে যা কিছু চাওয়ার তা প্রাণভরে চাইবে।

তারপর নীচে নেমে এসে সম্মুখে 'মারওয়া' নামক আর একটি পাহাড়ের দিকে দৌড়ে অথবা দ্রুতগতিতে চলবে। তার উপর উঠে আগের মতন তাকবীর ও তাহলীল করবে। দরূদ ও দোয়া ইত্যাদিতে মশগুল হবে যেমন 'সাফার' উপরে হয়েছিল। এভাবে সাতবার এ পাহাড়ে ও পাহাড়ে সে ছুটাছুটি করবে।

পাহাড় দু'টির কাজ সমাধা করার পর সে মক্কায় অবস্থান করতে থাকবে। তারপর তার সাধ্যমত কা'বা ঘরের 'তাওয়াফ' এবং এবাদত বন্দেগী করতে থাকবে।

জিলহজ্জ মাসের সাত তারিখে সব লোক কা'বার মসজিদে হাযীর হবে। ইমাম তাদের সামনে খুতবা দেবেন, যার মধ্যে তিনি হজ্জের হুকুম, নিয়ম-কানুন, তার বরকত হিকমতের কথা বুঝিয়ে দেবেন।

www.pathagar.com

আট তারিখে সূর্যোদয়ের পর সবাই মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত 'মিনা' নামক স্থানের দিকে রওয়ানা হবে। আগামী দিনের সকাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবে।

নয় তারিখ সকালে তারা মক্কা থেকে বারো মাইল দূরে অবস্থিত আরাফাত নামক ময়দানের দিকে রওয়ানা হবে। সমস্ত লোক এ ময়দানে একত্র হবে। সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার পর ইমাম এখানেও খুতবা এবং হেদায়েত দিবেন। তারপর যোহরের ওয়াক্তে এক সংগে যোহর ও আছরের নামায পড়িয়ে দেবেন। নামাযের পর যে যার মতো শিবির ঠিক করে নেবে। ইমামের শিবির 'জাবালুর রহমত' নামক পাহাড়ের নিকটে হয়। তিনি তাঁর উটনির উপর থেকে নীচে নামেন না। সমস্ত লোক তাঁর পেছনে কেবলামুখী হয়ে থাকবে। সকলে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কেঁদে দোয়া করতে থাকবে। মাঝে মাঝে 'লাব্বায়েকা, আল্লাহুম্মা লাব্বায়েকা' ধ্বনী করবে। ইমাম এখানেও তাদেরকে খুতবা শুনাবেন।

সূর্যাস্তের পর আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন শুরু হয়। এখান থেকে সকলকে মুযদালাফায় গিয়ে পৌছতে হবে। অতপর তারা নিজেদের থাকার স্থান ঠিক করে নেবে। ইমাম 'জবলে কাযাহ' নামক পাহাড়ের নিকটে অবস্থান করবেন। এশার সময় হলে মাগরেব এবং এশা একত্রে পড়া হবে এবং রাত এখানেই কাটাতে হবে।

দশ তারিখে একটু আধার থাকতে থাকতে নামায পড়া হয়। তারপর প্রত্যেকে দোয়া দরূদ, এস্তেগফার পড়তে থাকবে এবং মাঝে মাঝে 'লাব্বায়েকা প্রভৃতি বলবে। পূর্বাকাশে বেশ পরিষ্কার হয়ে যাবার পর ওখান থেকে সকলে মিনার দিকে রওয়ানা হবে। মিনায় পৌছার পর 'জমরাতুল ওকবায়' সাতবার পাথর ছুঁড়তে হবে। প্রত্যেকবার 'আল্লাহু আকবার' বলতে হবে। এরপর 'লাব্বায়েকা' ধ্বনী উচ্চারণ শেষ হয়ে যায়। পাথর নিক্ষেপের পর কোরবানী এবং তারপর মাথা কামিয়ে এহরাম খোলা হবে।

এরপর পুনরায় সাতবার কা'বার তাওয়াফ করতে হবে। অতপর মিনায় গিয়ে দু' তিন দিন অবস্থান করতে হয়। এ সময়ে আল্লাহর যিকর, দোয়া এস্তেগফার প্রভৃতিতে মশগুল থাকা হয় এবং প্রতিদিন তিনটি 'জামরাতে' সাতবার করে তকবীরসহ পাথর নিক্ষেপ করতে হয়। তারপর কা'বায় প্রত্যাবর্তন করে শেষবারের মতো তাওয়াফ করতে হয়। তাওয়াফের পর 'হিজরে আসওয়াদ' চুম্বন এবং 'হিজরে আসওয়াদ' ও কা'বার দরজার মধ্যবর্তী অংশ 'মুলতাযম' মুখ ও বুকের দ্বারা স্পর্শ করতে হয়। কা'বার গেলাফ ধরে কেঁদে কেঁদে দোয়া করা হয়। এ অবস্থায় নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করা হয়।

www.pathagar.com

বিদায়কালে আল্লাহর ঘরের প্রতি খোদা প্রেম নিবদ্ধ উদ্বেলিত ও অশ্রুসিক্ত দৃষ্টি আর যেন ফিরে আসতে চায় না।

এই হলো হজ্জের নিয়ম-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এ সবের অধিকাংশই তো সুস্পষ্ট। বুঝতে কোন কষ্ট হবার কথা নয়। কিন্তু এমনও কিছু আছে যার প্রত্যেককে একটা করে পশ্চাৎ পটভূমিকা আছে। এ পটভূমিকা জানতে পারলেই সে সবের মর্মও উপলব্ধি করা যায়। এ জন্যে কিছু প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কিছুটা বিশ্লেষণ হওয়া উচিত।

কা'বা ঃ কা'বা সম্পর্কে জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

সাফা ও মারওয়া ঃ

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ ـ(البقرة : ١٥٨)

"নিঃসন্দেহে সাফা এবং মারওয়া আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৫৮)

'আল্লাহ তায়ালার নিদর্শন' অর্থে আল্লাহর বন্দেগীর নিদর্শন। এখন কথা হলো এ দু'টি স্থান আল্লাহর বন্দেগীর নিদর্শন কিভাবে হলো ? এটা জানার জন্যে অতীত ইতিহাসের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করতে হবে। 'মারওয়া' হচ্ছে সেই স্থান যেখানে হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর একমাত্র পুত্র ইসমাঈলের (আ) মস্তক আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে কোরবানী করার জন্যে মাটিতে লুণ্ঠিত করেছিলেন। এ জন্যে এ স্থান দেখার সাথে সাথেই স্বাভাবিকভাবেই মুমেনের স্মৃতিপটে 'বন্দেগী' এবং 'ইসলামের' সেই ছবি মূর্ত হয়ে ওঠে, যা আল্লাহর খলিল (ইবরাহীম) এবং যবীহ (আল্লাহর জন্যে উৎসর্গীকৃত ইসমাঈল) তাঁদের আত্মত্যাগের দ্বারা অংকন করেছিলেন।

জামরাত ঃ মিনার মাঠে কিছু দূরে দূরে অবস্থিত তিনটি স্থান আছে। তার এক একটিকে জামরাহ বলে। তার সমষ্টিকে বহুবচনে বলা হয় জামরাত। এ ঐসব স্থান যেখান পর্যন্ত হাবশী খৃষ্টান শাসক আবরাহার সেনাবাহিনী কা'বা ঘর ধ্বংসের জন্যে অগ্রসর হয়েছিল। অতপর তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে করে দেয়া হয়েছিল বিধ্বস্ত ও নাস্তানাবুদ।

হজ্জ ও এবাদতের প্রেরণা

হজ্জের এসব রীতি পদ্ধতির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে তাদের এক একটিকে বন্দেগীর মূর্তপ্রতীক বলে মনে করা হবে ঃ

www.pathagar.com

☐ এহরামের পোশাক পোশাক নয়। বরঞ্চ একদিকে ফকীরির অনুভূতি এবং অন্যদিকে আত্মত্যাগের প্রেরণার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। একজন সহায় সম্বলহীন ভিখারী যখন কোন দাতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয় অথবা একজন নির্ভীক সৈনিক যখন তার উর্দি পরিধান করে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধের ময়দানের দিকে রওয়ানা হয়, তখন তার ঝোঁক প্রবণতা ও উদ্দেশ্য হৃদয়ংগম করার জন্যে কোন শব্দমালা ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। ঠিক তেমনি কা'বা ঘরের দিকে ধাবমান এ ব্যক্তির আকৃতি ও ধরন-ধারণ একথাই প্রকাশ করে যে, সে আল্লাহর দুয়ারে একজন ভিখারী। আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কিছুর মুখাপেক্ষী সে নয়। দুনিয়ার প্রতিটি বন্ধন সে ছিন্ন করেছে। আল্লাহরই চিন্তা ও ধ্যানে সে মগ্ন। তাঁরই ইংগিতে নিজকে বিলীন করে দেয়ার উদগ্র বাসনায় আত্মহারা। সে আল্লাহর দরবারে ভিখারীও এবং জীবন দিতে উদ্যত সৈনিকও।

এতদ্ব্যতীতও এহরামের এ পোশাক আর এক বিরাট গূঢ় তত্ত্ব ঘোষণা করে। দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির লোক যখন তাদের আপন দেশীয় পোশাক খুলে ফেলে একই ধরনের পোশাক পরিধান করে এবং 'আমি হাযীর আছি, হে খোদা, আমি হাযীর আছি' এ ধ্বনী যখন তাদের প্রত্যেকের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়, তখন ইসলামী জাতীয়তা এক মূর্ত রূপ ধারণ করে। একজন অন্ধও বুঝতে পারে যে, ইসলামের সম্পর্ক যাবতীয় বৈষয়িক সম্পর্ক থেকে কত বেশী মজবুত। উপরন্তু একমাত্র ইসলামের সম্পর্কই সমগ্র মানব জাতিকে পরস্পর গভীর নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ করতে পারে।

☐ যখন উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম চারিদিকের আকাশ বাতাস 'লাব্বায়েকা' ধ্বনীতে মুখরিত হয় তখন মনে হয় কা'বা ঘর নির্মাতা তাঁর প্রভুর নির্দেশে যে আহ্বান মানব সমাজকে জানিয়ে ছিলেন, এসব ধ্বনী প্রতিধ্বনী যেন তাঁর সে আহ্ববানেরই প্রত্যুত্তর। হযরত ইবরাহীমের (আ) এ আহ্বান কিছু বাহ্যিক অনুষ্ঠান পালনের আহ্বান নিশ্চয়ই ছিল না। বরঞ্চ ঈমানের ঐকান্তিক এবং ইসলামের মর্মকথার সাথে নিজকে ঢেলে গড়ে তোলার আহ্বান ছিল। এ জন্যে আহ্বানের জবাবে 'লাব্বায়েকা' ধ্বনী নিছক কিছু শব্দ তরংগ শূন্যে ভেসে দেয়ার নাম নয়, বরঞ্চ আপন প্রভুর কাছে নিজকে সমর্পণ করার এক অধীর অপ্রতিহত বাসনার বহিঃপ্রকাশ। এটা একথারই ঘোষণা যে, গোলাম তার মনিবের আদেশ মাথায় নিয়ে তাঁর দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

☐ যখনই তার কা'বার উপরে নজর পড়ে, তখন এই কা'বার নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় তার মনের পটে ভেসে ওঠে। সে তখন মনে করে যে সে ঐ উম্মতেরই একজন যার আবির্ভাবের জন্যে হযরত ইবরাহীম দোয়া

www.pathagar.com

করেছিলেন। যার নাম তিনি রেখেছিলেন 'উম্মতে মুসলেমা'। যার এরূপ মর্যাদা স্থিরকৃত হয়েছিল যে, তারা আল্লাহ এবং দ্বীনে তওহীদের জন্যে উৎসর্গীকৃত হবে।

☐ হিজরে আসওয়াদের উপরে যখন সে তার দু'টি হাত রাখে তখন মনের উপরে এই তত্ত্ব প্রতিফলিত হয় যে, সে যেন আল্লাহর হাতের উপর তার হাত রাখছে। বন্দেগী এবং গোলামীর শপথ নতুন করে গ্রহণ করছে। ঘোষণা করছে যে, এ শপথ সে কখনো ভুলে যাবে না। অতপর যখন তাকে চুম্বন করা হয়, তখন আর এক নতুন অনুভূতি তার মধ্যে জাগ্রত হয়। মনে এ ধারণাই বলবৎ হয় যে, যে সত্তার বন্দেগীর এ শপথ সে গ্রহণ করছে, তিনি তার সত্যিকার শাসক ও মনিব এবং সত্যিকার ভালবাসার পাত্র ও বাঞ্ছিত জন। অতএব তাঁর দরবারে হাযীরি দেবার সময় সে প্রয়োজন বোধ করছে তাঁর আস্তানায় প্রেম ও ভক্তি ভরে চুম্বন করার।

☐ তাওয়াফ কিসের জন্যে ? এর হচ্ছে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতিরে নিজকে কোরবান করে দেয়ার একটা অদম্য প্রেরণা। যখন মর্দে মুমেন কা'বার চারদিক ঘুরতে থাকে, তখন দীপশিখা ও পতংগ নিয়ে কবির কল্পনা যেন মূর্ত হয়ে ওঠে। এমন মনে হয় যে, বান্দাহ তার প্রভুর দরবারে হাযীর হয়ে ত্যাগ, কোরবানী, প্রাণ উৎসর্গ করণের এবং তাঁর আদেশ পালনের জন্যে নিজকে অকাতরে বিলিয়ে দেয়ার এক মূর্ত বহিঃপ্রকাশ। নিজের অস্তিত্বের কোন খবর তখন তার থাকে না। সে তার প্রভুর ইংগিতে জীবন উৎসর্গ করার জন্যে উন্মুখ। নিজের সবকিছু বিসর্জন দিয়ে সে পেতে চায় তার প্রভুকে নিবিড়ভাবে।

তাওয়াফের আরও কিছু মর্ম আছে। সাদা কালো, আরব-অনারব, আর্য-অনার্য— মোটকথা প্রত্যেক বর্ণ, বংশ, ভাষা এবং জাতীয়তার লক্ষ লক্ষ লোকের এ সমাবেশ যখন একই পোশাকে এবং একই প্রেরণা নিয়ে কা'বার চারদিক প্রদক্ষিণ করতে থাকে তখন এ দৃশ্য একথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আল্লাহ যেমন এক এবং আল্লাহর দ্বীন যেমন এক, সকলের লক্ষ্যবস্তুও এক। সকলে একই কেন্দ্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সকলেরই আনুগত্য ও আত্মোৎসর্গ একই সত্যবান সত্তার জন্যে নিবেদিত।

☐ সাফা ও মারওয়ার মধ্যে ক্ষিপ্রতা সহকারে যাতায়াত এই সংকল্পেরই বহিঃপ্রকাশ মনে হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈলের (আ) পথই আমাদের পথ এবং সে পথে আমাদের চলার গতিকে আমরা কিছুতেই মন্দীভূত করব না। তাঁরা এ যমিনে নিজের আমলের দ্বারা ইসলামের যে বাস্তব ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, আমাদের কাছেও ইসলাম তার চেয়ে কম কোন

www.pathagar.com

বস্তুর নাম নয়। 'মারওয়ার' শাহাদতগাহে পুনঃ পুনঃ দৌড় দিয়ে হাযীর হওয়া একথাই হৃদয়ে গেঁথে নেয়া যে, আমাদের জীবন পথের শেষ গন্তব্যস্থল হবে এমনি এক শাহাদাতগাহ।

❐ সাতই জিলহজ্জ থেকে আরম্ভ করে দশই পর্যন্ত সমস্ত হাজীদের একই ইমামের নেতৃত্বে এই জামায়াত বন্দী হয়ে চলা ফেরা ও অবস্থান, যেমন আজ সকালে মসজিদে হারামে সমবেত আছে তো কাল মিনার মাঠে, পরের দিন আরাফাতে শিবির স্থাপন, মুযদালফায় রাত্রি যাপন, কখনো ইমামের খুতবা শ্রবণ, আবার কখনো সকলে সমস্বরে 'লাব্বায়েকা' ধ্বনী উচ্চারণ—এসব কিছুই একত্রে মিলে সুস্পষ্টরূপে একটা সুশৃংখল সৈনিক জীবনের চিত্রই পরিস্ফুট করে। লক্ষ লক্ষ মানুষের এই এহরাম বাঁধা দলটি কাফনধারী একটি দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনীর মতোই মনে হয়। এ অবস্থা একথাই ঘোষণা করে যে, 'উম্মতে মুসলেমার' ধারণার সাথে সুশৃংখল সামাজিকতা ও সৈনিক জীবনের ধারণা ওতপ্রোত জড়িত। আর তাদের সকল কর্মতৎপরতা আল্লাহর বন্দেগী এবং তাঁর দ্বীনের সাহায্য ও প্রতিষ্ঠার জন্যে নিয়োজিত।

❐ জামরাতের স্তম্ভগুলোর উপরে প্রস্তর নিক্ষেপ করার কাজ সেই অবিরল প্রস্তর বর্ষণের কথাই মনে করে দেয় যার দ্বারা আবরাহার সৈন্যবাহিনী তসনস ও বিধ্বস্ত হয়েছিল। এসব স্থানে প্রস্তর নিক্ষেপ করা এবং তার সাথে আল্লাহু আকবার ধ্বনী করে আল্লাহর মহত্ব ও বিরাটত্ব ঘোষণা করা যেন নিজের সংকল্প ও সিদ্ধান্ত দ্বারা দুনিয়াকে সতর্ক করে দেয়া যে, যদি কেউ আল্লাহর দ্বীনের প্রতি বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তবে তার চক্ষু উৎপাটিত করা হবে এবং দ্বীনের ভিত্তি ধূলিস্মাত করতে চাইলে তাকে নিষ্পেষিত করে দেয়া হবে।

○ কোরবানী হচ্ছে ঐ 'যবেহ আযীম' যাকে আল্লাহ তায়ালা হযরত ইসমাঈলের (আ) বিনিময় (ফিদয়া) বলে উল্লেখ করেছেন।

وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ (الصفت : ١٠٧)

অতএব আল্লাহর পথে পশু কোরবানী করা প্রকৃতপক্ষে নিজকে কোরবানী করার স্থলাভিষিক্ত। এটা একথারই এক নীরব ঘোষণা যে আমাদের প্রাণ আল্লাহরই পথে উৎসর্গীকৃত হয়েছে এবং তিনি যখনই তা তলব করবেন তখনই দ্বিধাহীন চিত্তে পেশ করা হবে। এ পশুর রক্ত প্রবাহিত করা একথারই নিদর্শন ও আবেদন আকুতি যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে যখনই এ খুন দাবী করা হবে, আমরা সে খুন দিতে প্রস্তুত থাকব এবং আছি। নতুবা নিছক পশু যবেহ করা দ্বীনও নয়, তাকওয়াও নয়।

www.pathagar.com

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَائُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ـ(الحج : ٣٧)

"এবং তার গোশত এবং খুন কখনোই খোদার কাছে পৌঁছে না, বরঞ্চ তোমাদের তাকওয়াই তাঁর কাছে পৌঁছে।"–(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৩৭)

হজ্জ অনুষ্ঠানের সমুদয় তত্ত্বাবলীর প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। তাহলে দেখতে পাবেন, বন্দেগীর এমন কোন প্রেরণা ও ঝোঁক প্রবণতা নেই যা এ সবের মধ্যে তার তরংগমালা উদ্বেলিত করে না। বিশেষ করে জিহাদের প্রেরণা, যা বন্দেগীর শীর্ষস্থানে মানুষকে পৌঁছিয়ে দেয়, হজ্জের এসব কাজ-কর্মের মধ্যে এমনভাবে সংশ্লিষ্ট করে রাখা হয়েছে, যেন এই গোটা হজ্জ জিহাদেরই একটা বিরাট মহড়া বলে মনে হয়, মানসিক দিক দিয়েই বলুন, আর ব্যবহারিক দিক দিয়ে। এ জন্যেই একবার যখন হযরত আয়েশা (রা) নবীকে (সা) জিজ্ঞেস করলেন, 'জিহাদকে আমরা সর্বোৎকৃষ্ট আমল মনে করি। এ জন্যে আমরা নারী জাতিও এ ফরয কাজ কেন আদায় করি না ?"

لَكُنَّ اَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ ـ

"তোমাদের নারীদের সর্বোৎকৃষ্ট জিহাদ হলো হজ্জ যা ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত হয়।"–(বুখারী)

হজ্জের সার্বিক মর্যাদা

এসব ছাড়াও হজ্জের অনুষ্ঠানাদির প্রতি যদি আর একদিক দিয়ে লক্ষ্য করা যায় তাহলে অনুভব করা যাবে যে, এ হজ্জ যদিও বলতে গেলে একটা এবাদত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে প্রত্যেক এবাদত ও নেক আমলের প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

০ এ নামাযও বটে। কেননা নামাযের মর্মকথা হলো আল্লাহর যিকর। আর দেখা গেল হজ্জ যিকরে এলাহীর দ্বারা পরিপূর্ণ।

০ একে যাকাতও বলা যেতে পারে। কারণ প্রত্যেক হাজীর উপর আদেশ হচ্ছে যে সে যেন কোরবানীর গোশত গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে।

وَاَطْعِمُوْا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ (الحج : ٢٨)

"(এ কোরবানীর গোশত) বিপন্ন দুঃস্থদেরকেও খেতে দাও।"

–(সূরা আল হাজ্জ ঃ ২৮)

তাছাড়া একথা তো একেবারে সুস্পষ্ট যে, নিছক আল্লাহর জন্যে ধন ব্যয় করা ব্যতীত হজ্জ হতেই পারে না এবং যাকাতের মর্মকথাও এই যে, আল্লাহর জন্যেই নিজের ধন ব্যয় করতে হবে।

www.pathagar.com

০ একে রোযাও বলা যেতে পারে। এর কারণ এই যে, রোযার মধ্যে যৌন সম্মিলন শুধু দিনেব বেলা নিষিদ্ধ। কিন্তু হজ্জের সময়ে রাতেও তা সমানভাবে নিষিদ্ধ। এখন রইল খানা-পিনার কথা। রোযার মতো যদিও হজ্জে খানা-পিনা হারাম করা হয়নি, কিন্তু তৎপরিবর্তে সাজ-সজ্জা প্রভৃতি এবং অন্যান্য যে সমস্ত বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে, তা অনেকাংশে এর স্থলাভিষিক্তের কাজ করে। রোযার মধ্যে নফসের যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় হজ্জের মধ্যেও তেমনি করা হয়।

০ এ তওহীদের শিক্ষাদাতা। কেননা কা'বা নির্মাণই হয়েছিল তওহীদের উপরে। তাকে দেখার সাথে সাথে মুমেনের হৃদয়ে তওহীদের প্রেরণা জেগে ওঠে। তাছাড়া 'লাব্বায়েকা' ধ্বনীর মুহুর্মুহুঃ গুঞ্জরণ, হিজ্জরে আসওয়াদের চুম্বন, তওয়াফ, সায়ী অর্থাৎ সাফা মারওয়া ছুটাছুটি, কোরবানী—মোটকথা হজ্জের এমন আরও বহু আমল আছে যা মানুষকে তওহীদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে।

০ এ আখেরাতের স্মরণ করিয়ে দেয়। কেননা জামরাত স্তম্ভগুলো আবরাহার পরিণাম স্মরণ করিয়ে দেয়। আর এ হচ্ছে মরণের পরে প্রতিদান সম্পর্কিত আইনের (Law of Retribution) এক জ্বলন্ত সাক্ষ্য।

০ এ ঈমানের গুণাবলীর, খোদা প্রেমের, ধৈর্য, খোদার বিধানের প্রতি রাযী থাকার, ফকীরি ও তাওয়াক্কলের, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির, পারস্পরিক সহানুভূতির এবং মানবিক সাম্যের এক নজীরবিহীন শিক্ষা দান করে।

হজ্জ সম্পর্কে জরুরী বিবরণ জানতে পারা গেল। এসব জানার পর কে একথা বলতে পারে যে, যে ব্যক্তি এ এবাদত থেকে বেপরোয়া হয়ে থাকবে, তার মধ্যেও দ্বীনের প্রাণশক্তি বিদ্যমান থাকবে ? অতএব সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যদি কোন মুসলমান দ্বীন ও ঈমানের এই কেন্দ্রটির দিকে আকৃষ্ট না হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে তার ইসলাম হবে স্তম্ভহীন। ঠিক এমনিভাবে একথাও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যে ব্যক্তি তার সাধ্যানুযায়ী এ এবাদতের যথারীতি হক পালন করলো, সে তার দ্বীনকে মযবুত ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করলো।

ইসলামী রুকনসমূহের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টি

এসব হচ্ছে ইসলামের বুনিয়াদী আমলসমূহ, তার মর্মকথা, উদ্দেশ্য ও হিকমত যে ব্যক্তি এসবের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করবে, সে নিশ্চয়ই অনুভব করবে যে, এ আমলসমূহ কিছু নেকী এবং এবাদতই নয়, বরঞ্চ নেকী ও এবাদতের উৎস। এর মধ্যে প্রত্যেকটি আমল মানুষের মধ্যে বন্দেগীর অনুভূতি জাগ্রত করার এবং তা পূর্ণ করার বড়োই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্য

www.pathagar.com

আমল এর সমপর্যায়ের হতে পারে না। আর এসব একত্রে মিলে মুমেনকে এমন এক মানসিকতা দান করে যা ইসলাম সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে সঠিক জ্ঞান লাভ করে। এমন একটা মন দান করে যে সর্বদা দ্বীনের হুকুমের উপর কান লাগিয়ে থাকে। এমন এক আত্মা দান করে যা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় নিমগ্ন থাকে। এভাবে সে আল্লাহর আনুগত্যের জন্যে এমন যোগ্যতা লাভ করে যে, তাঁর পক্ষ থেকে যে হুকুমই আসে, তা পালনের জন্যে সে তৎপর হয়ে ওঠে। তার দিলের যমীন চাষ, সার ও পানির সাহায্যে এমনভাবে তৈরী হয় যে, দ্বীনি হেদায়াতের যে কোন বীজই সেখানে বপন করা হয়, তাকে সে তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করে এবং তার উৎপাদন ও বর্ধনের জন্যে তার আপন কাজ শুরু করে দেয়। এ কারণেই সেগুলোকে ইসলামের স্তম্ভ বলা হয়েছে। অর্থাৎ দ্বীনের অবশিষ্ট অংশ-গুলোর জন্যে জীবনীশক্তিদাতা বলা হয়েছে। সন্দেহাতীতরূপে এ এক চমৎকার ব্যাখ্যা যা নবী (সা) এসব আমলের জন্যে নির্ধারিত করেছিলেন।

---

www.pathagar.com

ইসলামী জীবন বিধান

পূর্বে বর্ণিত ইসলামের বিশ্বাসমূলক এবং ব্যবহারিক বুনিয়াদসমূহ উপলব্ধি করার পর এখন এই দ্বীনের পরিপূর্ণ স্বরূপকে বুঝার চেষ্টা করা যাক। যেমন কোন বৃক্ষে তার বীজ অনুযায়ী পাতা ও ফুল-ফল হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি, কোন দ্বীনের মৌলিক ধারণার উপরে ভিত্তি করেই তার শিক্ষা-দীক্ষা চলে। অন্য কথায় কোন দ্বীনের শিক্ষাদীক্ষা তার মৌলিক ধারণারই বহিঃপ্রকাশ। ইসলামী শিক্ষার পূর্ণ কাঠামো কি, তা জানার জন্যে প্রথমতঃ জানতে হবে ইসলামের দ্বীন সম্পর্কিত ধারণা কি ?

দ্বীন সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা-মতবাদ

বর্তমান কালে দুনিয়ায় দ্বীন সম্পর্কে তিন প্রকার ধারণা বিদ্যমান আছে ঃ

এক হচ্ছে এই যে, এ পৃথিবী মানুষের জন্যে প্রকৃতঃই একটি বন্দীশালা। তার শরীর তার আত্মার জন্যে একটা খাঁচার ন্যায়। তার মধ্যে যেসব বস্তুসুলভ কামনা-বাসনা পাওয়া যায়, সেসব এ খাঁচারই বন্দী পাখী।

মানুষ মুক্তিলাভ তখনই করতে পারে যখন সে এ বন্দীশালার প্রাচীর নিজ হাতে ভেঙে ফেলবে এবং তার আত্মাকে মুক্ত করবে। অর্থাৎ তাকে দুনিয়া পরিহার করতে হবে, লোকালয় থেকে দূরে সরে যেতে হবে এবং কোন নিভৃত স্থানে গিয়ে খোদার সংগে সংযোগ সম্পর্ক রেখে বসে যেতে হবে। আপন কামনা-বাসনা দলিত মথিত করে তা শেষ করে দেবে। শুধুমাত্র এ অবস্থাতেই তার আত্মার উপর থেকে সে আবরণ উন্মোচন হতে পারে যা খোদার জ্যোতি দর্শনে এবং তাঁর সত্তা পর্যন্ত পৌঁছতে তাকে বিরত রাখে। এ জন্যে মানুষের উচিত সাধনার দ্বারা এ মায়াজাল ছিন্ন করে মুক্ত হওয়া।

দ্বীন এবং খোদা পুরস্তির এ এক দৃষ্টিভংগী যাকে বলা হয় 'রাহবানিয়াত' বা বৈরাগ্যবাদ।

দ্বিতীয় ধারণা এই যে, দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে হত্যা করার প্রয়োজন নেই। বরঞ্চ দুনিয়ার মধ্যে থেকেই ন্যায়সংগত সীমারেখার ভেতরে নিজের কামনা-বাসনা পূরণ করে খোদার এবাদত করা উচিত। অবশিষ্ট জীবনে সে স্বাধীন। কারণ এবাদত ব্যক্তির কাজ। সমাজের নয়। এ জন্যে দ্বীন মানুষ এবং খোদার মধ্যে একটা ব্যক্তিগত (Private) ব্যাপার। তা দুনিয়ার সাধারণ সমস্যাবলী ও কায়কারবারের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না, রাখা উচিতও নয়। এসব পার্থিব ও সামাজিক ব্যাপার মানুষের এ

www.pathagar.com

এখতিয়ার আছে যে, সে খুশীমতো যে কোন পথ বেছে নেবে। জীবনের জন্যে যে বিধান খুশী, তা মেনে নেবে। খোদা এবং মাযহাবের তাতে কোন মাথা ব্যথা নেই।

তৃতীয় ধারণা এই যে, দুনিয়া পরিত্যাগ করা এবং প্রবৃত্তিকে হত্যা করাও ভুল এবং বন্দেগীকে শুধু ব্যক্তির কাজ ও দ্বীনকে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপার মনে করাও ভুল। সত্য কথা এই যে, মসজিদ হোক অথবা বসবাসের ঘর হোক, ক্ষেত খামার হোক অথবা হাটবাজার হোক, আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্র হোক অথবা রাজনৈতিক ক্ষেত্র—এ সমস্ত ক্ষেত্রেই দ্বীনের অবশ্য পালনীয় বিষয়সমূহ (ফারায়েয) এবং দাসত্ব আনুগত্যের দায়িত্ব মানুষকে পালন করতেই হবে। এর কোন একটি ক্ষেত্র থেকে যেমন মানুষ পলায়ন করতে পারে না, তেমনি খেয়াল-খুশী মতোও কিছু করতে পারে না। এভাবে তাকে যত প্রকারের শক্তি সামর্থ দেয়া হয়েছে, তা সবই ঐ বন্দেগীর কাজের জন্যেই দেয়া হয়েছে। সে জন্যে এসব শক্তির কোন একটিকেও না খর্ব করা যায়, আর না স্বাধীন ছেড়ে দেয়া যায়। সঠিক দ্বীনদারি এবং খোদা পুরস্তি হচ্ছে এই যে, মানুষ তার সমগ্র জীবন ব্যক্তিগত থেকে শুরু করে সামাজিক পর্যন্ত আল্লাহর আদেশের অধীনে যাপন করবে। সে মসজিদে যদি তাঁর এবাদত করে তো মসজিদের বাইরেও তাকে সেসব কিছুই করতে হবে। যা তিনি করতে আদেশ করেছেন। এভাবে তার পার্থিব জীবনের বিধান পুরোপুরিভাবে তাই হবে যা তার প্রভু পছন্দ করেন।

ইসলামে রাহবানিয়াত নেই

দ্বীন সম্পর্কে এ তিনটি ধারণার মধ্যে প্রথমটি যেমন, ইসলাম তেমনি ধরনের কোন দ্বীন নিশ্চয়ই নয়। এর এক একটি কথার দ্বারা প্রথমোক্ত ধারণার খণ্ডন করা হয় এবং এসব খণ্ডনের ব্যাপারে তার সব আকীদাহ বিশ্বাসমূলক এবং ব্যবহারিক বুনিয়াদসমূহ রয়েছে যার পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে পুরোপুরি-ভাবে জেনে নিয়েছি। বস্তুতঃ এ বিষয় পরিষ্কার হয়েছে যে ঃ

ইসলামে আল্লাহর সম্পর্কে ধারণা শুধু একটা বাঞ্ছিত সত্তার ধারণাই নয়। বরঞ্চ তার সাথে সাথে তিনি মানুষের শাসক এবং সত্যিকার আইন রচনাকারীও বটে। সংসার ত্যাগ, প্রবৃত্তি হত্যা এবং ধ্যান ও যোগ সাধনার দ্বারা খোদাকে পাওয়ার দৃষ্টিভংগী সঠিক হতে পারে যদি তিনি মানুষের শুধুমাত্র কাম্য হন এবং তা ছাড়া আর কিছু না হন। বরঞ্চ তিনি একাধারে শাসক ও আইন রচনাকারী। অতএব মানুষের জন্যে তাঁর কিছু আদেশ নিষেধ ও আইন-কানুন আছে যা মেনে চলা তার উচিত। এ জন্যে মানুষের কাজ শুধু এ নয় যে, সে শুধু আল্লাহর চিন্তা ও ধ্যানে মশগুল থাকবে। বরঞ্চ তার কাজ এই যে, সে সংসার ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

প্রবেশ করবে এবং তার প্রভুর নির্দেশাবলী পালন করে একজন অনুগত প্রজা হওয়ার প্রমাণ দেবে।

যে কয়টি স্তম্ভের উপরে ইসলামের প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে, তার মধ্যে অধিকাংশ নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ। এসব সঠিকভাবে আদায় করার জন্যে কোন না কোন প্রকারের সমাজবদ্ধতার প্রয়োজন।

বলা বাহুল্য যে, একাকী নিভৃতস্থানে বাস করলে সমাজবদ্ধতার কোন সুযোগ থাকে না। চিন্তা করুন যে, যেখানে ইসলামের ব্যবহারিক বুনিয়াদগুলো সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয় না, সেখানে গোটা ইসলামের প্রাসাদ কিভাবে নির্মিত হতে পারে?

ইসলামের এ স্তম্ভ আসলে এবাদত হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনের বহু সামাজিক মূল্যবোধ ও মিল্লাতের বহু তাৎপর্য এর মধ্যে লুক্কায়িত আছে। এই কারণে সেসব পৃথকভাবে আদায় করার জন্যে তাগিদ করা হয়েছে। এর মর্ম তো একদিকে এই যে, ইসলামের এসব ব্যবহারিক বুনিয়াদসমূহের দ্বারা দ্বীন ও খোদাভীরুতার যে মেজায প্রকৃতি প্রকাশ পায়, তা নিভৃত বাস ও প্রবৃত্তি হত্যার রীতিপদ্ধতির সাথে কিছুতেই খাপ খায় না।

দ্বিতীয়ত জীবনের সামাজিক পরিবেশ থেকে পলায়ন করে নিজে নিজে এ নামায রোযা যদি করাও হয়, তাহলে এসব এবাদতের দ্বারা শরীয়ত যেসব উপকারিতা ও তাৎপর্য লাভ করতে চায়, তা কিছুতেই লাভ করা যেতে পারে না। এ অবস্থায় এ বিশেষ এবাদতগুলোর দিক দিয়েও যাকে সত্যিকারভাবে খোদা পুরস্তি বলা হয়, তার সঠিক হক আদায় করা যেতে পারে না।

এ পাঁচটি বস্তুকে (নামায, রোযা ইত্যাদি) ইসলামের স্তম্ভ বলা হয়েছে। গোটা ইসলাম বলা হয়নি। তার পরিষ্কার অর্থ এই যে, ইসলাম শুধুমাত্র এ পাঁচটি বস্তুরই নাম নয়। বরঞ্চ তা ছাড়া আরও কিছু আছে যা তার মধ্যে অবশ্যম্ভাবীরূপে সন্নিবেশিত। স্তম্ভের অসাধারণ গুরুত্ব ও বিশিষ্ট স্থান অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু তাই বলে শুধু স্তম্ভ অথবা দেয়ালকে কখনো অট্টালিকা বলা হয় না। আজ পর্যন্ত স্তম্ভের কোন সমষ্টিকে প্রাসাদ বলা হয়নি। কোন নির্মাণ কার্যকে তখনই প্রাসাদ মনে করা যেতে পারে, যখন তার স্তম্ভ অথবা দেয়ালের উপর ছাদ নির্মাণ করা হয়। অর্থাৎ দেয়াল এবং ছাদের সমন্বয়ে একটি ঘর বা প্রাসাদ হয়। এ কারণে ইসলামেরও কোন ছাদের প্রয়োজন যার স্তম্ভ এ পাঁচটি স্তম্ভ হতে পারে। তাহলেই এসব মিলে ইসলামের প্রাসাদের রূপ ধারণ করতে পারে। একথা সুস্পষ্ট যে, ইসলামের এই ছাদ ঐসব শিক্ষাদীক্ষাই হবে যা এ পাঁচটি বস্তু থেকে আলাদা। প্রত্যেকেই জানে যে, এসব শিক্ষায় এমন

www.pathagar.com

অসংখ্য বিষয় আছে যার সম্পর্ক দুনিয়ার এই কর্মব্যস্ত জীবনের সাথে। নিভৃত স্থানে একাকী সেসব মেনে চলা তেমনই অসম্ভব যেমন ডাঙায় সাঁতার কাটা অসম্ভব। এ জন্যে যদি একথা স্বীকারও করে নেয়া হয় যে, ইসলামের বুনিয়াদী আমলগুলো নিভৃত সাধনায় হতে পারে, তবুও এর দ্বারা ইসলামকে পুরোপুরি মেনে চলা হলো একথা বলা যায় না। কেননা এ চার পাঁচটি বস্তুর হক আদায় করা এক কথা আর পূর্ণ ইসলামের হক আদায় করা অন্য কথা। যদি এই পাঁচটি বস্তু ব্যতীত ইসলাম আর কিছু না হয়, তাহলে এ পাঁচটির হুকুম পালন করাকে গোটা ইসলামের হুকুম পালন করা বলা যেতো। কিন্তু একথা জানা গেছে যে, এমন মনে করার কোন অবকাশ নেই। ইসলামের আকিদামূলক এবং ব্যবহারিক বুনিয়াদসমূহের মধ্যে যেসব তত্ত্ব লুকায়িত আছে, তা একথাই ঘোষণা করে যে, বৈরাগ্যবাদের সাথে ইসলামের এবং ইসলামের সাথে বৈরাগ্যবাদের কোনই সম্পর্ক নেই।

এখন একথার প্রমাণ স্বরূপ কিছু মূল্যবান বাণীর উল্লেখ করা হচ্ছে। নবী করীম (সা) বলেন ঃ

لَارَهْبَانِيَّةَ فِى الْاِسْلَامِ -

"ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান নেই।"–(নায়লুল আওতার)।

হযরত ওসমান বিন মযউন যখন খাশী হওয়ার অনুমতি চাইলেন তখন নবী তা অস্বীকার করে বললেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اَبْدَلَنَا بِالرَّهْبَانِيَّةِ الْحَنِفِيَّةَ السَّمْحَةَ -

"আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বৈরাগ্যবাদের পরিবর্তে ইবরাহীমের (আ) সহজ এবং খাঁটি দ্বীন দিয়েছেন।"–(তিবরানী)

ঈসায়ীগণ (খৃষ্টানগণ) বৈরাগ্যবাদকে 'দ্বীন' এবং খোদা পুরস্তির চরম হিসাবে গ্রহণ করলে তার প্রতিবাদে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَرَهْبَانِيَّةَ نِ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ -

"তারা বৈরাগ্যবাদের মনগড়া পথ অবলম্বন করেছে। তাদেরকে আমি এর হুকুম দেইনি।"–(সূরা আল হাদীদ ঃ ২৭)

জানা গেল যে শুধুমাত্র ইসলামেই নয়, বরঞ্চ খোদা প্রেরিত কোন শরীয়তেই বৈরাগ্যবাদের শিক্ষা দেয়া হয়নি। যারা খোদা পুরস্তির জন্যে এ পন্থা অবলম্বন করেছে, তারা সম্পূর্ণরূপে নিজের কল্পনা থেকেই এ পথ আবিষ্কার করেছে। অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনের মেজায প্রকৃতি কখনো বৈরাগ্যবাদ দর্শনের অনুরূপ ছিল না।

www.pathagar.com

দ্বীনের মেজায প্রকৃতি যেমন বৈরাগ্যবাদ সহ্য করতে পারে না এবং তার বুনিয়াদী আকায়েদ ও আমলসমূহ যেমন বৈরাগ্যবাদের বিরোধিতায় সোচ্চার, তেমনি তার বিশদ শিক্ষা-দীক্ষার বেলায়ও তাই। বস্তুত নবী (সা) বৈরাগ্যবাদের প্রত্যেকটি কর্মপদ্ধতি নিষিদ্ধ করেছেন। যেমন বিবাহ থেকে দূরে থাকা, সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা নষ্ট করা, সর্বদা অবিরাম রোযা রাখা, রোযার সময় রাতেও কিছু না খাওয়া, কথা বলার শক্তি রহিত করা, এমনভাবে রাত্রি জাগরন করা যার দ্বারা দেহকে বিশ্রাম থেকে বঞ্চিত করা হয় ও পরিবার পরিজনের হক আদায় না করা ইত্যাদি।

ইসলাম শুধু ব্যক্তি জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়

উপরের ধর্মীয় মতবাদের দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ইসলামের সাথে সামঞ্জশীল নয়। ইসলাম এমন কোন দ্বীন নয় যা শুধু খোদা এবং বান্দার মধ্যেকার একটা ব্যক্তিগত (Private) সম্পর্ক মাত্র। যদি তাই হতো তাহলে তার শিক্ষা দীক্ষাও ব্যক্তি জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকতো। সে শুধু মসজিদের কথা বলতো। নামায রোযার হুকুম করতো কিছুটা নৈতিকতার উপদেশ দিত। কিছু সামাজিক নীতিকথা বলতো এবং তারপর চুপ করে থাকতো। কিন্তু কোরআন ও সুন্নাতের প্রতিটি পৃষ্ঠা সাক্ষ্য দেয় যে ব্যাপার তা নয়। ইসলামের নির্দেশাবলী মসজিদ-সমূহ এবং জীবনের ব্যক্তিগত সীমা চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরঞ্চ তা হাট বাজার, ব্যবসা বাণিজ্য, লেনদেন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র, তামাদ্দুন, রাজনীতি, সরকারী অফিস আদালত, মোটকথা জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই নির্দেশ দান করে। কতিপয় বিষয়ে বাধা দান করে এবং কতিপয় বিষয় আদেশ করতেও দেখা যায়। এর কোন একটিও দ্বীনের অতিরিক্ত বিষয় নয়। যেমন কোরআন আদেশ করে, 'ব্যভিচারীকে একশত বেত্রাঘাত কর।' দ্বীনের এ এমন এক আদেশ যার সম্পর্ক পুলিশ, আদালত এবং সরকারের সাথে। এ জন্যে এ সুস্পষ্ট সামাজিক জীবনের ব্যাপার। কিন্তু এ আদেশকে সে স্বয়ং 'আল্লাহর দ্বীনের আদেশ' বলে অভিহিত করে।

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ ـ(النُّور : ٢)

"এবং এ দু'জনের জন্যে (ব্যভিচারী, ব্যভিচারিণী) 'আল্লাহর দ্বীনের' ব্যাপারে তোমাদের যেন কোন দয়া অনুকম্পা না হয়।"

জানা গেল যে কোরআনের কাছে বেত্রাঘাত করার এ আদেশ 'আল্লাহর দ্বীনের' একটা অংশ। কোরআনের অতিরিক্ত বা কোরআন বহির্ভূত কোন জিনিস নয়।

www.pathagar.com

এভাবে কোরআন বলে যে বছরের চারটি মাস 'নিষিদ্ধ মাস'। এ মাসগুলোতে যুদ্ধ করা জায়েয নয়। কোরআনের এ আদেশ স্পষ্ট যুদ্ধ সংক্রান্ত আইন-কানুনের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেকেই জানে সামাজিক জীবনের সর্বশেষ সমস্যাবলীর একটি এই যুদ্ধ। কিন্তু কোরআন তাকেও 'দ্বীনে কাইয়েম' (সুষ্ঠু দিন) বলে অভিহিত করেছে।

مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ز (التوبة : ٣٦)

অর্থাৎ কোরআনের নির্দেশ হচ্ছে যে চার মাসের নিষিদ্ধকরণ অক্ষুণ্ন রাখা হোক। এ মাসগুলোতে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তার মর্যাদা লুণ্ঠিত করো না। এ দ্বীনের একটি ধারা। তার থেকে পৃথক কোন কিছু নয়।

কোরআন সামাজিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত আইন-কানুনকেই যে শুধু 'দ্বীন' বলে অভিহিত করেছে তা নয়। বরঞ্চ যে কোন ধর্ম ও সমাজের আইন-কানুনকেও 'দ্বীন' বলে অভিহিত করেছে। বস্তুতঃ হযরত ইউসুফের (আ) প্রসংগ বর্ণনা করতে গিয়ে একস্থানে বলা হয়েছে ঃ

مَاكَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِىْ دِيْنِ الْمَلِكِ (يوسف : ٧٦)

"এ ব্যাপারে এমন কোন অবকাশ ছিল না যে, তিনি (ইউসুফ) তাঁর ভাইকে মিশর রাজ্যের 'দ্বীনের অধীনে ধরে রাখবেন।"

পরিষ্কার কথা এই যে, যাকে মিশর রাজ্যের 'দ্বীন' বলা হয়েছে তার অর্থ হলো তার রাষ্ট্রীয় ও ফৌজদারি আইন।

এ কয়টি দৃষ্টান্ত থেকে একথা একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহর প্রতিটি নির্দেশ এবং নবীর প্রতিটি এরশাদ ইসলামের ও দ্বীনের অংগ অংশ। তার কোন একটিকেও দ্বীনের অতিরিক্ত মনে করা যেতে পারে না।

এমনি চিন্তা করে দেখলেও অমন ধারণার মধ্যে কোন সংগতি খুঁজে পাওয়া যায় না। ইসলামের মর্ম যদি আল্লাহ তায়ালার নিরংকুশ আনুগত্য হয়, তাহলে তাঁর কোন আদেশকে শেষ পর্যন্ত আনুগত্যের গণ্ডির বাইরে কিভাবে রাখা যায় ? তাঁর কিছু আদেশকে তাঁর প্রেরিত হেদায়েত নামা ও দ্বীনের অংশ বলে স্বীকার করা না হোক এবং সেসব আদেশ মেনে চলা ইসলামের দাবীর মধ্যে শামিল না হোক–একথা বলা কি করে সম্ভব ?

এখন এ দু'টি গূঢ়তত্ত্ব আপনার সামনে রইলো ঃ

এক ঃ কিতাব ও সুন্নাতে মানব জীবনের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সমগ্র বিভাগ সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

দুই ঃ তার প্রতিটি হুকুম নির্দেশ দ্বীনের অংশ এবং ইসলামের অন্তর্ভুক্ত।

এখন একথা চিন্তা কি সম্ভব যে ইসলামের পরিসীমা (Jurisdiction) মানুষের ব্যক্তি জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ? আর ইসলাম কি এমন এক 'দ্বীন' দুনিয়ার সামাজিক সমস্যাবলীর সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই ?

ইসলাম একটি পূর্ণাংগ ব্যবস্থা

এটা যদি সর্বজনস্বীকৃত হয় যে, এখন রাত নয়, তাহলে তার অর্থ এই যে, এখন অবশ্যি অবশ্যি দিন। অতএব যখন এ সত্য নির্ণীত হলো যে, ইসলাম না বৈরাগ্যবাদকে সঠিক মনে করে এবং না তার পরিসীমা ব্যক্তি জীবন পর্যন্ত সীমিত, তখন তার স্বরূপ আপনা আপনিই নির্ধারিত হয়ে গেল। অর্থাৎ মানবতার এমন কোন সমস্যা নেই যা ইসলামের পরিসীমার (Jurisdiction) বাইরে। এ এমন এক দ্বীন যা প্রতিটি স্থানে মানুষের সংগে রয়েছে। মানুষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করুক, ইসলামের হেদায়েত তার সামনে রয়েছে। সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, এ একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান যা মানবজীবনের বিশ্বাসমূলক, চিন্তামূলক, নৈতিক ও ব্যবহারিক সমগ্র দিককে পুরোপুরি পরিবেষ্টন করে আছে। যেমন ধারা বায়ুর প্রতিটি স্তর পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছে নিম্নে এ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশের একটা মোটামুটি কাঠামো পেশ করা হচ্ছে যাতে করে একদিকে তার দাবীর সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপিত হয় এবং অন্যদিকে একথা জানতে পারা যায় ব্যবস্থাটি আসলে কোন বস্তু ? কিন্তু ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশগুলোর পরিচয় জানার পূর্বে দু' তিনটি মৌলিক বিষয় ভালোভাবে হৃদয়ংগম করা উচিত।

প্রথম কথা এই যে, এসবের প্রত্যেকটি অংশ কেন্দ্রের সংগে সংযুক্ত। প্রত্যেকের মধ্যে একই প্রাণশক্তি প্রবাহিত। এ কেন্দ্র এবং প্রাণশক্তি হচ্ছে। ঈমানীয়াত এবং আকায়েদ যা এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালাই একাকী এবং একমাত্র আমাদের মাবুদ, প্রকৃত শাসক এবং আইনদাতা। বিশেষ করে এই বুনিয়াদী আকিদাই হচ্ছে মূল যার থেকে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক নিয়মে ইসলামের গোটা ব্যবস্থা বের হয়েছে। এ জন্যে এ ব্যবস্থার যে অংশেরই মূল্য এবং গুরুত্ব অনুধাবন করতে চান, তার শুধু বাহ্যিক কাঠামোটাই দেখবেন না। বরঞ্চ তাকে তার এ মূলসহ দেখতে হবে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, এ ব্যবস্থার বাস্তবায়ন এমন এক সমাজের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল যাকে হতে হবে 'মুসলিম'। আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলীর প্রতি যাদের দৃঢ় প্রত্যয় থাকবে। আখেরাতের প্রতি যারা সত্যিকার ঈমান রাখে এবং

www.pathagar.com

যারা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (সা) অন্তর থেকে আল্লাহর নবী ও শেষ নবী বলে স্বীকার করে। সংক্ষেপে বলতে গেলে যারা হবে সত্যিকারভাবে ইসলামের অনুসারী। অতএব এ ব্যবস্থার মূল্য ও গুরুত্ব জানতে হলে প্রয়োজন তাকে এরূপ একটি সমাজের সংগে সংশ্লিষ্ট করেই দেখতে হবে। নতুবা যেমন একজন বিশেষজ্ঞ হাতের ধারণা ব্যতীত কোন উৎকৃষ্ট তরবারীর ধার জানতে পারে না, তেমনি একটি উৎকৃষ্ট মুসলিম সমাজের ধারণা ব্যতীত ইসলামী ব্যবস্থার বাস্তব মূল্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা এক রকম অসম্ভব।

তৃতীয় কথা এই যে, ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশ পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেমন একটি মেশিনের বিভিন্ন অংশ (Parts) পরস্পর জড়িত থাকে। অতএব বুঝার জন্যে তো তাদের দফাওয়ারী ভাগ করা যেতে পারে, কিন্তু ব্যবহারিক দিক দিয়ে তাদের পৃথক পৃথক অস্তিত্ব প্রায় অসম্ভব। নিজ নিজ কর্মকুশলতার দিক দিয়ে এ সমুদয় অংশগুলো মূলত এক। এসবের মধ্যে কোন অংশ তার কাজের বাহাদুরি তখনই দেখতে পারে যখন এ গোটা ব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে চালু হবে। শুধু তাই নয়, বরঞ্চ কোন অংগ অংশকে সঠিকভাবে তখনই বুঝা যেতে পারে, যখন অন্যান্য সমুদয় অংশগুলো চোখের সামনে থাকবে। এ মৌলিক কথাগুলো মনে বদ্ধমূল করার পর আসুন ইসলামী ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা

ইসলামী ব্যবস্থার এ অংশটি হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কেন্দ্রীয় অংশ যার সরাসরি সম্পর্ক মানুষের আভ্যন্তরীণ দিকের সাথে এবং যাকে সাধারণভাবে পরিচিত ভাষায় ইসলামের আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা বলা যেতে পারে। এ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো এই যে, মানুষের আত্মা প্রবৃত্তির দাসত্ব এবং পার্থিব ভোগ লালসার আবিলতা থেকে মুক্ত হবে। অতপর এসব থেকে মুক্ত ও পাক-পবিত্র হবার পর আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর প্রেম ও সন্তুষ্টিলাভের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হবে। এ ধরনের পবিত্রতা ও খোদা প্রাপ্তির বাঞ্ছিত মান এই যে মানুষ শুধু তাই পছন্দ করতে থাকবে যা আল্লাহ পছন্দ করেন এবং ঐ সবকিছুই ঘৃণার চোখে দেখবে যা আল্লাহর নিকটে অপছন্দনীয়। নিজের আসল মনিবের হুকুম সে এমনভাবে পালন করতে থাকবে যেন সে তাঁকে তার আপন চোখে দেখতে পাচ্ছে। তাঁর অসন্তুষ্টিকে এমনভাবে ভয় করবে যেন সে তাঁর দরবারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পিপাসিত যেমন ঠাণ্ডা পানির দিকে ছুটে যায়, তেমনি সে তার মনিবের সন্তুষ্টিলাভের জন্যে যাবে। তাঁর ইংগিতে নিজের জানমাল লুটিয়ে দিতে এমনভাবে প্রস্তুত থাকবে, যেন এ সবের কোন মূল্যই তার কাছে

www.pathagar.com

নেই। আধ্যাত্মিকতার এই উচ্চতম মানের নাম ইসলামের পরিভাষায় বলা হয়েছে ইহসান।

আত্মার এহেন পবিত্রতা ও খোদা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে মনের এ অবস্থা সৃষ্টি করার জন্যে ইসলাম যে বুনিয়াদি এবং প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা নির্ধারণ করছে তা হলো আরকানে ইসলাম, যার বুনিয়াদি আমল সম্পর্কে গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এ জন্যে এর বিশ্লেষণ এখানে প্রয়োজন নেই যে নামায, যাকাত, রোযা এবং হজ্জ মানুষের মনে এ অবস্থা কিভাবে সৃষ্টি করে।

নৈতিক ব্যবস্থা

একটি মানুষের অন্তরে পবিত্রতা আছে, না অপবিত্রতা, তার এক নম্বর কষ্টিপাথর হচ্ছে তার চরিত্র। তার ভেতরটা যেমন হবে তার চরিত্রের বহিঃপ্রকাশও তেমন হবে। এ কারণেই সাধারণতঃ মানুষের চরিত্রকেই তার মানবতার আয়না বলে স্বীকার করা হয়। অতএব স্বাভাবিকভাবেই আধ্যাত্মিক ব্যবস্থার পর নৈতিক ব্যবস্থার স্থান। দ্বীনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে তা সিদ্ধান্তও এই। কেননা সে উত্তম চরিত্রকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এতটা গুরুত্ব দিয়েছে যে, এক দিক দিয়ে যেন তা ঐ দ্বীনের সুফল। নবী (স) বলেন ঃ

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْاَخْلَاقِ ـ(مشكوة)

"আমি এ জন্যে প্রেরিত হয়েছি যে, উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতা দান করব।"

اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ ـ(مسلم)

"নেকি হচ্ছে উত্তম চরিত্রের নাম।"–(মুসলিম)

এ কারণেই চরিত্র সংক্রান্ত অধ্যায়ে ইসলাম বিশদভাবে এবং অত্যন্ত তাকীদ করে কথা বলেছে। এসব কারণে ইসলামী ব্যবস্থার অন্যান্য অংশের পূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা সমীচীন হবে।

এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম ইসলামী নৈতিকতার পজিশন জেনে নেয়া উচিত। অর্থাৎ ইসলামে ভালো এবং মন্দ চরিত্র কি পূর্ব নির্ধারিত ? যদি তাই হয়, তাহলে তা কি চিরদিনের জন্যে নির্ধারিত, না কালের ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার মধ্যে পরিবর্তনও হতে পারে ?

এসব প্রশ্নের জবাব এই যে, ভালো এবং মন্দ চরিত্রের সিদ্ধান্ত করার একটা নির্ধারিত বিধিসম্মত চূড়ান্ত শক্তি (authority) ইসলামে আছে। তা হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের ('অথরিটি') ভালো চরিত্র তাই যা আল্লাহ

www.pathagar.com

এবং তাঁর রসূল ভালো বলেছেন। এভাবে মন্দ চরিত্রও তাই যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল মন্দ বলেছেন। অতএব ভালো মন্দ চরিত্রের সমস্যা একটি পূর্ব মীমাংসিত সমস্যা। এ কোন মানবীয় বিবেক অথবা অভিজ্ঞতার মুখাপেক্ষী নয় এবং কারো প্রতীক্ষারও প্রয়োজন মনে করে না। সাধারণতঃ দেখতে গেলে দেখা যায় যে, সুবিদিত নৈতিকতা সকল সমাজেই চালু ছিল। এটা শুধু ইসলামেরই বিশিষ্ট বস্তু ছিল না। কিন্তু তাই বলে এতদসত্ত্বেও ইসলামী নৈতিকতা ও সাধারণভাবে সুবিদিত নৈতিকতাকে এক মনে করলে মারাত্মক ভুল হবে। কারণ ইসলাম কোন কার্যপদ্ধতিকে ভালো বা মন্দ এ জন্যে বলেনি যে, লোকে তাই বলে আসছে এবং তাই মনে করে আসছে। অথবা বিবেক ও অভিজ্ঞতার দ্বারা তার এই ভালোমন্দ স্থান নির্ধারিত হয়েছে। বরঞ্চ যা কিছু বলেছে তা নিজের মূলনীতির ভিত্তিতেই বলেছে। বস্তুতঃ একদিকে এমন বহু কিছু আছে, যা তার নিকটে মংগল এবং ভালো চরিত্র বলে গৃহীত। কিন্তু অপরে তাকে এমন বলে স্বীকার করে না। এরূপ এমন কিছুও আছে যাকে সে অমংগল এবং মন্দ চরিত্র বলে। কিন্তু কত লোক তাকে আবার ভালো বলে। এটা একথারই জ্বলন্ত প্রমাণ যে, চরিত্র সম্পর্কে ইসলামের নিজস্ব এক বিশিষ্ট মানও আছে এবং একটা স্থায়ী ব্যবস্থাও। ভালো এবং মন্দ চরিত্র হওয়ার সমুদয় সিদ্ধান্ত শরীয়ত তার নিজস্ব মূলনীতি এবং মেজায প্রকৃতি অনুযায়ী করে থাকে।

এখন যেহেতু ইসলামী নৈতিকতার একটা স্থায়ী বুনিয়াদ আছে এবং তা পুরোপুরি ইসলামের বুনিয়াদী মূলনীতির প্রত্যক্ষ ফল এ জন্যে তা স্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয়। কালের চক্র এমন কোন দাবী করতে পারে না যার জন্যে তাকে তার স্থান থেকে তিল পরিমাণ বিচ্যুতি করা যায়। সত্যবাদিতা এবং বিশ্বাস-ভাজনতা সর্বাবস্থায় উৎকৃষ্ট মানবীয় গুণ হিসাবে বিবেচিত হবে। ন্যায় বিচার তখনো প্রয়োজন হবে যখন তার দ্বারা নিজের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকবে। ওয়াদা ভংগ করা কোন দুশমনের ব্যাপারেও সংগত হবে না। মোটকথা, এ চারিত্রিক নীতি সর্বাবস্থায় অক্ষুণ্ন থাকবে। আর ইসলামের চারিত্রিক মূল্যবোধ কস্মিনকালেও পরিবর্তনের বস্তু নয়।

এই হচ্ছে ইসলামী নৈতিকতার পজিশন। একথা মনে রেখে তার বিচার-বিশ্লেষণ করা যাক। এতদসহ এটাও দেখতে হবে যে, সে সব কি। প্রথমতঃ ঐসব চারিত্রিক নীতি আলোচনা করা যাক যা মানুষের সাধারণ জীবন যাপনের সাথে উপযুক্ত এবং যা মৌলিক ধরনের। আল্লাহ বলেন ঃ

اَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ـ(قصص : ٧٧)

লোকের সাথে সদয় ব্যবহার কর, যেমন খোদা তোমার সাথে করেছেন।"

www.pathagar.com

.....وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط (ال عمران : ١٣٤)

---"(ওসব মুত্তাকিদের জন্যে) যারা ক্রোধ সম্বরণ করে এবং লোকদেরকে ক্ষমা করে দেয়।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৪)

اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ه (حج : ٣٨)

"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা কোন প্রতারক ও অকৃতজ্ঞকে ভালোবাসেন না।"

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ه(بنى اسرائيل : ٢٦)

"এবং তোমরা বাহুল্য খরচ করো না।"–(সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ২৬)

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ط اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ج (لقمان : ١٨)

"লোকের সাথে কথা বলার সময় নিজের গণ্ডদেশ বক্র করো না। আর না মাটির উপরে গর্বভরে চরাফেরা কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ কোন গর্ব অহংকারীকে মোটেই পছন্দ করেন না।"–(সূরা লোকমান ঃ ১৮)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ج(همزة : ١)

"নিশ্চিত ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে (সামনা সামনি) লোকদের উপর গালাগাল এবং (পেছনে) দোষ প্রচারে অভ্যস্ত।"–(হুমাযাহ ঃ ১)

নবী করীম (সা) এরশাদ করেন ঃ

–"ভৎর্সনাকারী ও সত্যবাদিতা নেকির দিকে এবং নেকি জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। আর মিথ্যা পাপের দিকে এবং পাপ জাহান্নামের পথ দেখায়।"
–(বুখারী মুসলিম)

–"সামান্য পরিমাণ 'রিয়াও' শির্ক।"–(মিশকাত)

–"অত্যাচার করা থেকে নিজকে রক্ষা কর। কারণ অত্যাচার কিয়ামতের দিনে অন্ধকারের রূপ গ্রহণ করবে।"–(মুসলিম)

–"চারটি স্বভাব যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে হবে পাকাপোক্ত মুনাফিক। যার মধ্যে এই চারের যে কোন একটি স্বভাব পাওয়া যাবে তার মধ্যে মুনাফেকীর একটি দোষ আছে বলতে হবে। সে চারটি স্বভাব হলো (১) যখন তার উপরে কোন আমানত সুপর্দ করা হয়, তখন সে খেয়ানত করে। (২) কথা বলার সময় মিথ্যা বলে। (৩) ওয়াদা পালন করে না এবং (৪) বিতর্ক কালে গালাগালি করে।"–(মুসলিম)

www.pathagar.com

–"নম্রতা অবলম্বন কর। রূঢ়তা এবং অকথ্য ভাষণ থেকে দূরে থাক।"
–(মুসলিম)

–"চোগলখোর জান্নাত থেকে বঞ্চিত থাকবে।"–(মুসলিম)

"আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির উপর দয়া করেন না যে অপরের প্রতি দয়া করে না।"–(বুখারী)

–"প্রতারক, কৃপণ এবং যারা উপকার করে প্রচার করে বেড়ায় তারা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।"–(তিরমিযী)

ইসলামের এই সাধারণ এবং বুনিয়াদী ধরনের নৈতিক শিক্ষার পর ঐসব নৈতিকতার আলোচনা করা যাক, যা শিক্ষা দেয়া হয়েছে জীবনের বিশেষ বিশেষ বিভাগকে সামনে রেখে।

মানব জীবনের সর্বপ্রথম গণ্ডি হলো দাম্পত্য জীবন যেখানে বিবি বাচ্চার সাথে হর-হামেশা বাস করতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই আপন পরিবার পরিজনের সাথে প্রত্যেকের গভীর ভালোবাসা থাকে। এ জন্যে সে সাধারণতঃ তাদের জন্যে ত্যাগ কুরবানী স্বীকার করে। ইসলাম বলে যে এ ভালোবাসাসুলভ ব্যবহার শুধু প্রকৃতিগতই নয়, বরঞ্চ দ্বীনের এক অবশ্য করণীয় বিষয়।

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ـ(النساء : ١٩)

"আল্লাহ তায়ালার আদেশ হচ্ছে—আপন স্ত্রীদের সাথে সৎ ও ভালোভাবে বসবাস কর।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১৯)

خِيَارُكُمْ ، خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ ـ(ترمذى)

"তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ব্যক্তি সেই, যে তার নারীদের পক্ষ থেকে ভালো।"–(তিরমিযি)

اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ـ(بخارى و مسلم)

–"নারীদের ব্যাপারে ভালো বা মংগলজনক অসিয়ত কর।"

দাম্পত্য জীবনের পর পারিবারিক জীবনের গণ্ডি শুরু হয়। এখানে মা-বাপ, ভাই-বোন প্রভৃতি আপনজনদের সংস্পর্শে আসতে হয়। মা-বাপের সাথে যে ধরনের ব্যবহার করতে বলা হয়েছে, তার গুরুত্ব এর থেকে অনুমান করা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে ভালো ব্যবহারের আদেশ তাঁর বন্দেগীর আদেশের সাথে করেছেন।

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ـ(النساء : ٣٦)

www.pathagar.com

"আল্লাহর এবাদত কর এবং তাঁর কোন শরীক বানায়ো না এবং তোমাদের মা-বাপের সাথে ভালো ব্যবহার কর।"-(সূরা আন নিসা ঃ ৩৬)

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا ط (بنى اسرائيل : ٢٤)

"তাদের (মা-বাপের) জন্যে দোয়া ও স্নেহ সহকারে নম্রতার বাহু অবনমিত কর এবং দোয়া কর-হে খোদা ! তুমি তাদের উপর রহমত বর্ষণ কর যেমন তারা দয়া ও স্নেহ সহকারে আমাদেরকে শৈশবকালে প্রতিপালন করেছে।"-(সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ২৪)

-"তোমাদের মা-বাপ তোমাদের জন্যে বেহেশত ও দোযখের কারণ স্বরূপ।"-(ইবনে মাযাহ)

-"যেসব নেক সন্তানেরা তাদের মা-বাপের প্রতি ভালোবাসা ও স্নেহের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাদের এ দৃষ্টির বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা একটি কবুল করা হজ্বের সওয়াব দান করেন।"-(বায়হাকি)

এমন কি মাতা, পিতা যদি খোদা না করুন, কাফের হয়, এমন কি কঠোর ইসলাম দুশমন কাফের হয়, তথাপি তাদের মনঃপুত খেদমতের হক বাকি থাকে এবং এ হক আদায় করাও উচিত।

وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ز (لقمان : ١٥)

"এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার সহ বসবাস কর।"

এখন বাকি রইলো অন্যান্য স্বজনগণ। এদের ব্যাপারেও কোরআন হাকিম সাধারণ এবং ব্যাপকভাবে সদ্ব্যবহারের উপদেশ দিয়েছে। সূরায়ে নেসার উল্লেখিত وَبِالْوَالِدَيْنِ احْسَانًا পরেই وَبِذِى الْقُرْبٰى শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। তার অর্থ হলো, যেরূপভাবে মা-বাপের সাথে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী সদ্ব্যবহার করতে হবে তেমনি ব্যবহার স্বজনগণের প্রতিও করতে হবে। এদের মধ্যে যাদের সম্পর্ক যত নিকট হবে তাদের হক তত বেশী অধিকতর হবে।

اُمُّكَ ثُمَّ اَبَاكَ ثُمَّ اَدْنَاكَ اَدْنَاكَ-(بخارى)

"প্রথম তোমার মা। তারপর তোমার বাপ। তারপর নিম্ন পর্যায়ের। তারপর নিম্ন পর্যায়ের।"-(বুখারী)

একজন মুমেনের জন্যে এটা ফরয যে সে এভাবে পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করবে।

www.pathagar.com

আত্মীয় স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহারকে কোরআন হাদীসের পরিভাষায় 'সেলা রহমী' (صله رحمى) বলা হয়ে থাকে। তার অর্থ হলো, যাদের সংগে রক্তের সম্পর্ক আছে তাদের দেখাশুনা করা। কোরআন হাকিম এ 'সেলা রহমী'কে মানবতা এবং দ্বীনদারির একটা বুনিয়াদী প্রস্তর বলে অভিহিত করেছে এবং বারবার এ বিষয়ে উপদেশ দেয়া হয়েছে। নবী করীম (সা) বলেন যে 'সেলা রহমী' ঈমানের অপরিহার্য বিষয়গুলোর একটি।

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهٗ (بخارى)

–"যারা আল্লাহ এবং আখেরাতের উপর ঈমান রাখে তাদের উচিত 'সেলা রহমী' করা। অর্থাৎ নিকট আত্মীয়ের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা।"

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ (بخارى)

"নিকট আত্মীয়ের সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

তারপর তিন নম্বর হচ্ছে প্রতিবেশী ও মহল্লাবাসীর গণ্ডি। প্রতিবেশীর সাথে কোন্ ধরনের ব্যবহার করা উচিত তার জন্যে দু'টি হাদীসই যথেষ্ট।

مَازَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِىْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهٗ سَيُوَرِّثُهٗ (بخارى)

"হযরত জিবরাঈল আমাকে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে হর-হামেশা অসিয়ত করতে থাকেন। তাতে করে শেষ পর্যন্ত আমার মনে হতে লাগলো যে, তাদেরকে বোধ হয় ওয়ারিস বানিয়ে দেবেন।"–(বুখারী)

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَّايَاْمَنُ جَارُهٗ بَوَائِقَهٗ (مسلم)

–"যে ব্যক্তির প্রতিবেশী তার অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে নিরাপদ নয়, সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।"–(মুসলিম)

এখন সামনে সামাজিক জীবনের বৃহত্তর ও বিস্তৃত ক্ষেত্র আসছে যেখানে মানুষকে বিভিন্ন প্রকার লোকের সংস্পর্শে আসতে হয়। তাদের সাথে যে ধরনের আচরণ করা উচিত নীতিগতভাবে কোরআন মজিদের একথাগুলো তা নির্ধারণ করে।

.....وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ (النساء : ٣٦)

www.pathagar.com

"এবং আল্লাহ তায়ালা হুকুম করেছেন সদ্ব্যবহার করার জন্যে মা-বাপের সাথে, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে, এতীম মিসকীন, প্রতিবেশী আত্মীয়, অপরিচিত প্রতিবেশী, পার্শ্বচরগণ মুসাফির এবং দাসদাসীর সাথে।"

–(সূরা আন নিসা ঃ ৩৬)

মানবীয় সম্পর্কের দৃষ্টিতে মানুষ যত প্রকারের হতে পারে উপরোক্ত আয়াতটি তাদের এক একটি করে নাম উল্লেখ করে দিয়েছে এবং সকলের সম্পর্কে এ সার্বিক হেদায়েত দিয়েছে যে, তাদের সাথে একজন মুসলমানের আচরণ অনিবার্যরূপে দয়া ও মংগলজনক হতে হবে।

প্রথম কথা এই যে, সাধারণ সামাজিক জীবনের পরে সরকার পরিচালনাধীন ক্ষেত্র আসে। ইসলামী সমাজে প্রত্যেকের রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক দিক থেকে একটা নির্ধারিত পজিশন বা স্থান আছে। হয় সে নেতৃস্থানীয় হবে অথবা অনুসারী অনুগত। শাসকের স্থানে হবে অথবা শাসিত বা প্রজা। যদি সে নেতা এবং শাসকের মর্যাদাধারী হয়, তাহলে শাসিতের প্রতি তার যে আচরণ হওয়া উচিত, তার বিশ্লেষণ নবীর নিম্ন এরশাদে পাওয়া যায় ঃ

مَامِنْ اَمِيْرٍ يَلِىْ اُمُوْرَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ لَايَجْهَدُ لَهُمْ وَلَا يَنْصَحُ لَهُمْ اِلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ ـ(مسلم)

–"যদি কোন নেতা মুসলমানদের কাজের দায়িত্ব নেয়া সত্ত্বেও তাদের জন্যে কঠোর পরিশ্রম না করে এবং না তাদের কোন খোঁজ খবর রাখে, তাহলে সে তাদের সংগে জান্নাতে যেতে পারবে না।"–(মুসলিম)

যারা প্রজা বা শাসিত, শাসকের প্রতি তাদের কিরূপ আচরণ হবে তা নিম্নের হাদীসটি বলে দেয় ঃ

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةَ قُلْنَا لِمَنْ ؟ قَالَ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ ـ(مسلم)

"নবী বলেন, 'দ্বীন হচ্ছে মংগলাকাংখা ও আনুগত্যের নাম।' জিজ্ঞেস করা হলো 'কার আনুগত্য ?' বললেন, আল্লাহর, তাঁর রসূলের, মুসলমানদের নেতৃবর্গের এবং সমগ্র মুসলমান জনসাধারণের।"–(মুসলিম)

অর্থাৎ দ্বীনদারি এবং খোদাপুরস্তির চাহিদাগুলোর মধ্যে এটাও অবশ্যই শামিল আছে যে, শাসিতদের প্রতি শাসকদের এবং শাসকদের প্রতি শাসিতদের আচরণ উভয়ই হবে মংগলাকাংখার এবং আন্তরিকতার।

www.pathagar.com

শেষ কথা এই যে, একজন মুসলমানের জীবনের সর্বশেষ ক্ষেত্র বা গণ্ডি হচ্ছে এমন সমাজ যা মুসলিম সমাজ বহির্ভূত। অর্থাৎ অমুসলিমদের সাথে আচরণ ও সম্পর্ক সম্বন্ধে তার দায়িত্ব। তাকে যে নৈতিক আচরণ পদ্ধতির অধীন থাকতে হবে, তার মূলনীতি নিম্নের আয়াতে লক্ষ্যণীয় ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ز وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا ق هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ز(المائدة : ٨)

"তোমরা যারা ঈমান এনেছো জেনে রাখ। তোমরা দ্বীনের জন্যে দণ্ডায়মান হও এবং তার সাক্ষ্যদাতা হও। আর কোন দলের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ন্যায় বিচার থেকে বিরত না রাখে। ন্যায় বিচার কর। এ হচ্ছে তাকওয়ার অতি উপযোগী বিষয়।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৮)

উপরে যা বর্ণিত হলো, সেসব হচ্ছে মৌলিক বিষয় যার ভিত্তিতে ইসলাম মানুষের নৈতিক জীবনের প্রাসাদ নির্মাণ করতে চায়। এসব দেখে প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুভব করবে যে মুসলিম জীবনের প্রতিটি স্তর চরিত্রের সুদৃঢ় নিয়ম-নীতির দ্বারা শক্ত করে বাঁধা।

পারিবারিক বিধান

আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক—এ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের পর মানব জীবনের তামাদ্দুনিক কাঠামোর দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক এবং তার এক একটি বিভাগ সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশাবলীর আলোচনা করা যাক।

মানবীয় তামাদ্দুনের ভিত্তি একজন পুরুষ ও একজন নারীর পরস্পর মিলনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ দু'টি মানুষের মিলিত হওয়ার ফলে যে ছোট্ট একটি সামাজিক গণ্ডি তৈরী হয়, তা হচ্ছে মানুষের তামাদ্দুনিক জীবনের সর্বপ্রথম ইউনিট। এ সামাজিক ইউনিটকে মানুষের পারিবারিক জীবন বলা হয়। তার জন্যে যে নিয়ম-কানুন, তাকে বলা হয় পারিবারিক ব্যবস্থা বিধান। ইসলামের নির্ধারিত পারিবারিক ব্যবস্থার মূল বিষয়গুলো নিম্নরূপ ঃ নারী পুরুষের এ স্থায়ী মিলন একটি প্রকাশ্য চুক্তির মাধ্যমে সংঘটিত হয় যাকে শরীয়তের ভাষায় 'নিকাহ' (বিবাহ) বলে। এ বিবাহ একটি পবিত্র সম্বন্ধ যা উভয়ের সম্মতিতে এবং প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। বিবাহ ব্যতিরেকে নারী পুরুষের মিলন বা সম্পর্ক বিরাট পাপাচার এবং কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ বিবাহ শুধু একটি প্রাকৃতিক প্রয়োজনই নয় বরঞ্চ শরীয়তের দৃষ্টিতেও প্রয়োজন।

www.pathagar.com

.....اَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ ـ(بخارى)

"তোমরা কি নারীদেরকে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করছো ? (তা এটা হলো আমার সুন্নাত)। যে এ সুন্নাত থেকে দূরে থাকলো, সে আমার (দলভুক্ত) নয়।"–(বুখারী)

বিবাহ চুক্তিকে কোরআন একটা 'সুদৃঢ় চুক্তি' ـ وَمِيْثَاقًا غَلِيْظًا বলে অভিহিত করেছে। এ চুক্তির মাধ্যমে উভয়ে বিরাট দায়িত্ব নিজ নিজ কাঁধে বহন করে এবং চিরদিন এ দায়িত্ব তারা বহন করে। এ সম্পর্কের দরুন যে একটি ক্ষুদ্র ইউনিট তৈরী হয়, পুরুষ হয় তার অভিভাবক ও প্রধান পরিচালক এবং নারী তার নির্দেশানুযায়ী গৃহাভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাদি পরিচালনা করে ঃ

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ ـ(النساء : ٣٤)

এ সামাজিক ইউনিটে পুরুষের দায়িত্ব নিম্নরূপ ঃ

لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ـوَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اٰتَاهُ اللّٰهُ ـ

"সে তার স্ত্রী এবং সন্তানাদির খাওয়া-পরা, ভরণ-পোষণ ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করবে। জীবন যাপনের এ যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ প্রত্যেক ব্যক্তি তার আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী করবে।"–(সূরা আত তালাক ঃ ৭)

এ দায়িত্ব শুধু নৈতিক দিক দিয়েই নয়, বরঞ্চ তা আইনগতও। অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি এ বিষয়ে অবহেলা প্রদর্শন করে, তাহলে সরকার তাকে তার দায়িত্ব পালনে বাধ্য করবে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا ـ(تحريم : ٦)

"হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমরা এবং তোমাদের নিজেদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।"–(সূরা তাহরিম ঃ ৬)

মোটকথা পুরুষের উপর দ্বিগুণ দায়িত্ব হয়েছে। তাকে পরিবার-পরিজনের পার্থীব প্রয়োজন মেটাতে হবে এবং তাদের পারলৌকিক মংগলের জন্যেও সচেষ্ট থাকতে হবে। কারণ তাকে দেশের সরকার এবং আখেরাতে খোদার কাছে এ বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে।

নারীর দায়িত্ব নিম্নরূপ ঃ সে গৃহের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা পরিচালনা করবে।

وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا ـ

–"নারী তার স্বামীর গৃহ পরিচারিকা।"–(বুখারী, মুসলিম)

www.pathagar.com

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ ـ(النساء : ٣٤)

"সে স্বামীর আনুগত্য করবে এবং আপন সম্ভ্রম সতীত্বের পুরোপুরি রক্ষণাবেক্ষণ করবে।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৩৪)

এভাবে সন্তানদেরও ফরয হচ্ছে মাতা-পিতার আনুগত্য ও খেদমত করা। তাদের অবাধ্যতা অমার্জনীয় গুনাহ।

كُلُّ الذُّنُوْبِ يَغْفِرُ اللّٰهُ مِنْهَا مَاشَاءَ اِلاَّ عُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ ـ

"মাতা-পিতার নাফরমানি ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ আল্লাহ ইচ্ছা করলে মাফ করে দেবেন।"–(মিশকাত)

বিবাহ যেমন একটি শরীয়তের প্রয়োজন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তেমনি বিবাহোত্তর কালের যাবতীয় দায়িত্বাবলীকে আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত সীমারেখা বলা হয়েছে। تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ـ(البقرة : ٢٢٩) নারী পুরুষকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন এ সীমারেখার পুরোপুরি রক্ষণাবেক্ষণ করে।

প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তির কাছে আশা করা যেতে পারে যে, তারা বরাবর এ সীমারেখার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে। কিন্তু খোদা না খাস্তা, যদি অবস্থা এরূপ না থাকে, বরঞ্চ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য মনোমালিন্য সৃষ্টি হয় এবং বনিবনাও হওয়ার কোন সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে অগত্যা এ বিষয়েরও অনুমতি আছে যে, স্বামী 'তালাক' দ্বারা এবং স্ত্রী 'খোলা' দ্বারা বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারবে।

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ط فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ط

"যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা (স্বামী-স্ত্রী) আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা কায়েম রাখতে পারবে না, তাহলে তাদের কোন অপরাধ হবে না (ঐ লেনদেনে) যার দ্বারা স্ত্রী নিজকে মুক্ত করে নেবে।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ২২৯)

এমন কি গভর্নমেন্টেরও এ এখতিয়ার থাকবে যে, এ অবস্থায় সম্মুখে অগ্রসর হয়ে সে এ সম্পর্ক ছিন্ন করে দেবে।

সামাজিক ব্যবস্থা

একটি গৃহের এই সংকীর্ণ ও সীমিত গণ্ডির বাইরে এক বিশাল বিস্তৃত ক্ষেত্র আছে যাকে সমাজ বলা হয়। এ সম্পর্কে ইসলামের কিছু মৌলিক ধারণা বিদ্যমান আছে। প্রথমতঃ সেই ধারণাগুলো আলোচনা করে তার নির্দেশাবলীর বিশদ আলোচনা করা হবে।

www.pathagar.com

সমাজ সম্পর্কে ইসলাম একথা বলে যে, যেসব অসংখ্য লোকের সমন্বয়ে এ সমাজ গঠিত, সকলে একই মা-বাপের সন্তান।

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ (النساء : ١)

"তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে আমি পয়দা করেছি।"

–(সূরা আন নিসা ঃ ১)

"অতএব জন্মগত দিক দিয়ে তারা সকলে সমান। তাদের মধ্যে কেউ উচ্চ নীচ নেই। কেউ পাক কেউ নাপাক নয়। সাদা-কালো, আরব অনারব, আর্য-অনার্য, এশীয় ইউরোপীয়, প্রাচ্য প্রতীচ্য — সকলে একই প্রকার মর্যাদার অধিকারী ও একই প্রকার অধিকার লাভের যোগ্য। বংশ, গোত্র, বর্ণ দেশ ও ভাষা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে না। পার্থক্যের শুধুমাত্র একটা ভিত্তি আছে, তা স্বয়ং আমি আল্লাহ। তাদের মধ্যে এমন একদল আছে যারা আমার উপরে অর্থাৎ আমার দ্বীনের উপরে ঈমান রাখে। অন্যদল আমার দ্বীনকে নিজেদের দ্বীন মনে করে না। প্রথমটি ইসলামী সমাজ এবং দ্বিতীয়টি কাফের অথবা অমুসলিম সমাজ।"

এটাও সুস্পষ্ট যে, এ দু'টি সমাজের বুনিয়াদও পৃথক পৃথক। যখন বুনিয়াদ (ভিত্তি) পৃথক, তখন তাদের কাঠামোও অবশ্যই পৃথক ধরনের হয়। ফলে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহে তাদের মধ্যে কোন সমঝোতাও হতে পারে না। যেমন ধরুন, বিবাহের সম্পর্ক, যাকে বলা হয় তামাদ্দুনিক ব্যবস্থার প্রথম ইউনিট। মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে এ বিবাহ সম্পর্ক সম্পাদিত হতে পারে না। তারা পরস্পরের ওয়ারিশও হতে পারে না।

দ্বীন আকিদাহর ভিত্তিতেই যখন মুসলিম ও অমুসলিম দু'টি সমাজ সৃষ্টি হচ্ছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই এ দু'টি সমাজের অনুসারীদের জন্যে ইসলামের আহকামও (নির্দেশাবলী) পৃথক ধরনের হবে।

অমুসলিম সমাজ সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে এই যে, তাদের লোকজনের সাথে সাধারণ মানবীয় নৈতিকতা, যথা ইনসাফ ও ন্যায়নীতি, বিশ্বাসভাজনতা আমানত, দয়া-দাক্ষিণ্য ও স্নেহ ভালোবাসা, সততা ও অংগীকার পূরণ প্রভৃতি সহকারে আচার-আচরণ করতে হবে। কিছুতেই এসব নীতি লংঘন করা যাবে না।

এখন রইলো মুসলিম সমাজের ব্যাপার। এদের জন্যে ইসলাম খুব বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে। এগুলোকে বলা হয় ইসলামের সামাজিক ব্যবস্থা বা বিধান। তার সংক্ষিপ্ত সার নিম্নরূপ ঃ

www.pathagar.com

তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক দলীয় অথবা শ্রেণী কোন্দলের পরিবর্তে ভ্রাতৃত্ব, পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতি ও ত্যাগসূলভ হতে হবে। খোদার এরশাদ হচ্ছেঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ ـ(حجرات : ١٠)

"নিশ্চয় মুসলমানরা পরস্পর ভাই।"–(সূরা হুজুরাত ঃ ১০)

বাস্তব ক্ষেত্রে এ ভাই ভাই সম্পর্ক কেমন হবে তার বিশ্লেষণ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের (সা) বাণীতে পাওয়া যায় ঃ

يُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ـ(حشر : ٩)

"তারা নিজেদের উপরে অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়। যদিও তারা নিজেরা অনাহারে থাকে।"–(সূরা আল হাশর ঃ ৯)

لَايَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ ..... وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِسَآءٍ .... وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ـ .... اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ز .... وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ـ (حجرات : ١١-١٢)

"কোন দল কোন দলের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে না --- না কোন নারী দল অন্য কোন নারীদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে --- পরস্পর দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে কোন মন্দ নাম ধরে ডেকো না --- অধিক আন্দাজ অনুমান করা থেকে বিরত থাক---- কারো রহস্য উদঘাটন করো না এবং একে অপরের নিন্দা করো না।"–(সূরা আল হুজুরাত ঃ ১১-১২)

–"মুমেন পরস্পর একটি অট্টালিকার ন্যায় যার একটি অংশ অন্যটির সাথে ওতপ্রোত জড়িত।"–(বুখারী)

–"পরস্পর ভালোবাসা, দয়া অনুকম্পার মনোভাব এবং স্নেহ বাৎসল্য মুসলমানদেরকে মিলিত করে এক দেহ বিশিষ্ট করে দেয়। যদি এর কোন একটি অংগে কষ্ট হয়, তাহলে গোটা দেহ অসুস্থ হয়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করে।"–(বুখারী)

–"পরস্পর হিংসা করো না। নিছক দাম বাড়াবার জন্যে নিলামে ডাক দিয়ো না। পরস্পর ঘৃণা বিদ্বেষ পোষণ করো না। একে অপরের কেনা-বেচায় হস্তক্ষেপ করে নিজের কেনা-বেচার সুবিধা খুঁজো না। বরঞ্চ সকলে মিলে আল্লাহর বান্দাহ এবং পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাক। একজন মুসলমান অপর জনের ভাই। তারপর না সে যুলুম করে, না তাকে ঘৃণিত তুচ্ছ মনে করে।

www.pathagar.com

মুসলমানের রক্তের, মালের এবং ইজ্জত আব্রুর শ্রদ্ধা করা মুসলমানের জন্যে ফরয।"-(মুসলিম)

-"একজন মুসলমানের অন্যজনের উপরে ছয়টি হক আছে ঃ (১) দেখা হলে তাকে সালাম দেবে। (২) সাহায্যের জন্যে ডাকলে সাড়া দেবে। (৩) তোমার শুভাকাংখী হলে তার শুভাকাংখী হবে। (৪) সে যদি হাঁচি দেয় এবং বলে আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে বলবে ইয়ারহামুকাল্লাহ। (৫) পীড়িত হলে তার সেবা শুশ্রূষা করবে। (৬) মৃত্যু হলে তার জানাযায় শরীক হবে।"-(বুখারী)

-"কোন মুসলমান তার মুসলমান ভাইয়ের বিয়ের পয়গামের উপরে পয়গাম দেবে না, যতোক্ষণ বিয়ে না হয়েছে, অথবা বিয়ের আলাপ-আলোচনা বন্ধ না হয়েছে।"-(তিরমিযি)

-"পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ত করা থেকে বিরত থাক। কেননা এ দ্বীনকে মিটিয়ে দেয়।"-(তিরমিযি)

এ হলো ইসলামী সমাজে লোকদের পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন। ভ্রাতৃত্বভাব এবং ভালোবাসার এ মনোভাব কোন ভুল বুঝাবুঝি অথবা প্রবৃত্তির প্ররোচনায় যদি নষ্ট হতে দেখা যায় তাহলে সংশোধনের জন্যে অগ্রসর হওয়া অন্যান্যদের ফরয হয়ে দাঁড়াবে।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ ـ(حجرات : ١٠)

"মুসলমান তো সকলে পরস্পর ভাই ভাই। অতএব (দু' ভাইয়ের মধ্যে কোন প্রকার মনোমালিন্য হলে) উভয়ের মধ্যে মিটমাট (সোলেহ) করে দাও।"-(সূরা হুজুরাত ঃ ১০)

একবার নবী করীম (সা) সাহাবায়ে কেরামকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ

اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلٰوةِ ؟ قَالَ قُلْنَا بَلٰى ، قَالَ اِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ ـ(ترمذى)

"তোমাদেরকে কি আমি এমন একটি জিনিসের কথা বলবো না যা রোযা, সদকা এবং নামায থেকে উৎকৃষ্ট ? সাহাবীগণ বললেন, 'হাঁ নিশ্চয় বলুন। এরশাদ হলো—পারস্পরিক সম্পর্ক দুরস্ত কর।"-(তিরমিযি)

www.pathagar.com

সমাজের মধ্যে মংগল ও খোদাভীতির কাজে উৎসাহ দান করতে হবে। শুধু উৎসাহ দানই নয়, বরঞ্চ প্রয়োজন এই যে, লোক এ কাজে একে অপরের সাহায্য করবে।

تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ التَّقْوٰى (المائدة : ٢)

"নেকি এবং তাকওয়ার কাজে একে অপরের সাহায্য কর।"
-(সূরা আল মায়েদা ঃ ২)

শুধু এতটুকুই নয়। বরঞ্চ এসব কাজের জন্যে একে অপরকে হর-হামেশা উদ্বুদ্ধ করবে।

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ

"মুমেন পুরুষ এবং মুমেন নারী একে অপরের বন্ধু ও সহযোগী। তারা পরস্পর পরস্পরকে ভালো কাজের আদেশ করে।"-(আত তাওবা ঃ ৭১)

সমাজের মধ্যে অন্যায় অনাচার যেন মাথা তুলতে না পারে। তার উপায় হলো এই যে, একদিকে কোন মন্দ কাজে কারো সাহায্য করা চলবে না। وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ-(مائدة : ٢) এবং অন্যদিকে নিজের সাধ্যানুযায়ী এসব কাজ থেকে অন্যকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে। مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ-(بخارى) কাউকে অন্যায় করতে দেখলে সাধ্যমত তাকে বাধা দাও।-(বুখারী)

এসব মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখাটা শুধু সমাজের খেদমত করাই নয়। বরঞ্চ সে ব্যক্তিরও খেদমত ও মংগল করা যাকে সে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা হবে।

একদা নবী (সা) এরশাদ করলেন—আপন ভাইয়ের সাহায্য কর। সে যালেম হোক অথবা মযলুম।

সাহাবায়ে কেরাম (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! মযলুমের সাহায্যের কথা তো বুঝলাম। কিন্তু যালেমের সাহায্য কিভাবে করা যাবে ?

নবী তার উত্তরে বললেন ঃ

"তোমরা তাকে যুলুম করা থেকে বিরত রাখ। এটাই হবে সাহায্য করা।"-(বুখারী)

www.pathagar.com

ঐসব উৎস বন্ধ করে দিতে হবে যার থেকে যৌন অপরাধ উদ্বেলিত ও উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। এ উদ্দেশ্যে নিম্নের বিভিন্নমুখী পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

(ক) ব্যভিচারকে জঘন্য অপরাধ বলে গণ্য করতে হবে।

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا○(الفرقان : ٦٨)

"এবং যে কেউ ঐ কাজ করবে তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।"

–(সূরা আল ফুরকান ঃ ৬৮)

এ অনাচারের বিরুদ্ধে সমাজের মধ্যে অতি মাত্রায় ঘৃণ্য মনোভাব ছড়াতে হবে।

اَلزَّانِىْ لَايَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ز وَّالزَّانِيَةُ لَايَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ج (النور : ٣)

"ব্যভিচারী বিবাহ করতে পারে না ব্যভিচারিণী অথবা মুশরেক নারী ব্যতীত এবং ব্যভিচারিণীকে কেউ বিবাহ করতে পারে না ব্যভিচারী অথবা মুশরেক পুরুষ ব্যতীত।"–(সূরা আন নূর ঃ ৩)

(খ) ব্যভিচার কার্য সম্পাদনকারীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা অথবা একশত বেত্রাঘাত করার সমুচিত ও হৃদয়বিদারক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ শাস্তি দেবার পদ্ধতি এমন করে দেয়া হয়েছে যে তা দিতে হবে জগণের সামনে অথবা মুসলমানদের উপস্থিতিতে এবং শাস্তি দেবার সময় কোন দয়া সহানুভূতি প্রকাশ করা চলবে না।

وَلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ ..... وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

"এবং তাদের (ব্যভিচারি-ব্যভিচারিণী) জন্যের তোমাদের মনে দয়ার কোন উদ্রেক হওয়া উচিত নয়---এবং উভয়ের শাস্তির সময়ে মুসলমানদের একদলকে সেখানে হাযির থাকতে হবে।"–(সূরা আন নূর ঃ ২)

(গ) স্বাভাবিক অবস্থায় নারীর কর্মক্ষেত্র আপন গৃহের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এবং বিনা কারণে তাদের বাইরে যাওয়া বন্ধ করতে হবে।

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ (احزاب : ٣٣)

"এবং তোমরা (মেয়েরা) বাড়ির ভেতরে অবস্থান কর।"

–(সূরা আল আহযাব ঃ ৩৩)

www.pathagar.com

(ঘ) নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। অতি নিকট আত্মীয় ব্যতীত অন্য কারো সামনে বেপর্দা আসা জায়েয নয়।

يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ـ(احزاب : ٥٩)

"(হে নবী !) মুসলিম নারীদেরকে বলে দিন) তারা যেন তাদের চাদর দিয়ে মাথার উপরে ঘোমটা টেনে দেয়।"–(সূরা আল আহযাব ঃ ৫৯)

অনুরূপ তাদেরকে একাজ থেকেও বিরত রাখতে হবে যে, সুগন্ধ দ্রব্যাদি ব্যবহার করে অলংকারাদির বাহার দেখিয়ে ঠাক-ঠমকসহ তারা যেন বাইরে না বেরয় এবং অকারণে পর্দার আড়াল থেকে যেন গায়ের মুহরাম পুরুষের সাথে আলাপ না করে। আর যদি নেহায়েত কথা বলতেই হয় তাহলে কণ্ঠস্বর যেন কোন আকর্ষণ সৃষ্টি না করে।

.....فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ ـ (احزاب : ٣٢)

"(যদি গায়ের মুহরিমের সাথে কথা বলতেই হয়, তাহলে) যেন কথাবার্তায় কোন মধুরতা বা আকর্ষণ না থাকে। নতুবা যার মনে বদমায়েশি আছে, স্বভাবতঃই তার মনে খারাপ ধারণার সঞ্চার হবে।"

–(সূরা আল আহযাব ঃ ৩২)

نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيْلَاتٌ رُؤُسُهُنَّ كَاسِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَايَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا ـ (مسلم)

(চ) মেয়েদের এমন ধরনের সাজ পোশাক পরিধান করা অথবা এমনভাবে চলাফেরা করা নিষিদ্ধ যা অপরের কাছে সৌন্দর্য প্রকাশক বলে মনে হয়। ঐসব মেয়েদের উপর লানৎ করা হয়েছে যারা এমন মিহি পোশাক পরিধান করে যে ভেতর থেকে দেহ সৌন্দর্য ঠিকরে বেরয় অথবা যারা ঠাক-ঠমকের সাথে চলে।–(মুসলিম)

اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ ـ(بخارى)

(ছ) লজ্জাশীলতা অবলম্বন করার জন্যে বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। লজ্জাশীলতাকে ঈমানের একটি অংশ বলা হয়েছে।–(বুখারী)

(জ) নারী-পুরুষ উভয়ের উপরে ইসলামের নির্দেশ এই যে, কোন নারীর উপরে কোন পুরুষের এবং কোন পুরুষের উপরে নারীর চোখ পড়লে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে না। বরঞ্চ চট করে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে হবে, তা অবনমিত করতে হবে।

www.pathagar.com

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ .... وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ـ(النور : ٣٠-٣١)

"(হে নবী !) মুমেন পুরুষদের বলে দাও তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত করে এবং গুপ্তাংগের রক্ষণাবেক্ষণ করে।---এবং মুমেন নারীদেরকেও বলে দাও তারাও যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত করে এবং গুপ্তাংগের রক্ষণাবেক্ষণ করে। এবং যা (অনিবার্যরূপে) প্রকাশ হয়ে পড়ে তা ছাড়া যেন তারা তাদের বেশভূষা ও সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।"–(সূরা আন নূর ঃ ৩০-৩১)

এভাবে কারো বাড়ির মধ্যে বিনা অনুমতিতে হঠাৎ প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ـ (النور : ٢٧)

"তোমরা যারা ঈমান এনেছো শোন। তোমরা অপরের গৃহে হঠাৎ করে প্রবেশ করো না যতোক্ষণ না গৃহস্বামীর অনুমতি নিয়েছে এবং (অনুমতি নেয়ার পূর্বে) বাড়ির লোকদেরকে সালাম না দিয়েছে।"

–(সূরা আন নূর ঃ ২৭)

(ঝ) অনাচারের চর্চা একেবারে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ এতে করে সমাজের মানসিক পবিত্রতা ক্ষুণ্ন হয়। অতপর এ অনাচারের প্রতি লোকের প্রকৃতিগত ও ঈমানের ঘৃণা হ্রাস হতে থাকে। অতএব ঐসব লোকদের জন্যে কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে যারা এসবের চর্চা করে অথবা সমাজে যারা অনাচার ছড়ায়।

(ঞ) বিবাহের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যুবকদের অবিবাহিত থাকা খুবই অপছন্দ করা হয়েছে।–(মিশকাত)

নির্দেশ আছে যে, যখনই কন্যা সাবালিকা হবে উপযুক্ত পাত্র পাওয়া মাত্র তার বিয়ে দিতে হবে।–(তিরমিযি)

অতপর এ বিয়ে সহজ ও সাদাসিধে ধরনের হতে হবে। অতি নিকট কিছু সংখ্যক (নিষিদ্ধ) আত্মীয় ছাড়া সকল লোকের সাথে বিয়ে জায়েয আছে। এভাবে বংশ-গোত্রের পার্থক্যও কোন প্রতিবন্ধক হতে পারে না। বলা হয়েছে,

www.pathagar.com

বিয়ের ব্যাপারে লোক মেয়ের বংশ, তার সৌন্দর্য এবং তার ধনদৌলত দেখে। কিন্তু তোমাদের (মুসলমানদের) তার শুধু দ্বীন এবং চরিত্র দেখা উচিত।
–(মিশকাত)

মোহর এবং উপঢৌকনাদির ব্যাপারেও একটা ভারসাম্য অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। বিবাহ অনুষ্ঠানের রসমও এতটা অনাড়ম্বর হওয়া উচিত যে, যেখানে কোন ধর্মীয় নেতা অথবা শাসক শ্রেণীর কারো উপস্থিতির প্রয়োজন নেই। আর না অন্য কিছুর প্রয়োজন আছে। দু'জন সাক্ষীর সামনে বর-কনে তাদের রেজামন্দি (পরস্পরের সন্তুষ্টি) প্রকাশ করে নিজেরাই এ কাজ আনজাম দিতে পারে।

(ট) কোন নৈতিক প্রয়োজনের খাতিরে অথবা সামাজিক কোন বিশেষ কারণে সুবিচারমূলক আচরণের শর্তাধীন একের স্থলে চারটি পর্যন্ত বিয়ের অনুমতি আছে। যথা কোন এতিম শিশুকে সৎ সন্তান হিসাবে গ্রহণ করা ব্যতীত তার সঠিক প্রতিপালন সম্ভব নয় অথবা কারো এক স্ত্রীর দ্বারা যৌনপবিত্রতা রক্ষা করা দুষ্কর মনে হয়।–(সূরা আন নিসা ঃ ৩)

(ঠ) বিধবা এবং পতিতা নারীদের পুনরায় বৈবাহিক জীবন অবলম্বন করার হেদায়েত দেয়া হয়েছে। এমনিভাবে কারো যদি ক্রীতদাসী থাকে (অবিশ্য এ প্রথা এখন বিলুপ্ত) তাহলে নির্দেশ হচ্ছে যে তাদের মধ্যে যে বিবাহ যোগ্য তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করবে।–(সূরা আন নূর ঃ ৩২)

যার মধ্যে যৌনবাসনা ও যৌনশক্তি আছে সে যেন অবিবাহিত না থাকে। নতুবা তার যৌন অপরাধের শিকারে পরিণত হওয়ার আশংকা থাকে। যেসব কাজকর্মে মানুষের মধ্যে সাধারণতঃ যৌন অনাচার ও ভোগ সম্ভোগের লিপ্সা জাগ্রত হয় অথবা বোধশক্তি রহিত ও নৈতিক অনুভূতি লোপ পায় তার থেকে দূরে থাকতে হবে। এ কারণেই নাচ, গান, বাদ্য, মদ্যপান এবং অন্যান্য মাদক দ্রব্য ব্যবহার করা হারাম করা হয়েছে।

চাল-চলন এবং খানাপিনার মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হবে। মুমেনের প্রশংসা বর্ণনা করতে গিয়ে কোরআন একথা বলেছে যে, সে না বাহুল্য খরচ করতে পারে, আর না কৃপণতা করতে পারে।–(সূরা আল ফুরকান ঃ ৬৭)

নবী (সা) একদিকে যেমন বলেছেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাহকে যে নিয়ামত দান করেছেন তার বহিঃপ্রকাশ তিনি দেখতে চান।–(মুসলিম) অপরদিকে তিনি আবার অহংকার প্রকাশ অথবা বাহুল্য খরচ এবং ভোগ বিলাস প্রবণতা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। যেমন ধরুন, এমন কোন পোশাক পরিধান করা যাবে না যা পায়ের নীচের গিরা (গোছা) অতিক্রম করে মাটি স্পর্শ করে, যার

www.pathagar.com

দ্বারা অহংকার প্রকাশ পায়। এমন ব্যক্তির দিকে কেয়ামতের দিনে আল্লাহ কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না।-(মিশকাত)

"এমনিভাবে সোনা-চাঁদির পাত্র ব্যবহার করা যাবে না। রেশমী বস্ত্র পরিধান করা অথবা বসার কাজে তা ব্যবহার করা পুরুষের জন্যে জায়েয নয়।"
-(মেশকাত)

ব্যবহারের জন্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসপত্র রাখা উচিত নয়।

فَرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفَرَاشٌ لِإِمْرَاَتِهِ وَثَالِثٌ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ

"স্বামীর জন্যে একটা বিছানা, একটা তার স্ত্রীর জন্যে এবং একটা মেহমানের জন্যে এরপর চতুর্থ একটি করা হলে তা হবে শয়তানের জন্যে।"-(মুসলিম)

অনুরূপ উঁচু দালান কোঠা তৈরী করে বাস করাও ঠিক নয়। নবীর এরশাদ হচ্ছে, মুমেনের প্রতিটি ব্যয় যা সে করে তা হতে হবে আল্লাহর পথে। (প্রয়োজনের অতিরিক্ত) দালান কোঠা তৈরী করাতে কোন মঙ্গল নেই।
-(মুসলিম)

মোটকথা বিলাসিতা থেকে মুসলমানদেরকে দূরে থাকতে হবে।

নারী পুরুষের জন্মগত বৈশিষ্ট্য এবং তাদের কাজের স্বাভাবিক ক্ষেত্র যেমন পৃথক পৃথক, তেমনি তাদের পোশাক পরিচ্ছদও পৃথক পৃথক হওয়া উচিত।

নবী বলেন ঃ

لَعَنَ اللّٰهُ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ-(بخارى)

"যেসব পুরুষ মেয়েদের বেশ ধারণ করে এবং যেসব মেয়ে পুরুষের বেশ ধারণ করে এদের উভয়কেই আল্লাহ তায়ালা অভিসম্পাৎ করেন।"-(বুখারী)

ধৈর্য, সহিষ্ণুতা এবং সম্ভ্রমশালীনতা কিছুতেই পরিহার করা চলবে না। আপনজনের মৃত্যুতে মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। কিন্তু নির্দেশ হচ্ছে যে এ সময়ে অধৈর্য হয়ে আর্তনাদ করা চলবে না।-(আবু দাউদ)

তেমনি আনন্দের আতিশয্যে সীমা অতিক্রম করা চলবে না।

وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا اٰتٰكُمْ-(الحديد : ٢٣)

"তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তা নিয়ে আনন্দে গড়াগড়ি করো না।"
-(সূরা আল হাদীদ ঃ ২৩)

www.pathagar.com

অতপর শুধু সহিষ্ণুতা এবং সম্ভ্রমশালীনতাই নয়, একটা পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ রুচিরও পরিচয় দিতে হবে। নির্দেশ আছে, বাম হাতে কিছু খেয়ো না। –(মুসলিম) এবং ডান হাতে এস্তেনজা করো না এমন কি লজ্জাস্থান স্পর্শ করো না।–(বুখারী) 'এক পায়ে জুতো দিয়ে চলো না' মাথার কিয়দংশের চুল কেটো না।–(বুখারী, মুসলিম)

এমন কাজ করা উচিত নয় যার দ্বারা না দুনিয়ার, না আখেরাতের কোন মংগল হতে পারে। কোরআন মজিদ মুমেনের বুনিয়াদি গুণাবলীর মধ্যে একটি এই বলেছে যে, অনর্থক কাজে সে মাথা ঘামায় না।–(মুমেনুন ঃ ৩)

নবী (স) বলেন, কোন ভালো মুসলমানের পরিচয় এই যে, সে বেহুদা কাজ থেকে দূরে থাকে।–তিরমিযি)

এমন কোন জীবন যাপন পদ্ধতি বা চাল চলন অবলম্বন করা যাবে না যার মধ্যে কোন অমুসলিম সমাজের মানসিকতা কাজ করেছে বলে দেখা যায় এবং যার জন্যে মুসলমানের তামাদ্দুনিক বৈশিষ্ট্য ও দ্বীনি মনোভাব ক্ষুণ্ন করা হয়। যেমন আদেশ হচ্ছে ঃ

(ক) কোন মুসলমান সার্বিকভাবে এমন চালচলন গ্রহণ করবে না যা অমুসলিমদের অথবা খোদাদ্রোহীদের জন্যে নির্দিষ্ট নতুবা তাকে তাদেরই মধ্যে গণ্য করা হবে।

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ –(ابوداؤد)

"যে ব্যক্তি যে জাতির অনুসরণ করবে, সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে।"
–(আবু দাউদ)

(খ) দাঁড়ি এবং গোঁফ রাখার ব্যাপারে মুশরিকদের বিপরীত পন্থা অবলম্বন কর। অর্থাৎ দাঁড়ি বাড়াও এবং গোঁফ ছোট কর।–(বুখারী)

(গ) ইয়াহুদী এবং ঈসায়ীগণ তাদের চুল ঐভাবেই রেখে দেয়। তারা খেজাব ব্যবহার করে না। তোমরা মুসলমান তার বিপরীত কর।–(বুখারী)

মোটকথা ইসলামী সমাজের রুচি ও মননশীলতা একমুখী এবং একই রূপ তৈরী করা হয়েছে। মুসলমানদের সামাজিক বৈশিষ্ট্য পার্থক্য হর-হামেশা এবং সবদিক দিয়ে সুস্পষ্ট রাখতে হবে। তাদের জন্যে এ উদারতা নয়, বরঞ্চ হীনমন্যতা, যার দ্বারা ইসলাম এবং গায়ের ইসলামের মধ্যে সামান্যতম সামঞ্জস্যও প্রকাশ পায়। ইসলাম স্বীকার করে যে, সাদা এক জিনিস এবং কালো অন্য জিনিস এবং একথা মানতে কিছুতেই রাজী নয় যে সাদা কালো উভয়ই এক জিনিস।

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

যে ব্যক্তি ইসলামকে জানে সে একথাও জানে যে, তার দৃষ্টিতে মানুষের আসল স্বার্থ তার আখেরাতের স্বার্থ। তার আখেরাতের জন্যেই জীবিত থাকা এবং মৃত্যুবরণ করা উচিত। মুসলমানের পরিচয়ই এই যে, সে আখেরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেবে এবং তাকেই তার লক্ষ্য বানিয়ে রাখবে। এ এক দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট সত্য। বরঞ্চ সূর্যালোক থেকেও অধিকতর সুস্পষ্ট। তাই বলে ভুল ধারণা যেন না হয়। অর্থাৎ এর অর্থ কখনো এ নয় যে, ইসলাম ঐসব বস্তুর কোনই গুরুত্ব দেয় না যা মানুষের জীবনের জন্যে প্রয়োজন হয় এবং হতে পারে। ইসলাম এ যমীনের উপরে মানুষের যে পজিশন নির্ধারণ করেছে, তার জন্মের যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছে, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও খোদার নৈকট্যলাভের যে ধারণা পেশ করেছে, তার চলার জন্যে যে রাজপথ নির্ধারিত করে দিয়েছে, এসব কিছু দেখার পর যদি মনে করা হয় যে, ইসলাম মানুষের বস্তুগত প্রয়োজনের কোনই গুরুত্ব দেয় না, তাহলে সেটা হবে ইসলাম সম্পর্কে স্পষ্ট অজ্ঞতারই পরিচায়ক। মুমেন এবং মুসলিম শুধু আত্মার নাম নয়। বরঞ্চ আত্মা ও দেহের একত্র সমন্বয়ের নাম। একজন মুসলমানের এ দুনিয়াতে তার কর্তব্য পালন করতে এবং তার পরোয়ারদেগারের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে যা কিছু করতে হয়, তার জন্যে দেহ এবং দৈহিক শক্তিরও প্রয়োজন হয়। এ অবস্থায় ওসব উপায় উপাদানের কেন প্রয়োজন হবে না যার উপর ঐ দেহ এবং দৈহিক শক্তি নির্ভরশীল এবং যাকে আমরা আর্থিক প্রয়োজন বলে থাকি ? বস্তুতঃ নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ ـ

"ফরয এবাদতের পর হালাল রুযী অর্জন করাও ফরয।"–(বায়হাকী)

এ কারণেই কোরআন মজিদ প্রয়োজনীয় উপাদান ও সামগ্রীকে স্থানে স্থানে আল্লাহর মাল (مَالُ اللّٰهِ) পাক জিনিস (طَيِّبٰت) আল্লাহর নিয়ামত (نِعْمَةَ اللّٰهِ) এবং আল্লাহর দান (فَضْلُ اللّٰهِ) বলে অভিহিত করেছে।

মোটকথা জীবনের বস্তুগত প্রয়োজনের পরিপূর্ণ গুরুত্ব ইসলাম দিয়েছে। বরঞ্চ পুরোপুরি ব্যবস্থা করেছে, যাতে করে কোন ব্যক্তি এসব থেকে বঞ্চিত না হয়। এই ব্যবস্থাপনা সর্বব্যাপী ও সর্বমুখীন এবং এর জন্যে নিম্নরূপ চতুর্মুখী ফলপ্রসু পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বয়ং জীবিকা অর্জনের নির্দেশ ও প্রেরণাদান।

উপার্জন ও ব্যয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা এবং প্রয়োজনীয় বাধা নিষেধ।

www.pathagar.com

অভাবগ্রস্তদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে ধনবানদের প্রতি নৈতিক চাপ।
অভাবগ্রস্তদের সম্পর্কে ধনবানদের আইনগত দায়িত্ব।

এ চারটি পন্থার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই ঃ

নিজের জীবিকা স্বহস্তে অর্জন করার প্রেরণা ও নির্দেশ—

(১) প্রত্যেকের নিজের জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করা তার একটা শরীয়ত নির্দেশিত দায়িত্ব মনে করতে হবে। অন্য কারো ঘাড়ে বোঝা হওয়ার পরিবর্তে নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবিকা অর্জন করতে হবে।

(২) ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা অর্জন অত্যন্ত দূষণীয়। যে কেউ নেহায়েৎ প্রয়োজন ব্যতিরেকে অপরের কাছে হাত পাতবে, সে হারাম কামাই করবে এবং হারাম খাবে।

জীবিকা অর্জন ও ব্যয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা ও তার প্রতি বাধা নিষেধ ঃ

(১) জীবিকা অর্জনের সকল প্রকার জায়েয পথ সকলের জন্যে সমানভাবে খোলা থাকবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চেষ্টা চরিত্র করার সমান অধিকার সকলের থাকবে। এখানে ইজারাদারি অথবা জীবিকা অর্জনের একচেটিয়া সুযোগ সুবিধা (monopoly in earning) নামক বস্তুর অস্তিত্ব থাকবে না। কৃষি, ব্যবসা, শিল্প, চাকুরী—এক কথায় জীবিকা অর্জনের কোন জায়েয পন্থা কারো জন্যে নির্দিষ্ট হবে না। প্রত্যেকে তার যোগ্যতা ও পছন্দ অনুযায়ী জীবিকা অবলম্বনে হবে একেবারে স্বাধীন। কেননা এ যমীনের উপরে জীবিকার যত প্রকার উপাদান আছে, তা আল্লাহ তায়ালা তাঁর সকল বান্দার জন্যে পয়দা করেছেন।

خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ق (البقرة : ٢٩)

এ যমীনে যা কিছু আছে তার সবই তোমাদেরই জন্যে পয়দা করা হয়েছে। অতএব এসব থেকে উপকৃত হবার অধিকার নীতিগতভাবে সকলেরই সমান।

(২) যমীন এবং আসমানের সমুদয় বস্তু থেকে নিজের প্রয়োজন অনুসারে সবাই হর-হামেশা উপকার গ্রহণ করতে পারে। কারণ এসব কিছুই পয়দা করার এবং সেগুলোকে প্রয়োজনের অনুরূপ বানাবার ব্যাপারে মানুষের শ্রম-মেহনতের কোন হাত নেই। নবী বলেন ঃ

اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِىْ ثَلٰثٍ فِى الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ -

"সকল মুসলমান তিনটি বস্তুর উপরে সর্বদা তাদের হক রাখে—পানি, ঘাস এবং আগুন।"–(হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে হুজ্জতুল্লাহেল বালেগাতে)

www.pathagar.com

এ হাদীসটিতে নাম যদিও তিনটি বস্তুর নেয়া হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এ একটি নীতিগত হেদায়েত। তার মর্ম এই যে, ঐ সমস্ত বস্তু আসলে সকলের জন্যে গ্রহণযোগ্য যার সৃষ্টি প্রাকৃতিক নিয়মে আপনা আপনি হয়েছে এবং যার মধ্যে মানুষের কোন শ্রম নেই। যেমন আর একটি হাদীসে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। যারা এসব জিনিস ব্যবহার করতে অপরকে বাধা দেয় তাদের সম্পর্কে নবী (সা) বলেন ঃ

..فَيَقُوْلُ اللّٰهُ اَلْيَوْمَ اَمْنَعُكَ فَضْلِيْ كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَالَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ

"আল্লাহ কেয়ামতের দিনে তাকে বলবেন, আজ আমি তোমাকে আমার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত রাখব যেমন তুমি এ বস্তুর উপকার থেকে অন্যকে বঞ্চিত রেখেছ। কারণ তোমার হাত তো এগুলো তৈরী করেনি।"–(ঐ)

মোটকথা, নদী, হ্রদ ও ঝর্ণার পানি, বনের কাঠ ও ঘাস, আপনা আপনি উৎপন্ন গাছের ফল, আকাশের পাখী, পানির মাছ, মরুভূমির পশু, প্রকাশ্য খনি এবং লবণের পাহাড়—প্রভৃতি সমগ্র জিনিসগুলো সাধারণ লোকের ব্যবহারের জন্যে উন্মুক্ত থাকবে। পতিত জমির ব্যাপারও ঠিক তেমনি। যে কেউ ইচ্ছা করলে পরিশ্রম করে তাকে কৃষির উপযোগী করে চাষাবাদ করতে পারে।–(ঐ)

(৩) সাধারণ ব্যবহারের জিনিসগুলোর মধ্যে যতটুকু অংশ শ্রম ও যোগ্যতার দ্বারা কেউ তার দখলে আনলে সেটার মালিক সেই হবে। তারপর তার কাছ থেকে সেটা আর কেড়ে নেয়া যাবে না।

مَنْ اَحْيٰى اَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهٗ۔

"যে ব্যক্তি কোন অনুর্বর জমিকে উর্বর করে ফেলবে, সেটা তারই হবে।"–(ঐ)

(৪) কেউ জীবিকার জন্যে কোন প্রাকৃতিক উপাদান তার মালিকানাধীন করার পর তাকে পতিত রাখতে পারবে না। যদি কেউ তিন বছর পর্যন্ত কোন ভূমিখণ্ডকে পতিত ফেলে রাখে, তাহলে তা আবার খাস জমিতে পরিণত হবে এবং যে কেউ ইচ্ছা করলে তাকে নিজের তত্ত্বাবধানে চাষবাস করতে পারবে।ঐ

(৫) প্রত্যেকের এ অধিকার থাকবে যে, সে তার ধনদৌলতের দ্বারা অধিকতর ধনদৌলত অর্জন করবে। ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে বেশী বেশী ধন অর্জন করা যায়। এর জন্যে শরীয়ত প্রেরণা দিয়েছে এবং এর ফযীলতও বর্ণনা করেছে।

(৬) ধন দ্বারা ধন অর্জনের বলগাহীন স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। কিছু বিরাট নৈতিক ও আইনগত বাধা নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তা নিম্নরূপ ঃ

www.pathagar.com

(ক) কায়-কারবারের নিরংকুশ সততা ও বিশ্বস্ততার প্রয়োজন। গ্রাহককে ধোঁকা দেয়া এবং তার কাছে পণ্যদ্রব্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা বড়ই গুনাহের কাজ। নবীর এরশাদ হচ্ছে, যে গ্রাহককে ধোঁকা দেবে, সে আমার উম্মতের মধ্যে নয়।-(মুসলিম)

(খ) নিজের বিক্রী বাড়াবার জন্যে মিথ্যা কসম করাও বড় গুনাহের কাজ। হাদীসে আছে যে এমন ব্যক্তি কেয়ামতের দিনে আল্লাহর অনুগ্রহ দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হবে।-(মুসলিম)

(গ) সুদের লেনদেন, তা যে ধরনের হোক, একেবারে নিষিদ্ধ। সুদ নেয়া এবং দেয়া উভয়ই হারাম।

اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ط (البقرة : ٢٧٥)

"আল্লাহ বেচাকেনাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।"
-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৫)

فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ج (البقرة : ٢٧٩)

এ শুধু হারামই নয়, বরঞ্চ এমন এক ফৌজদারী অপরাধ যাকে বিদ্রোহ এবং ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সমতুল্য বলে অভিহিত করা হয়েছে।-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৯)

(ঘ) এমন কোন যুগ্ম কারবার করা যাবে না, যাতে একজনের মুনাফা তো নিশ্চিত কিন্তু অপরজনের মুনাফা অনিশ্চিত এবং সন্দেহযুক্ত। এ ধরনের যাবতীয় কারবার সুদের পর্যায়ে পড়ে।

(চ) জুয়া হারাম এবং একটি অপবিত্র কাজ ঃ

اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ (المائدة : ٩٠)

"(কথা এই যে) মদ্যপান, জুয়া, মূর্তিপূজা, তীর নিক্ষেপের দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় প্রভৃতি গর্হিত কাজগুলো একেবারে শয়তানী কাজ। অতএব এসব থেকে দূরে থাক।"-(সূরা আল মায়েদা ঃ ৯০)

শুধু নামকরা ও পরিচিত ধরনের জুয়া খেলাই যে নিষিদ্ধ তাই নয়। বরঞ্চ এমন কোন কারবার করা চলবে না। যার মধ্যে জুয়ার প্রবণতা বিদ্যমান। যথা, লটারী, ফটকাবাজারী, জীবনবীমা প্রভৃতি।

www.pathagar.com

(ছ) যেসব জিনিস খাওয়া হারাম (যেমন মদ, রক্ত, শূকরের মাংস, মৃত পশু-পাখী ইত্যাদি) তার ব্যবসাও হারাম।

اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ

"আল্লাহ ও তাঁর রসূল মদ, পশু-পাখী, শূকর, পুতুল, প্রতিমা প্রভৃতি বেচা-কেনা হারাম করেছেন।"–(বুখারী)

শুধু এ সবের বেচাকেনাই হারাম নয়। তার মূল্য ভক্ষণ করাও হারাম।

(জ) ব্যবসা বাণিজ্যে এমন কোন পন্থা অবলম্বন করা যাবে না যার দ্বারা অন্য লোকের বা সমাজের ক্ষতি সাধিত হয় যেমন ঃ

দর বাড়ানোর জন্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিক্রি না করে আটকে রাখা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এমন গুদামজাতকারী ব্যবসায়ীর প্রতি অভিসম্পাত করা হয়েছে।–(বায়হাকী)

বাজারে পণ্যদ্রব্য এসে পৌছার আগেই পথের মধ্য থেকে খরিদ করে নেয়া জায়েয নয়।–(মুসলিম)

উপরন্তু কোন শহরবাসীকে এ অনুমতি দেয়া যেতে পারে না যে, সে একজন গ্রাম্য পণ্যদ্রব্য বিক্রেতার উকিল এজেন্ট হবে এবং তার মাল বেশী দরে বিক্রির জন্যে নিজের কাছে রেখে দেবে।–(মুসলিম)

(ঝ) এমন কোন কারবার করা চলবে না যাতে এমন কোন জিনিস বিক্রি করা হয় যা বিক্রেতার হাতে থাকে না এতে ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে। অতপর তা পবরর্তীকালে ফটকাবাজীর রূপ ধারণ করে, যার কারণে প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম চড় চড় করে বেড়ে যায়।

لَاتَبِعْ مَالَيْسَ عِنْدَكَ-

"তোমার হাতে যা নেই তা বিক্রি করো না।"–(আবু দাউদ)

(ঞ) অপরের জন্যে ক্ষতির কারণ হতে পারে, এমন কোন জীবিকা অর্জনের পন্থা নিষিদ্ধ। তেমনি এমন কোন পন্থা অবলম্বন করাও নিষিদ্ধ যার দ্বারা লোকের ধর্মীয় ও নৈতিক ক্ষতি সাধিত হয়। মাদক দ্রব্যাদি, ফটোগ্রাফ, নাচ-গান অশ্লীল সাহিত্য রচনা ও তার প্রচার বর্তমানে প্রচলিত ধরনের অশ্লীল অরুচিকর সিনেমা ও ছায়াছবি এবং অনুরূপ অন্যান্য জিনিসকে জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে না।

(ট) লেনদেনের এমন কারবার করা যাবে না যার সকল দিক সুস্পষ্ট নয় এবং এর কারণে উভয় পক্ষের মধ্যে ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি হতে পারে।

–(মুসলিম)

www.pathagar.com

(ঠ) উপরোক্ত বাধা-নিষেধের আওতায় যে অর্থ উপার্জিত হবে তা উপার্জনকারীর নীজস্ব মালিকানাভুক্ত, যা সে আপন ইচ্ছামত ব্যয় করতে পারে। কিন্তু তার ইচ্ছামত ব্যয় করার এখতিয়ারও আবার অর্থহীন ও সীমাহীন নয়। বরঞ্চ তার উপর অনেক নৈতিক এবং আইনানুগ বাধা-নিষেধ আরোপিত থাকে। যদি সে এসব বাধা-নিষেধ না মানে, তাহলে ইসলামী সরকার আইন অবলম্বন করবে। আর যদি সরকারের পাকড়াও থেকে বেঁচেও যায় তবু আখেরাতের পাকড়াও থেকে বাঁচার তার কোন উপায়ই থাকবে না। এসব বাধা-নিষেধের কিছুটা সামনের আলোচনায় আসছে এবং কিছু 'সামাজিক ব্যবস্থা' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

এর সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, ন্যায়সংগত ধরনের সচ্ছল জীবন যাপন অবশ্যই করা যেতে পারে। কিন্তু ভোগ সম্ভোগ ও গর্ব অহংকারের (ধরাকে সরা জ্ঞান করা) এবং অপরকে দেখাবার জন্যে জাকজমকপূর্ণ জীবন যাপন কিছুতেই উচিত হবে না।

অভাবগ্রস্তদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে ধনবানদের প্রতি নৈতিক নির্দেশাবলী ঃ

জীবকা অর্জন এবং ধন উপার্জনের স্বাধীনতা যদিও সকলের সমান, কিন্তু জন্মগতভাবে সকল লোকের বুদ্ধি ও দৈহিক শক্তি একই রকম নয়। বরঞ্চ এদিক দিয়ে বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। অতপর অবস্থা ও সুযোগ-সুবিধা সকলের একই রকম থাকে না। এ জন্যে এ আশা করা যেতে পারে না যে সকলের জীবিকার্জন সংগ্রামের ফল একই রকম হবে। পক্ষান্তরে এটাই বাস্তব এবং অভিজ্ঞতাও তাই বলে যে, একদিকে যেমন সমাজের কিছু লোক লক্ষপতি হয়ে যায়, অপর দিকে কেউ তাদের দু' বেলার অন্নসংস্থান করতে পারে না। একথা জানতে পারা গেছে যে প্রত্যেকের আর্থিক প্রয়োজন পূরণ শুধু একটা দুনিয়ার প্রয়োজনই নয় একটা দ্বীনি প্রয়োজনও। উপরন্তু ইসলাম মানবজাতিকে আল্লাহর পরিবার বলে অভিহিত করেছে ঃ (مشكوة) اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰه এখন যদি আমরা আমাদের পরিবার পরিজনকে অভুক্ত ও বিবস্ত্র দেখতে পছন্দ না করি, তাহলে দয়াময় আল্লাহ কি করে তাঁর পরিবার পরিজনকে অভুক্ত ও বিবস্ত্র দেখা পছন্দ করবেন ? এসব কারণে ইসলাম দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করে যে, জীবিকার সংগ্রামে যারা ব্যর্থ মনোরথ, তাদের প্রয়োজন ঐসব লোক পূরণ করবে যারা জীবিকা অর্জনে সক্ষম এবং এ সংগ্রামে যারা সফলকাম। এ হচ্ছে তাদের এবং সমাজের সমষ্টিগত ব্যবস্থা। অর্থাৎ সরকারের দায়িত্ব যে তাদেরকে অভুক্ত ও বিবস্ত্র থাকতে দেবে না। কেননা এ দুনিয়াতে জীবিকার যত প্রকার উপায় উপাদান আছে তা সবই আল্লাহ তায়ালার তৈরী এবং তা

www.pathagar.com

সমস্ত দুনিয়াবাসীর জন্যে। অতএব আপন জীবিকা অর্জনের সংগ্রামে যদি কিছু লোক তাদের সত্যিকার প্রয়োজন মিটাতে না পারে এবং কিছু লোক তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপার্জন করে, তাহলে এদের এই অতিরিক্ত উপার্জন এদের প্রয়োজনের বস্তু নয়। বরঞ্চ এ অপরের হক যা হকদারদের পাওয়া উচিত। এ অতিরিক্ত উপার্জন উপার্জনকারীর নিকটে আমানত স্বরূপ রক্ষিত। আমানত রক্ষকদের কর্তব্য হচ্ছে প্রকৃত হকদারদের কাছে সে আমানত পৌঁছিয়ে দেয়া। আহলে ঈমানের গুণাবলী বর্ণনা প্রসংগে কোরআন সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে ঃ

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ـ (الذاريات : ١٩)

"এবং তাদের ধন-সম্পদের মধ্যে সাহায্য প্রার্থী এবং বঞ্চিতদের হক আছে।"–(আয যারিয়াত ঃ ১৯)

সমাজের এসব নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্তদের মধ্যে তাদের 'হক' বন্টনের ব্যাপারে ধনবানদের প্রতি যে নৈতিক নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

(১) লোকেরা শোন ! তোমরা নেকি অর্জন কিছুতেই করতে পারবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের প্রিয় ধনের এক অংশ খোদার পথে ব্যয় না করেছ।

لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ـ (ال عمران : ٩٢)

(২) এ হচ্ছে ঈমানের খেলাপ যে এক ব্যক্তি তৃপ্তি সহকারে আহার করে নিদ্রা যাবে আর তার প্রতিবেশী ক্ষুধায় কাতরাবে।

لَيْسَ الْمُؤْمِنَ بِالَّذِيْ يَشْبَعُ وَجَارُهٗ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهٖ ـ (مشكوة)

(৩) ধনদৌলত একটা বিরাট অগ্নি পরীক্ষা। এমন কি একটা সাংঘাতিক ফেৎনা। সাধারণতঃ এ একটা মস্ত রকমের অশুভ পরিণাম থেকে তারাই বেঁচে থাকতে পারে যারা তাদের ধনদৌলত অভাবগ্রস্তদের জন্যে এবং দ্বীনের কাজে মুক্ত হস্তে ব্যয় করে। নবী (সা) বলেন, কা'বার প্রভুর কসম। এসব লোক সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

জিজ্ঞেস করা হলো, তারা কারা।

নবী বললেন, তারা হচ্ছে ধনদৌলত সঞ্চয়কারী। তাদের মধ্যে তারাই এ ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, যারা তাদের ধন আল্লাহর পথে হর-হামেশা এবং মুক্তহস্তে দান করে। আর এ রকম লোকের সংখ্যা বড় বেশী হয় না।–(বুখারী)

www.pathagar.com

অভাগ্রস্তদের ব্যাপারে ধনবানদের আইনানুগ দায়িত্ব ঃ

অভাবগ্রস্তদের এ হকের যে গুরুত্ব, তা বিবেচনা করে ধনবানদেরকে নৈতিক হেদায়েত দানের সাথে কিছু আইনানুগ দায়িত্বও তাদের উপর আরোপ করা হয়েছে। তা নিম্নরূপ ঃ

যে অভাবী নয় এমন উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তার ধন এবং কৃষিজাত দ্রব্যের একটা অংশ আইনগত অধিকার হিসাবে গরীবদের মধ্যে বিতরণ করবে। সমাজের সমষ্টিগত ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক ব্যক্তির যাকাত এবং ওশর আদায় করা হবে। কোন ব্যক্তিই যাকাত এবং ওশর দিতে অস্বীকার করতে পারবে না। বরঞ্চ এ দুনিয়াতেও তাকে ইসলামী সরকারের কঠোর ব্যবস্থার সম্মুখীন হতে হবে।

যদি এ যাকাত এবং ওশরের পরিমাণ গরীবদের প্রয়োজন পূরণে এবং অন্যান্য সামাজিক কাজের জন্যে অপ্রতুল হয়, তাহলে সরকার ধনীদের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করবে।

কারো মৃত্যু হলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার বিভিন্ন নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করা হবে। নিকটাত্মীয় না থাকলে দূর আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করা হবে। (এ উদ্দেশ্যে শরীয়তে মীরাসী আইন বা উত্তরাধিকারী আইন বিদ্যমান আছে।)

এভাবে ধন-সম্পদ একস্থানে কেন্দ্রীভূত হওয়ার পরিবর্তে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়বে। তার ফলে বিত্তহীনদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে। কেননা ধনের প্রসারণ (Circulation) এবং তার সঠিক বন্টন সমাজের আর্থিক অসমতা দূরীকরণের বিরাট উপায়।

রাজনৈতিক ব্যবস্থা

ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থার বুনিয়াদ দু'টি সর্ববৃহৎ তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আল্লাহ তায়ালা যেমন গোটা সৃষ্টিজগতের বিশেষ করে মানবজাতির স্রষ্টা ও প্রতিপালক, তেমনি তিনি প্রকৃত শাসকও।

মানুষ যেমন আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁর দ্বারা প্রতিপালিত তেমনি তাঁর দাস (বান্দাহ) এবং এ যমীনের উপর প্রতিনিধি বা খলীফা।

এ দু'টি তত্ত্বকে বুনিয়াদ (ভিত্তি) হিসাবে নির্ধারিত করার পর, ইসলাম রাজনীতির যে ব্যবস্থা কায়েম করেছে তার উল্লেখ্য রূপরেখা নিম্নরূপ ঃ

www.pathagar.com

(১) সার্বভৌমত্ব এবং শাসনের অধিকার আসলে আল্লাহ তায়ালার। এর মধ্যে কোন ব্যক্তি, কোন বংশ, কোন দল, এমন কি গোটা মানবজাতির তিল পরিমাণ অংশীদার নয়। মানুষ তাঁর জন্মগত দাস ও প্রজা।

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ط اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ط (يوسف : ٤٠)

"শাসন করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। তাঁর ফরমান হচ্ছে, তোমরা তাঁর ব্যতীত আর কারো আনুগত্য করো না।"–(সূরা ইউসুফ ঃ ৪০)

(২) সত্যিকার আইন বিধান রচনাকারী একমাত্র আল্লাহ। তাঁর দেয়া আইনই হবে মানব জীবনের আইন। তাঁর রচিত কানুনই হবে মানব জীবনের কানুন। কোন ব্যক্তি অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের নিজের এ অধিকার নেই যে, তার জন্যে অথবা অপরের জন্যে কোন আইন কানুন তৈরী করে।

(৩) আল্লাহর নবী এ দুনিয়াতে তাঁর প্রতিনিধি এবং তাঁর নির্দেশাবলী ও মরযীর ব্যাখ্যাদাতা। অতএব তাঁর (নবীর) পজিশনও হচ্ছে এই যে, তিনি আল্লাহর অধীন একজন আইন রচনাকারী। তাঁর দেয়া নির্দেশাবলীও ঠিক তেমনিভাবে মেনে চলা অপরিহার্য যেমন প্রকৃত আইনদাতা আল্লাহর নির্দেশাবলী।

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ق وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج (الحشر : ٧)

"এবং রসূল তোমাদের জন্যে যেসব বিধি-ব্যবস্থা ও আইন-কানুন এনেছেন, তা গ্রহণ কর এবং যেসব বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা করেছেন, তার থেকে দূরে থাক।"–(সূরা হাশর ঃ ৭)

রসূলের আনুগত্যও ঠিক আল্লাহর আনুগত্যই।

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ج (النساء : ٨٠)

"এবং যে রসূলের আনুগত্য করলো সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য করলো।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৮০)

(৪) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশাবলী যথাযথ পালন করার জন্যে এবং তাঁদের রচিত আইন-কানুন কার্যকর করার জন্যে একটা সমষ্টিগত ব্যবস্থা এবং একটা প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান বা সরকার কায়েম করা দরকার।

শরীয়তের পরিভাষায় এই সমষ্টিগত ব্যবস্থা ও শাসন প্রতিষ্ঠানকে খেলাফত অথবা ইমারত অথবা ইমামত বলা হয়। বুনিয়াদি দিক দিয়ে এ ধরনের শাসন প্রতিষ্ঠানের বা সরকারের প্রধানকে বলা হয় খলীফা অথবা ইমাম অথবা আমীর।

www.pathagar.com

(৫) ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকত্বের অধিকার প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির হবে যে ইসলামের উপর ঈমান রাখে। এরূপ শুধুমাত্র সেই মুসলমানই রাষ্ট্রের নাগরিক হবে না যে তার সীমানার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। বরঞ্চ দুনিয়ার যে কোন স্থানের মুসলমান অধিবাসী এ রাষ্ট্রে আসা মাত্র আপনা আপনি তার নাগরিক হবে।

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (توبة : ٧١)

"মুমেন পুরুষগণ এবং মুমেন নারীগণ একে অপরের বন্ধু।"

–(সূরা আত তওবা ঃ ৭১)

(৬) ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী যে ব্যক্তি ইসলামকে তার দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করবে না, সে তার প্রকৃত নাগরিক হতে পারবে না। তার পজিশন হবে এই যে, সে হবে এ রাষ্ট্রের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। ইসলামী পরিভাষায় তাকে বলে 'যিম্মী'। তার কারণ এই যে, ইসলামী রাষ্ট্র চুক্তির মাধ্যমে তাদের জান-মাল ও ইজ্জতের রক্ষক। যিম্মীদের অধিকার খলীফা অথবা রাষ্ট্রের মরযীর উপর নির্ভর করে না যে খুশী মতো তা হ্রাস করা যাবে। আল্লাহ এবং রসূলের পক্ষ থেকে তাদের অধিকার নির্ধারিত আছে এবং ইসলামী রাষ্ট্র সর্বদা তা পূরণ করবে।

(৭) খলিফার কাজ এই যে, তিনি প্রকৃত শাসকের (আল্লাহর) নির্দেশ ও মরযী মুতাবেক এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনা করবেন। লোকের মধ্যে ন্যায়নীতি কায়েম করবেন এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণ করবেন। দেশ ও জাতিকে বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করবেন। সর্বশেষ কাজ এই যে, যে উদ্দেশ্যে ইসলাম নাযিল করা হয়েছে, শেষ নবীকে (সা) পাঠানো হয়েছে এবং উম্মতে মুসলেমাকে (মুসলিম জাতি) প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, সে উদ্দেশ্য খলীফা পূরণ করবেন। এ ব্যাপারে তিনি খোদা এবং মানুষ উভয়ের কাছে জবাবদিহির জন্যে প্রস্তুত থাকবেন।

(৮) খেলাফতের এ গুরুদায়িত্ব পুরোপুরি পালনের উদ্দেশ্যে খলীফাকে সাহায্য করার জন্যে একটি 'মজলিসে শুরা' হবে। তার পরামর্শক্রমেই তিনি দেশের আইন-শৃংখলা পরিচালনা করবেন। নবীর প্রতিও আল্লাহর এ নির্দেশ ছিল যে, তিনি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ গ্রহণ করবেন।

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ج (ال عمران : ١٥٩)

(৯) খলিফা ঐ ব্যক্তি হতে পারেন, যাঁকে ইসলামী সমাজ এ গুরুদায়িত্বের উপযুক্ত মনে করে এবং তাঁর খেলাফতের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। তিনি নির্বাচনের

www.pathagar.com

মাধ্যমে ক্ষমতায় আসবেন। দায়িত্ব পালনে অপারগ হলে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা হবে এমন কি তাঁর অক্ষমতা যদি এমন পর্যায়ের হয় যে, তিনি খেলাফতের বুনিয়াদি উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন, তাহলে জাতির কর্তব্য হয়ে পড়বে তৎক্ষণাৎ তাঁর হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়া।

(১০) খলীফা নির্বাচনের পদ্ধতি কি হবে এ সম্পর্কে শরীয়ত কোন বাঁধাধরা নিয়ম পদ্ধতি অবলম্বন করা নির্দেশ দেয়নি। কিন্তু এতটুকু করেছে যে, একদিকে নির্বাচনের উদ্দেশ্য বলে দিয়েছে এবং অপরদিকে তার পদ্ধতি সম্পর্কে মৌলিক হেদায়েত দিয়েছে। এখন যে নির্বাচন পদ্ধতির দ্বারা এ উদ্দেশ্য পূরণ হবে যা হবে মৌলিক হেদায়েত মুতাবিক, তাই হবে ইসলামী পদ্ধতি। উদ্দেশ্য তো এই যে, এমন লোক ক্ষমতায় আসুন, যিনি তাঁর এলম, তাকওয়া স্বীয় বিচক্ষণতা, যোগ্যতা এবং বাস্তব কর্মশক্তির দিক দিয়ে মোটামুটিভাবে সকলের চেয়ে হবেন উত্তম এবং তাঁর প্রতি থাকবে জনসাধারণের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা।

মৌলিক হেদায়েত এই যে, নির্বাচন মূলতঃ সমাজের সেইসব লোক করবে যারা নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা, দ্বীনের প্রতি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার দিক দিয়ে হবেন মিল্লাতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। জনসাধারণের আস্থা থাকবে তাঁদের প্রতি। এ মৌলিক হেদায়েত এ জন্যে দেয়া হয়েছে যাতে করে নির্বাচনের উদ্দেশ্য অধিব-তর সুস্পষ্ট হয়।

(১১) খেলাফতের পদ এবং তেমনি সরকারের যে কোন পদ এমন ব্যক্তিকে দেয়া যেতে পারে না যে তার প্রার্থী হয় অথবা তার জন্যে ইচ্ছুক থাকে।

اِنَّا وَاللّٰهِ لَانُوَلِّىْ عَلٰى هٰذَا الْعَمَلِ اَحَدًا اَسْئَلَهٗ وَلَا اَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ

"আল্লাহর কসম, আমরা এ কাজের দায়িত্ব এমন কোন ব্যক্তির উপর অর্পণ করব না যে তার প্রার্থী হয় অথবা তার জন্যে বাসনা রাখে।"–(বুখারী)

তার কারণ এই যে, ইসলামে হুকুমত বা শাসনকার্য হক নয়, বরঞ্চ দায়িত্ব ও আমানত। اِنَّهَا اَمَانَةٌ-(المسلم) যার জন্যে খোদার নিকট বিরাট জবাবদিহি করতে হবে।

অতএব কোন বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি এর প্রার্থী এবং ইচ্ছুক হয়ে এ দুঃসাহস কখনোই করতে পারে না যে, আগামীকাল যখন সে খোদার সামনে হাযীর হবে, তখন হিসাব দেবার জন্যে তার দায়িত্বগুলোর মধ্যে লক্ষ কোটি খোদার বান্দাদের হক আদায় করারও দায়িত্ব শামিল থাকে।

যদি কোন ব্যক্তি কোন পদের জন্যে স্বেচ্ছায় অগ্রসর হয়, তাহলে প্রমাণিত হয় যে, এ দায়িত্বের ধরনটা সম্পর্কে তার কোন অনুভূতি নেই। আর কারো

www.pathagar.com

কাজের ধরন সম্পর্কে যদি কোন অনুভূতি না থাকে, তাহলে সে তা সঠিকভাবে চালাতেও পারবে না।

(১২) নির্বাচিত খেলাফত মেনে নিতে অস্বীকার করাও কারো জন্যে জায়েয নয়। যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে সে ইসলামের রাজপথ থেকে সরে জাহেলিয়াতের পথে পড়ে যাবে।

কেননা এ অস্বীকৃতি একটি ব্যক্তির প্রতিই অস্বীকৃতি নয়, বরঞ্চ ইসলামী শাসনের প্রতি অস্বীকৃতি এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা।

(১৩) প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে শরীয়তের দিক দিয়ে অপরিহার্য যে খলিফাতুল মুসলিমীনের নির্দেশ মেনে চলবে ঃ

وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ـ(النساء : ٥٩)

কিন্তু যদি তিনি (নির্বাচিত নেতা বা খলীফা) কোন পাপ কাজের হুকুম দেন, তাহলে এমতাবস্থায় তার আনুগত্য না করাই অপরিহার্য হবে।

فَاِنْ اَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ ـ(المسلم)

"কিন্তু যদি সে পাপ কাজের আদেশ করে তাহলে তা শুনবে না এবং মানবে না।"–(মুসলিম)

খলীফাতুল মুসলিমীনের হক শুধু এতটুকুই নয় যে, লোক তাঁর আনুগত্য করবে, বরঞ্চ অন্তর থেকে তাঁর জন্যে মঙ্গল কামনা করতে হবে। ইসলাম এবং দ্বীনদারির দাবীই হচ্ছে এটা।

(১৪) জনসাধারণের এ অধিকার আছে, বরঞ্চ তাদের দায়িত্ব যে তারা খলীফা এবং তাঁর অধীন কর্মচারীদের প্রতি তীক্ষ্ণ সমালোচনার দৃষ্টি রাখবে। তাঁরা ভুল করা মাত্র তা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। তাঁরা যদি বক্র পথে চলা শুরু করেন, তাহলে ন্যায়সংগত চেষ্টার মাধ্যমে তাঁদেরকে সোজাপথে চলার জন্যে বাধ্য করবে।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খলিফা নির্বাচিত হবার পর জনসাধারণকে তাঁদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে স্বয়ং সমালোচনার তাকীদ করেন ঃ

اِنْ زِغْتُ فَقَوِّمُوْنِىْ ـ(طبرى)

"যদি আমি বাঁকা পথে চলি তো আমাকে জোর করে সোজা পথে চালিয়ে দেবে।"–(তাবারী)

www.pathagar.com

(১৫) যেসব সমস্যা ও বিষয়ে আল্লাহ ও রসূলের সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই, সেসব বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে হবে। খলীফাতুল মুসলিমীন এবং তাঁর মজলিসে শুরা এসব আইন তৈরী করবেন।

(১৬) ইসলামী রাষ্ট্র প্রত্যেক ব্যক্তির, মুসলমান হোক অথবা অমুসলমান, জান-মাল ইজ্জত-আবরুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে দায়ী হবে। এরূপ প্রত্যেকের পূজা-অর্চনার অথবা এবাদত করার এবং বিবেকের পুরোপুরি আযাদী থাকবে। মত প্রকাশের উপর শুধু এতটুকু বাধা-নিষেধ থাকবে যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার কোন প্ররোচনা দেয়া চলবে না এবং এমন কোন ধরনের কথা বলা চলবে না যাতে করে দেশে ফেতনা ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ে অথবা নৈতিক অধপতন ডেকে আনে। কোন ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণিত না করে তার আযাদী হরণ করা যাবে না।

(১৭) ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এবং সরকারের দায়িত্ব অতিমহান ও ব্যাপক। তার মৌলিক কার্যধারা কোরআনে হাকিমের এ আয়াতগুলো নির্ধারিত করে ঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ (الحديد : ٢٥)

"আমরা আমাদের রসূলগণকে সুস্পষ্ট নির্দশন ও প্রমাণাদি সহ নাযিল করেছি এবং তাদের সাথে কেতাব ও দাঁড়িপাল্লাহ নাযিল করেছি যাতে করে মানুষ ইনসাফের সাথে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং আমরা নাযিল করেছি লোহা (একটা প্রচণ্ড শক্তি a coercive power)।"

يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

"হে দাউদ ! আমরা তোমাকে দুনিয়ায় আমাদের খলিফা বানিয়েছি। অতএব লোকের মধ্যে হকের সাথে বিচার ফয়সালা কর।"

-(সূরা আস-সোয়াদ ঃ ২৬)

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ (الحج : ٤١)

"এরা হচ্ছে ঐসব লোক যে, যদি তাদেরকে আমরা দুনিয়ায় রাষ্ট্রশক্তি দান করি তাহলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, ভালো ও নেক কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ ও অনাচার বন্ধ করবে।"

www.pathagar.com

প্রথম দু'টি আয়াত ইসলামী সরকারের সাধারণ এবং তৃতীয়টি কিছু বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট করে দিচ্ছে। প্রথম আয়াতগুলো থেকে জানতে পারা যাচ্ছে যে, সরকারের কাজ হচ্ছে সমাজে ইনসাফ কায়েম করা। আর এ এমন এক উদ্দেশ্য যার জন্যে অন্ততঃ ইচ্ছা এবং দাবী সহকারে সাধারণতঃ সকল সরকার কায়েম করা হয়ে থাকে। এ উদ্দেশ্যেই একটা সরকারী ব্যবস্থাপনার অস্তিত্ব অপরিহার্য করে দেয়। তৃতীয় আয়াতটি এ সাধারণ উদ্দেশ্যের সাথে কিছু অতিরিক্ত যোগ করে দিয়ে সরকারের উদ্দেশ্য বলে দিচ্ছে যে, সমাজটাকে এমন করে তৈরী করতে হবে যেন সে নামায কায়েম করে, নেক ও ভালো কাজ নিজে পছন্দ করে এবং অপরকে করার আদেশ করে ; মন্দ কাজ ও অনাচার থেকে নিজে দূরে থাকবে এবং অপরকেও দূরে রাখবে। অন্য কোন সরকারের এ উদ্দেশ্যের কোন দাবী অথবা ঝলক পর্যন্ত দেখা যায় না।

নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত দেয়া, ভালো কাজের আদেশ দান মন্দ কাজে নিষেধ—এই যে চার দফা ভিত্তিক উদ্দেশ্য, একটু চিন্তা-ভাবনা করলে জানা যাবে যে, এ উদ্দেশ্যই হচ্ছে গোটা দ্বীন কায়েম রাখার তার বরকত ও মংগল চারিদিকে প্রসারিত করার এবং সমাজকে একটা সত্যিকার ইসলামী সমাজ বানিয়ে রাখার বিরাট দায়িত্বের ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার দ্বিতীয় নাম।

আইন ব্যবস্থা

ইসলামী আইন ব্যবস্থার মৌলিক বিষয়গুলো নিম্নরূপ ঃ

আইনের প্রকৃত উৎস দু'টি ঃ কোরআন এবং সুন্নাহ। এ দু'টির মধ্যে যেসব সুস্পষ্ট আকারে বিদ্যমান আছে তা অকাট্য এবং অপরিবর্তনীয়। তা সকল সময়ের জন্যে শিরোধার্য এবং তার আনুগত্য অপরিহার্য। তার মধ্যে কখনো সামান্য রকমের কোন রদবদলও করা যাবে না। কোন খলিফা শাসন পরিচালনা করা কালে চুল পরিমাণ তার এদিক ওদিক করতে পারবেন না। কোন বিচারকের জন্যে এ জায়েয নয় যে, তিনি বিচার ফয়সালা করতে গিয়ে কোরআন সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিধান থেকে কিছুটা বিচ্যুত হবেন। আর তাহলে ইসলামকে পরিহার করা হবে।

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ○(المائدة : ٤٤)

"আল্লাহ যে আইন নাযিল করেছেন তার ভিত্তিতে যারা বিচার ফয়সালা করে না, তারা দ্বীন অস্বীকারকারী।–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৪)

www.pathagar.com

যেসব বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান কোরআন সুন্নায় পাওয়া যায় না, সেসব সম্পর্কে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সময়ের প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন করতে হবে। এ আইন শুধু তাঁরাই তৈরী করবেন, যাঁরা জ্ঞান-বুদ্ধি, তাকওয়া, দ্বীন সম্পর্কে সূক্ষ্মদর্শিতা, আইনের বিশেষজ্ঞতা ও সময়ের দাবী সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের ভিত্তিতে সে আইন প্রণয়নের যোগ্য বিবেচিত হবেন। এটা হবে না সাধারণ আইন প্রণয়ন। বরঞ্চ শুধু ঐসব ব্যাপারে যে সম্পর্কে কোরআন সুন্নায় কোন সুস্পষ্ট বিধান বিদ্যমান নেই। ঠিক তেমনি এ কাজ স্বাধীন বেপরোয়াভাবেও করা যাবে না। বরঞ্চ করতে হবে দ্বীনের মেজায প্রকৃতি ও শরীয়তের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের অধীন। করতে হবে কেতাব ও সুন্নাতের সুস্পষ্ট বিধান সামনে রেখে তারই ভিত্তিতেই।

এভাবে আইন প্রণয়নকে বলে 'কিয়াস'। কিয়াসী হুকুম আইন অকাট্য, অপরিবর্তনীয় এবং মতবিরোধের উর্ধের কোন শরীয়তি হুকুম হবে না। বরঞ্চ তার মধ্যে মতানৈক্য হতে পারে এবং তা পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে। মতানৈক্য এ জন্যে হতে পারে যে, এটা হচ্ছে মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা ও রায় প্রকাশের ব্যাপার, যার মধ্যে মতবিরোধ হওয়াটা স্বাভাবিক। পরিবর্তনের প্রয়োজন এ জন্যে হতে পারে যে, 'কিয়াস' এবং 'ইজতেহাদে' অবস্থা চাহিদাকে তার সামনে রাখা প্রয়োজন হয় এবং এ অবস্থা ও তার চাহিদা হর-হামেশা পরিবর্তন হতে থাকে। অবশ্যি এমন কিয়াস যার উপর গোটা মিল্লাতের আলেম ও মুজতাহিদগণ একমত হন, তা হয় অপরিবর্তনীয় এবং সেটা হয় চিরস্থায়ী আইনের মতোই। এই একমত হওয়াকে বলে 'ইজমা'।

এভাবে ইসলামী আইনের উৎস হয়ে পড়েছে কোরআন সুন্নাহ, কিয়াস এবং ইজমা।

আইন পরিষদ শাসন বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে। আইন প্রণয়নের উপরে শাসন বিভাগের প্রভাব প্রতিপত্তির কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আল্লাহ ও রসূল যা চান, আইন প্রণেতাগণ তাঁদের সাধ্যমত ঠিক তারই প্রতিনিধিত্ব করবেন। যদি আল্লাহর রসূলের সামনে অমুক বিষয় বা সমস্যা পেশ করা হতো, তাহলে আমাদের ধারণা মুতাবিক তার ফয়সালা বা জবাব এই হতো —এতটুকু জানা এবং বলা ছাড়া ইসলামের আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য আর কিছু হতে পারে না।

আইন পরিষদের মতে বিচার বিভাগও শাসন বিভাগ থেকে পুরোপুরি স্বাধীন থাকবে। কাজী এবং জজের নিয়োগ যদিও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সরকার করে থাকেন, তথাপি একজন কাজী নিযুক্ত হয়ে যাওয়ার পর তিনি

www.pathagar.com

আদালতের চেয়ারে বসে সরকারের নয়, বরঞ্চ খোদা ও রসূলের নায়েব (প্রতিনিধি) হয়ে পড়েন এবং তাঁর কাছে শরীয়তের হুকুম ব্যতীত আর কিছু লক্ষণীয় বিষয় থাকে না।

আইনের শক্তি অপরাজেয়। আইনের উর্ধে কেউ হতে পারে না। ধনী-গরীব ও সাধারণ-অসাধারণের এখানে কোনই স্বাতন্ত্রও নেই। অতি সম্মানিত ব্যক্তিও এমন কি ক্ষমতাসীন খলীফা পর্যন্ত আইনের অধীন, যেমন একজন অসহায় দরিদ্র আইনের অধীন। কোন ব্যাপারে যদি খলীফা বাদী অথবা বিবাদী হন, তাহলে তাঁকে আদালতে সেভাবেই এবং যে মর্যাদায় হাযীর হতে হবে, যেভাবে এবং যে মর্যাদায় হাযীর হয় অন্যান্য লোক। এভাবে কোন আইন যদি তাঁকে মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে, তাহলে তাঁকেও নির্দিষ্ট শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। নবী করীমের (সা) নিম্ন উক্তি আইনের উচ্চ ক্ষমতার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্তঃ

وَايْمُ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ـ(بخارى)

"যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করতো, তাহলে খোদার কসম আমি তারও হাত কেটে দিতাম।"–(বুখারী)

যেসব অপরাধে কোরআন ও সুন্নায় অকাট্যভাবে ও সুস্পষ্টরূপে শাস্তি নির্ধারিত আছে, তা কার্যকর করতে খলীফাও বাধা দিতে পারেন না। চুরির অপরাধ প্রমাণিত হবার পর হাত অবশ্যই কাটা হবে। ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা অথবা একশটি বেত্রাঘাত করতেই হবে। ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ-কারীকে আশিটি বেত্রাঘাত অবশ্যই খেতে হবে। হত্যাকারীকে যদি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ ক্ষমা না করে, তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতেই হবে। এখানে 'করুণা ভিক্ষার' দরখাস্ত বিবেচনা করার জন্যে না কোন গভর্নরের না কোন কর্তৃপক্ষের কোন হাত থাকবে।

ফৌজদারী অপরাধের শাস্তি এমন অবস্থায় কার্যকর করতে হবে যখন সমাজ এবং পরিবেশ প্রকৃতপক্ষে ইসলামী হবে এবং অবস্থা স্বাভাবিক (normal) থাকবে। যতোক্ষণ পর্যন্ত সমাজ বাস্তব ক্ষেত্রে ইসলামী রূপ ধারণ না করেছে অথবা অবস্থা এমন অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছে যে, অপরাধ প্রবণতা অতিমাত্রায় বেড়ে গিয়েছে, ততোক্ষণ শাস্তি মওকুফ থাকবে। যেমন দুর্ভিক্ষের সময় চোরের হাত কাটা দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা) মওকুফ রেখেছিলেন।

প্রত্যেকে বিনামূল্যে ন্যায় বিচার পাবে। কোর্টফিস নামক কোন বস্তু ইনসাফের বিনিময়ে গ্রহণ করা হবে না।

---

www.pathagar.com

দ্বীন ও রাজনীতি

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে যদিও একথা পরিষ্কার হয়েছে যে, ইসলাম মানব জীবনের এমন একটা পূর্ণাংগ ব্যবস্থা যার অংশ রাজনৈতিক ব্যবস্থা। কিন্তু একথা এখনো সুস্পষ্ট হয়নি যে, রাজনীতি দ্বীনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ইসলামী জীবন বিধানের কিরূপ অংশ। তার কি এবং কতখানি গুরুত্ব ? এবং সে গুরুত্ব কেন ? একথা এখানে সুস্পষ্ট হওয়া দরকার। কেননা যাকে আমরা রাজনীতি বলি, তা মানব জীবনের কম গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নয়। বিশেষ করে বর্তমানকালে তার ব্যবহার ও প্রভাব এতখানি বেড়ে গিয়েছে যে, জীবনের ছোট-খাটো ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং সমস্যাও পুরোপুরি তার আওতার বাইরে রয়ে যায়নি। অতএব এটা স্বাভাবিক যে, জীবনের ভাঙা-গড়ার উপরে রাজনীতির অসাধারণ প্রভাব আছে। যাঁর চোখ আছে, তিনি দেখতে পান যে, সকল দর্শন, মতবাদ, আকিদাহ বিশ্বাস স্তূপিকৃত হয়ে পড়ে আছে এবং রাজনীতি ও সরকারের প্রবল স্রোতধারা তাদের নিজস্ব বাঞ্ছিত দিকে সমাজকে ভেসে নিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে একথা জোর দিয়ে বার বার বলা হয়, দ্বীনের সাথে রাজনীতির কোন সম্পর্ক না হওয়াই উচিত। সম্পর্ক না হওয়াটা শুধু ন্যায়সঙ্গত তাই নয়। বরঞ্চ তার প্রয়োজনীয়তার বড়ো সুন্দর ও মুখরোচক যুক্তিপ্রমাণ তাঁরা পেশ করেন। নিজের কোন স্বার্থের নাম না নিয়ে বরঞ্চ দ্বীনেরই স্বার্থের নাম নিয়ে, তার পবিত্রতার দোহাই দিয়ে তাঁরা বলেন যে, দ্বীন মানুষকে খোদার সাথে মিলিত করার উপায় স্বরূপ। তা অত্যন্ত উচ্চ ও অতি পবিত্র জিনিস। অতএব তার মহত্ব ও পবিত্রতার অবমাননা করা হয়, যদি তাকে টেনে নামানো হয় এ দুনিয়ার আবিলতার মাঝখানে। যে জিনিস পবিত্র, তাকে পবিত্র স্থানে থেকে পবিত্র কাজ করার জন্যেই নির্দিষ্ট (রিজার্ভ) থাকতে দাও।

রাজনীতি ও রাজনীতিকদের এ মতবাদ আজ প্রায় সারা দুনিয়ায় স্বীকৃত। অতএব লোক সাধারণতঃ কোন ধর্ম সম্পর্কে একথা মানতে রাযী নয় যে, রাজনীতির সাথে তার তেমন কোন সম্পর্ক থাকতে পারে। অবশ্যি যদিও এর বেশী তারা কিছু বুঝতে পারে না।

অতপর আমরা একথাগুলো উপেক্ষা করতে পারতাম এবং বিতর্কে জড়িয়ে না পড়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারতাম যদি স্বয়ং ইসলামের অনুসারীগণ পর্যন্ত এ বিতর্কে গিয়ে না পৌঁছতো। উপরন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, যাঁরা শুধু নাম নেয়া মুসলমান নন, বরঞ্চ প্রকৃতই ইসলামের অনুসারী এবং দাবী করেন যে, ইসলামকে তাঁরা অপরের চোখ দিয়ে দেখেননি, নিজের চোখ দিয়ে দেখেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই একথা বলেন যে, ইসলামের সাথে রাজনীতি এবং দেশ

www.pathagar.com

শাসনের সম্পর্ক থাকলে বড়জোর তা দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থাৎ গৌণ। দ্বীনের মধ্যে তার কোন বুনিয়াদী গুরুত্ব নেই। ইসলামের জন্যে কোন রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব অপরিহার্য নয়। বরঞ্চ অপরিহার্য হওয়া তো দূরের কথা, বাঞ্ছিতও নয়। তার জন্যে চেষ্টা করাও ইসলামের অনুসারীদের কোন দ্বীনি দায়িত্ব নয়। তা হচ্ছে একটা পুরস্কার স্বরূপ যা আল্লাহ তায়ালা দ্বীনের একনিষ্ঠ সেবা করার কারণে ঈমানদারকে দান করে থাকেন। দেশ শাসন বা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ বাঞ্ছিত হলে তা হতে পারে ইসলামের অনুসারীদের—স্বয়ং ইসলামের নয়।

এসব কারণে ইসলাম সম্পর্কেও এ প্রশ্ন সময়ের একটা বড়ো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, রাজনীতির সাথে তার কি সম্পর্ক। অর্থাৎ রাজনীতি যদি তার একটা অংশ হয়, তাহলে কি ধরনের এবং কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজন হচ্ছে এই যে, এ প্রশ্নটিকে একটা স্থায়ী আলোচনার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে তার সুস্পষ্ট এবং যুক্তিপূর্ণ উত্তর লাভ করা। নতুবা বিরাট আশংকা রয়েছে যে, এর অভাবে ইসলামকে ভালো করে বুঝতে পারা যাবে না। মনের মধ্যে তার যে চিত্র প্রতিফলিত হবে তা যদি ভ্রান্ত না হয়, তো অবশ্যই অস্পষ্ট হবে।

এ প্রশ্নের গুরুত্ব এতখানি যে, সমুদয় সংশ্লিষ্ট দিকগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে এবং একটি করে ঐ সমুদয় বিষয় যাঁচাই পর্যালোচনা করতে হবে যার দ্বারা দ্বীনি ও রাজনীতির সম্পর্কের সঠিক ধারণাটা নির্ধারিত হয়।

ঈমান বিল্লাহ এবং রাজনীতির ধারণা

এ উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার গুণাবলীর দিকে নযর দিতে হবে। কেননা এ গুণাবলীই আসলে সেই উৎস যার থেকে দ্বীনের সমগ্র ধারণা এবং শরীয়তের যাবতীয় হুকুম বের হয়েছে। অতএব দ্বীনের সাথে রাজনীতির কি সম্পর্ক এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত করার অধিকার সবচেয়ে বেশী ঐ গুণাবলীরই আছে।

গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে (প্রথম খণ্ডে) বুনিয়াদি আকায়েদ মোটামুটি আমরা জেনেছি আল্লাহ তায়ালার বুনিয়াদি গুণাবলীর মধ্যে একটা হচ্ছে তাঁর বাদশাহী বা হুকুম শাসন করার গুণ। এ গুণটির প্রমাণ যে আয়াতগুলোতে পাওয়া যায়, তার কয়েকটি এই ঃ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ مَلِكِ النَّاسِ ۙ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ (الناس : ١-٣)

"বল আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রভুর কাছে, মানুষের বাদশাহর কাছে, মানুষের ইলাহর কাছে।"–(সূরা আন নাস ঃ ১-৩)

www.pathagar.com

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ـ(العراف : ٥٤)

"মনে রেখো, সৃষ্টি যেমন তাঁর, হুকুম শাসন করার অধিকারও তাঁর।"

–(সূরা আল আরাফ ঃ ৫৪)

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ـ(يوسف : ٤٠)

"হুকুম শাসন করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই।"

–(সূরা ইউসুফ ঃ ৪০)

এ আয়াতগুলো একথা বলে যে, আল্লাহ মানুষের 'রব' এবং 'ইলাহ', যার 'রবুবিয়ত' ও 'উলুহিয়াতের মধ্যে বাদশাহী ও হুকুম শাসন করার অধিকারও শামিল আছে। এর স্পষ্ট অর্থ এই যে, মানুষের প্রকৃত শাসনকর্তা এবং আইন প্রণেতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। এটা তাঁর সর্বস্বীকৃত ও গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলীর অন্যতম। যতোক্ষণ পর্যন্ত এ গুণাবলীর প্রতি মানুষের প্রত্যয় না জন্মাবে তাকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারী বলে স্বীকারই করা যাবে না।

এ যখন একটা স্থিরীকৃত সত্য যে মানুষের সত্যিকার শাসক, সর্বময় কর্তা ও আইন প্রণেতা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ নেই, তাহলে এ আসলে অন্যদিক দিয়ে একথারই নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে আল্লাহ তায়ালার অদ্বিতীয় সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতেই মানুষের রাজনৈতিক জীবন গড়ে তুলতে হবে। কেননা রাজনীতির সর্বপ্রথম সমস্যা এবং তার সবচেয়ে বুনিয়াদী দফা হলো যথাক্রমে হুকুম শাসনের সমস্যা এবং সার্বভৌমত্বের দফা। আল্লাহ তায়ালার হাকেমিয়াত অর্থাৎ হুকুম শাসনের গুণই এ সমস্যার সঠিক জবাব।

শরীয়তের নির্দেশাবলী ও রাজনৈতিক বিভাগ

আল্লাহ তায়ালার গুণাবলীর পরে এখন শরীয়তের হুকুমগুলোর সমষ্টিকে দেখুন। যেসব সমস্যাবলীর সাথে রাজনীতি জড়িত এবং যেগুলো মানুষের রাজনৈতিক জীবনের সমস্যা তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এই ঃ

একটা সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃংখলার প্রয়োজন কেন ? সমাজের সর্বময় ক্ষমতা কার হাতে ? মানুষের আসল পজিশন কি ? ব্যক্তির মৌলিক অধিকারসমূহ কি কি ? সরকারের এখতিয়ার কতখানি এবং কি ধরনের ? আইন রচনার অধিকার কার ? স্বয়ং আইনের পজিশন কি ? ইত্যাদি ?

এখন দেখা দরকার ও সুন্নাহ এ সমস্যাবলীর সম্পর্কে কোন আলোচনা করেছে কিনা এবং এসব ব্যাপারে প্রয়োজনীয় হেদায়েত দিয়েছে কিনা।

এ প্রশ্নের জবাব একটু আগে ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা অধ্যায়ে আপনারা পেয়েছেন। তার থেকে পুরোপুরি জানা গেছে যে, রাজনীতি যে যে

www.pathagar.com

সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে, ইসলাম তার প্রত্যেকটির আলোচনা করে সকল ব্যাপারে হেদায়েত দিয়েছে। অর্থাৎ জীবনের পরিপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা ইসলামের আছে।

দ্বীনের অনুসরণ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা

যেসব নির্দেশাবলী ও হেদায়েতসমূহের সমন্বয়ে ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত, তার মধ্যে বহু নির্দেশ এমন আছে যার বাস্তবায়ন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং একটা এখতিয়ার সম্পন্ন গভর্নমেন্ট ব্যতীত সম্ভব নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি নির্দেশের প্রতি লক্ষ্য করুন ঃ

যদি কাউকে কেউ হত্যা করে, তাহলে তোমাদের প্রয়োজন হবে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করা ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ط (البقرة : ١٧٨)

"তোমাদের জন্যে হত্যার প্রতিশোধ (গ্রহণ করার আইন) ফরয করে দেয়া হলো নিহতদের ব্যাপার।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৮)

চোরের হাত কেটে দাও ঃ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا ـ(المائدة : ٣٨)

ব্যভিচারীকে একশত বেত মার ঃ

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ـ(النور : ٢)

"ব্যভিচারী নারী-পুরুষের প্রত্যেককে একশত করে বেত মার।"

ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগকারীকে আশি বেত মার ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً ـ(النور : ٤)

"এবং যারা ব্যভিচারের অভিযোগ করবে সতীসাধ্বী নারীদের বিরুদ্ধে, অতপর (নিজেদের অভিযোগ প্রমাণের জন্যে) চারজন সাক্ষী পেশ করতে পারবে না, তাহলে এসব লোককে আশিটি বেত্রাঘাত কর।"

দ্বীনের দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই কর এবং কুফরী ফেৎনার মূলোচ্ছেদ কর ঃ

قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ط (البقرة : ١٩٣)

www.pathagar.com

"এবং তাদের সাথে (দ্বীনের দুশমন) লড়াই করতে থাক যতোক্ষণ না ফেৎনা দূর হয় এবং দ্বীন পুরোপুরি আল্লাহর হয়ে না যায়।"

এমন আল্লাহর আরও কত হুকুম নির্দেশ আছে যেগুলো কোন সরকার ব্যতীত কার্যকর যদি করতেও পারা যায়, তো যাবে আংশিকভাবে এবং অপূর্ণতার সাথে। পরিপূর্ণরূপে এবং বাঞ্ছিতরূপে সে সবের বাস্তবায়ন তখনই সম্ভব যখন রাজনীতি এবং দেশ শাসনের একটা ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা কায়েম থাকবে। যেমনঃ

শক্তি প্রয়োগে অনাচার দূর কর ঃ

مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ ـ(بخارى)

ন্যায়নীতি ও ইনসাফের সুদৃঢ় পতাকাবাহী হয়ে থাক ঃ

كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ ـ(النساء : ١٣٥)

খোদাহীন আদালতে কোন মুসলমান তার মামলা মোকদ্দমা নিতে পারে না।

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ـ(النساء : ٦٠)

লোকের মধ্যে বিচার ফয়সালা ঐসব আইন মুতাবিক কর যা আল্লাহ নাযিল করেছেন ঃ

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ـ(المائدة : ٤٨)

মুসলিম জাতির অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য হলো সারা দুনিয়ার সামনে দ্বীনের সাক্ষ্য পেশ করা ঃ

لِتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ـ(البقرة : ١٤٣)

প্রকাশ থাকে দ্বীনের অন্যান্য হুকুম পালন করার ন্যায় এ ধরনের হুকুম পালনও অপরিহার্য। কেননা অন্যান্য হুকুমগুলোর মতো এগুলোও শরীয়তের অংশ এবং অন্যান্য হুকুম পালন যেমন ঈমানের দাবী, তেমনি এগুলো পালনের জন্যেও ঈমান দাবী করে। আল্লাহর হুকুমগুলোর মধ্যে কিছু অংশ বেছে নেয়ার কোন স্বাধীনতা তিনি দেননি যেগুলো খুশী পরিত্যাগ করা হবে। তাঁর দাবী তো এই যে, যা কিছুই তাঁর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে তা সবই মেনে চলতে হবে।

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ـ(العراف : ٣)

www.pathagar.com

"তোমাদের প্রভুর কাছ থেকে যা কিছু নাযিল হয়েছে তা সবই মেনে চল।"–(আরাফ ঃ ৩)

যদি তোমরা মেনে না চল, বরঞ্চ আমার হুকুমগুলোর মধ্যে তোমাদের মনমতো পার্থক্য সৃষ্টি করলে, তাহলে এটা ঈমানের মনোভাব হলো না। হলো কুফরীর মনোভাব। যেহেতু ইয়াহুদীর বিষয়টিও আমার সামনে রয়েছে। ঠিক এ ধরনের কার্যপদ্ধতির জন্যে তাদেরকেও সুস্পষ্টভাবে এ অপরাধে অপরাধী করা হয়েছে ঃ

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ج (البقرة : ٨٥)

রাজনীতি দ্বীনের প্রয়োজনীয় অংশ

এখন নিম্নের বিষয়গুলো এক সাথে দেখুন। তাহলে ইসলাম ও রাজনীতি সম্পর্কিত প্রশ্নের পরিপূর্ণ মীমাংসা হয়ে যাবে।

যদি হুকুম শাসনের অধিকার আল্লাহ তায়ালার একটা বুনিয়াদি গুণ হয় এবং এ গুণের স্পষ্ট দাবী যদি এ হয় যে, মানুষের রাজনৈতিক জীবন আল্লাহর শরীক বিহীন শাসন ক্ষমতার ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে, তাহলে প্রমাণিত হলো যে, মানুষের রাজনৈতিক জীবন দ্বীনের গণ্ডির মধ্যেই শামিল এবং তাকে তার সীমার বাইরে কিছুতেই রাখা যেতে পারে না। যদি তা দ্বীনের সীমার বাইরে রাখা হয়, তাহলে আল্লাহর 'হাকেমিয়াত' (হুকুম শাসনের অধিকার) গুণটির উপর ঈমান রাখার দাবী অর্থহীন হয়ে যায়।

যদি শরীয়তের একটা অংশ রাজনৈতিক নির্দেশাবলী নিয়ে গঠিত হয় এবং ইসলামের যদি একটা পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ব্যবস্থা থাকে, তাহলে একথা সাক্ষ্য দেবে যে, প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ ইসলাম রাজনীতি ব্যতিরেকে কল্পনাই করা যায় না। যেমন ধরুন, কোন একটি স্বাস্থ্যবান এবং পূর্ণাঙ্গ দেহের ধারণা যদি করতে চান, তাহলে তার কোন একটা সুস্পষ্ট অঙ্গ, যথা মাথা, হাত অথবা পা তার থেকে পৃথক করে কিছুতেই করতে পারেন না।

যদি সরকারী ক্ষমতা ব্যতীত দ্বীনের অগণিত হুকুম মওকুফ হয়ে যায় এবং তার বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে পড়ে, অথচ শরীয়তের কোন অংশ পরিত্যাগ করা কুফরী মনোভাবেরই পরিচায়ক, ইসলামকে মেনে নেয়া হয় না, তাহলে তার পরিষ্কার অর্থ এই যে, রাজনীতি ইসলামের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। কেননা এর যে গুরুত্ব আছে তা তো অবধারিত। উপরন্তু তার উপরই অনান্য অনেক অংশ কোন না কোন দিক দিয়ে নির্ভরশীল।

www.pathagar.com

এসব দিক লক্ষ্য করে হযরত ওমর (রা) যে কথাগুলো বলেছিলেন তা একটা সুস্পষ্ট সত্যেরই অভিব্যক্তি ঃ

لَااِسْلَامَ اِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَلَا جَمَاعَةَ اِلَّا بِالْاِمَارَةِ ـ(جامع بيان العلم)

"জামায়াত ব্যতীত ইসলাম হতে পারে না এবং ইমারত (রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা) ব্যতীত জামায়াত কোন জামায়াত নয়।"

খ্যাতনামা তাবেয়ী হযরত কা'বুল আহবারের (র) কথা বলতে হয় ঃ

مثل الاسلام والسلطان والناس مثل القسطاط والعمود والاوتاد والقسطاط الاسلام والعمود السلطان والاوتاد الناس ولا يصلح بعضهما ببعض ـ(العقد الفريد حصه اول)

ইসলাম, সরকার এবং জনসাধারণ—এ তিনের দৃষ্টিতে যথাক্রমে শামিয়ানা, তার খাম্বা এবং খুঁটির ন্যায়। ইসলাম হচ্ছে শামিয়ানা, সরকার তার খাম্বা এবং জনসাধারণ হলো খুঁটি। এর যে কোন একটি অপর দু'টি ব্যতীত সঠিক অবস্থায় থাকতে পারে না।–(আল আকদুল ফরীদ ঃ ১ম খণ্ড)

মোটকথা রাজনীতি ও রাষ্ট্রশক্তির ধারণা থেকে যদি ইসলামকে পৃথক করে দেখা যায়, তাহলে ইসলাম আর সে ইসলাম থাকে না যা আল্লাহর প্রেরিত, কোরআনে বর্ণিত এবং রসূলে খোদার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ইসলামকে তার সঠিক রূপে দেখা তখনই সম্ভব, যখন তাকে রাষ্ট্রশক্তির সিংহাসনে সমাসীন করে দেখা যাবে।

এতদূর পর্যন্ত আলোচনার পর বাস্তব সত্যের আর একটা বিপ্লবী দিক সামনে আসছে। তাহচ্ছে এই যে, ইসলাম রাজনৈতিক ক্ষমতাকে দুনিয়ার নয়, বরঞ্চ আখেরাতের সম্পদ বলে অভিহিত করে। এটা অপছন্দনীয় এবং অবাঞ্ছিত নয়। বরঞ্চ ভোগ্য ও বাঞ্ছিত বলে ঘোষণা করে। ইসলাম এর প্রতি উদাসীন নয়। বরঞ্চ তার অনুসন্ধানকারী, তার জন্যে আগ্রহশীল ও স্পৃহান্বিত। তার কারণ এই যে, যতক্ষণ তার হাতে রাষ্ট্রশক্তি না থাকে, সে তার আপন উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে না।

ইসলামী রাষ্ট্র এবং মুসলিম রাষ্ট্র

এখানে 'ইসলামী রাষ্ট্র' ও 'মুসলিম রাষ্ট্রের' মধ্যকার নাজুক পার্থক্যটা ভালো করে বুঝে নেয়া দরকার।

এত এক সুস্পষ্ট সত্য যে ইসলাম দেহ ও প্রাণ বিশিষ্ট কোন জীব নয় যে, তার বাঞ্ছিত রাষ্ট্রশক্তি সে তার নিজের চেষ্টায় লাভ করবে। লাভ করার পর

www.pathagar.com

তাকে তার নিজের হাতে রাখবে। বরঞ্চ এসব কিছুই হবে তার অনুসারীদের চেষ্টায়। তারাই এ রাষ্ট্রশক্তি লাভের চেষ্টাও করবে এবং তারাই তা লাভ করার পর নিজের আয়ত্তে রাখবে। তারাই হবে ইসলামের সত্যিকার অনুসারী যাদের হাতে রাষ্ট্রশক্তি হবে অথবা তা লাভ করার জন্যে যারা অবিরাম চেষ্টা চরিত্র করে যাবে।

কিন্তু বিরাট পার্থক্য আছে ঐ রাষ্ট্রের মধ্যে যা মুসলমানগণ তাদের নিজেদের জন্যে চাইবে এবং ঐ রাষ্ট্রের মধ্যে যা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের জন্যেই হবে তাদের বাঞ্ছিত। প্রথম ধরনের রাষ্ট্র হবে 'মুসলিম রাষ্ট্র' এবং দ্বিতীয়টি হবে 'ইসলামী রাষ্ট্র'। আল্লাহর নিকটে প্রথমটি যদি দুনিয়া, তো দ্বিতীয়টি হবে দ্বীন। ওটা যদি হয় অমংগল, ত এটা হবে মংগল। ওটা যদি হয় ধ্বংসকর ত এটা হবে সৃজনশীল। এরই ভিত্তিতে একদিকে যেমন কোরআন আহলে ঈমানের প্রশংসা করে বলেছে ঃ

لَايُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ط (قصص : ٨٣)

"তারা দুনিয়াতে উচ্চক্ষমতা এবং ফাসাদ চায় না।"

তেমনি অপরদিকে তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছে ঃ

وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (ال عمران : ١٣٩)

"তোমরাই হবে উচ্চক্ষমতায় আসীন, যদি তোমরা মুমেন হও।"

এর মর্ম এই যে, যে উচ্চক্ষমতা লাভ নিজের জন্যে হয়, তা হয় প্রকৃত পাপাচার ও ডিক্টেটরশিপ (এক নায়কত্ব)। তা দুনিয়াকে অনাচারে অবিচারে পরিপূর্ণ করে। ঈমানদারগণ এ চিন্তাই করতে পারে না। কিন্তু উচ্চক্ষমতা ও উচ্চাসন লাভ যদি হয় ইসলামের জন্যে তাহলে তা আগাগোড়া হয় মংগল এবং রহমত। মুসলমান তাই চায় অন্তর থেকে। এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার এ দু'টি ধরন মূল্যমানের দিক দিয়ে একটি অপরটি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাদের বুনিয়াদী ধারণাও স্বতন্ত্র এবং পরিণাম ফলও স্বতন্ত্র। যদিও দেখতে দেখা যায় যে, দু'টিই রাষ্ট্রশক্তি এবং দু'টিই মুসলমানের হাতে। কিন্তু একটির পজিশন হচ্ছে একটি পবিত্র আমানত ও গুরু দায়িত্বের। এবং অপরটির পজিশন নিজস্ব মালিকানা ও স্বাধীন অধিকারের। প্রকাশ্য দৃষ্টি দিয়ে তার বাইরের আকৃতি দেখলে একজন প্রতারিত হতে পারে কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির কাছে তা গোপন থাকতে পারে না। তিনি অনুভব করবেন যে যদিও শাহীন এবং শকুনের উড়বার স্থান একই শূন্যমার্গ, কিন্তু উভয়ের দুনিয়া প্রকৃতপক্ষে একই হয় না।

www.pathagar.com

নবীদের শিক্ষা ও রাষ্ট্রশক্তি

দ্বীন ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন, যে গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা উপরের আলোচনায় সুস্পষ্ট হলো, তা এক মহান সত্য উদঘাটিত করে। তা হচ্ছে এই যে, নবীগণ যে মিশনের জন্যে আদিষ্ট হতেন, শেষ পর্যন্ত বাস্তব আকারে তা হতো একটা দ্বীনি এবং ইসলামী রাষ্ট্রেরই প্রতিষ্ঠা। কেননা রাষ্ট্রশক্তি ব্যতীত যেমন আজ ইসলাম থাকছে না এবং খোদার দ্বীনের পুরোপুরি আমলও করা যায় না, তেমনি যে কোন নবীর আমলেও তা হতে পারতো না। অতএব প্রত্যেক যুগের ইসলাম এবং খোদার দ্বীনের দৃষ্টি এদিকে অবশ্যই থাকা উচিত যাতে করে সমাজের শাসন ক্ষমতা তার নিজের হাতে আসতে পারে। অবশ্যি এটা অন্য কথা যে, এসব নবীদের মধ্যে অনেকেরই জন্যে পরিবেশ অনুকূল ছিল না এবং তার ফলে তাদের দাওয়াতী চেষ্টা চরিত্র শেষ পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। নবীদের দাওয়াতের ইতিহাস যা আমাদের সামনে রয়েছে, তার মধ্যে একথার উল্লেখ অবশ্যই পাওয়া যায় যে, তাঁদের অধিকাংশই তাঁদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করতে পারেননি। কিন্তু তাঁরা যে এটা চাইতেন না, তারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক নবীর দাওয়াতের বুনিয়াদী কথা নিঃসন্দেহে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু-ই' ছিল। 'লা হাকেমা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া আর কোন শাসক নেই) ছিল না। কিন্তু এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মর্মের মধ্যে 'লা হাকেমা ইল্লাল্লাহু'ও শামিল আছে। 'উলিহিয়াতের (ইলাহ হওয়ার) একটা অংশ 'হাকেমিয়াত'ও (হুকুম শাসনের ক্ষমতা থাকা) বটে। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। তার সাথে এও তার অর্থ যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন হাকেম বা শাসক নেই। 'ইলাহকে' শুধু হাকেম মনে করা অবশ্যি ভুল। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো ভুল হবে, 'ইলাহের' আসল মর্মের মধ্যে হাকেমিয়াতের ধারণা যে বিদ্যমান সে কথা না মানা। এরূপ এটাও একেবারে ঠিক যে, কোন নবী তাঁর দাওয়াত এভাবে দেননি, হে লোক সকল ! তোমরা আল্লাহর হুকুমত কায়েম কর। কারণ আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কেউ শাসক নেই। বরঞ্চ প্রত্যেক নবীর কথাই ছিল ঃ

اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ـ(العراف : ٥٩)

"তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। কারণ তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই।"–(সূরা আল আরাফ ঃ ৫৯)

কিন্তু কে বলতে পারে যে, এ শব্দগুলোর মর্মের মধ্যে পূর্বের শব্দগুলোর মর্মও নিহিত নেই ? কেননা, একথা তখনোই বলা যেতে পারতো, যদি 'এবাদত' শব্দের অর্থ পূজা-অর্চনা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকতো। কিন্তু* আসল

* একথার যুক্তি প্রমাণ ও আলোচনা সামনে এক অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।

www.pathagar.com

ব্যাপার যেহেতু তা নয় এবং 'এবাদতের মর্মের মধ্যে স্তব-স্তুতি এবং আসল আনুগত্য—উভয়ই শামিল আছে, সেহেতু দ্বীনের ঐসব হুকুম মেনে চলাকে কিছুতেই এবাদতের বাইরে মনে করা যেতে পারে না যা জীবনের বিভিন্ন বিভাগের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং যার শেষ চূড়ান্ত হচ্ছে রাজনীতি এবং রাষ্ট্রের নির্দেশাবলী। তারপর এসব 'হুকুম' মেনে চলা যেহেতু 'এবাদত' অতএব তার অর্থ এই হয় যে, নবীদের যে আসল দাওয়াত ছিল, তার মর্মের মধ্যে রাজনৈতিক আদেশ মেনে চলার ধারণাও অবশ্যই বিদ্যমান ছিল।

হাঁ, এখানে একটা প্রশ্ন অবশ্যি করা যেতে পারে। তা হচ্ছে এই যে, যেসব নবীদের দাওয়াতের পরিচয় কোরআন আমাদেরকে দিয়েছে তার অধিকাংশের মধ্যে কোন রাজনৈতিক আদেশ মোটেই ছিল না। তা শুধু ঈমানিয়াত, আখলাকিয়াত, (নৈতিকতা) এবং এক আল্লাহর এবাদতের মধ্যেই নিহিত ছিল বলে দেখা যায়। এর থেকে জানা যায় যে, (اَعْبُدُوْا) শব্দের আসল আদেশ স্তবস্তুতি পর্যন্তই সীমিত ছিল। কেননা যখন কতিপয় নবী 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এর দাওয়াত দিয়ে এবং (اَعْبُدُوا اللّٰهَ) এর দীক্ষা দিয়ে তওহীদ এবং এবাদতের মর্মের একটা ব্যাখ্যা নিজেদের আমল, দাওয়াতী আলোচনা এবং কর্মতৎপরতার ভেতর দিয়ে করে দেন, তখন একেই এসব পরিভাষার প্রকৃত ব্যাখ্যা মনে করা উচিত। তার মর্মসীমার মধ্যে রাজনীতিও যদি অনিবার্যরূপে প্রবিষ্ট থাকতো, তাহলে নবীদের মুখে তার কোন না কোন উল্লেখ থাকতো। তাঁরা তাদের অনুসারীদেরকে রাজনৈতিক আদেশ না দিয়ে থাকলেও নিদেন পক্ষে এতটা অবশ্যি বলে দিতেন যে, নিজেদের সর্বশেষ মনযিলে মকসুদ (গন্তব্যস্থল) হচ্ছে একটা ইসলামী হুকুমত কায়েম করা পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, যদি রাজনীতি অর্থের দিক দিয়ে প্রত্যেক নবীর দ্বীনের অপরিহার্য অংশ হতো, তাহলে (اَعْبُدُوا اللّٰهَ) শব্দের সেই ব্যাখ্যা কেন করা হলো না যার দ্বারা দ্বীনের মধ্যে রাজনীতির এ পজিশন সুস্পষ্ট হয়ে উঠতো?

কিন্তু এ প্রশ্ন দু'টি সর্বস্বীকৃত সত্যকে উপেক্ষা করারই অনিবার্য ফল। তাহলো ঃ

একটি এই যে, শরীয়তের কোন অংশই তার স্বাভাবিক সময় ও বাস্তব প্রয়োজনের পূর্বে নাযিল হয় না। আল্লাহ তায়ালা জীবনের কোন ব্যাপারে তাঁর হেদায়েত তখনই পাঠান, যখন অবস্থা তার দাবী করতে থাকে এবং লোক তার উপর আমল করার মতো পজিশনে আসে। শরীয়তী নির্দেশ পাঠাবার এ একটা স্থায়ী নীতি, যার প্রয়োজন ও তাৎপর্য একেবারে সুস্পষ্ট।

দ্বিতীয়টি এই যে, এই নীতির ভিত্তিতে শরীয়তের যে যে অংশ পরবর্তীকালে নাযিল হতে থাকে, তার পরবর্তীকালে নাযিল হওয়ার অর্থ কখনই এটা নয় যে,

www.pathagar.com

তা দ্বীনের মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের কোন গুরুত্ব রাখে। এভাবে এ নীতির অধীনে জীবনের কোন কোন ব্যাপারে যদি হেদায়েত নাযিল হয়ে না-ই থাকে, তাহলে তার অর্থ কখনোই এ নয় যে, আসলে তার কোন গুরুত্ব নেই এবং কোন অবস্থাতেই তার শরীয়তের অংশ হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

এ নীতিগুলো বুঝার জন্যে কিছু দৃষ্টান্ত দেয়া যাক ঃ

নবী (সা) জিহাদকে 'ইসলামের শীর্ষস্থান' এবং 'সর্বোৎকৃষ্ট আমল' বলেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় হিজরীর পূর্বে 'সর্বোৎকৃষ্ট আমলের' শুধু যে আদেশই করা হয়নি, তা নয়। বরঞ্চ তা ছিল নিষিদ্ধ। এরূপ কেন করা হলো ? তা শুধু এ কারণে যে, জিহাদের জন্যে যেসব শর্তাবলী ও পরিবেশের প্রয়োজন ছিল, দ্বিতীয় হিজরীর পূর্বে তা পাওয়া যায়নি। অনুরূপ সুদ খাওয়া নিকৃষ্টতম গুনাহগুলোর অন্যতম। এ কাজকে দুনিয়াতে আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে অভিহিত করা হয়েছে। (اَحْزَبُ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ) এবং আখেরাতের কাফেরদের শাস্তির ন্যায় শাস্তি দেয়া হবে বলা হয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তা একেবারে শেষের দিকে (নবম হিজরীতে) হারাম করা হয়েছে। এর পূর্বে পর্যন্ত তা জায়েয ছিল। কারণ শুধু এই ছিল যে, এর পূর্ব সমাজ এ হুকুমের উপরে সঠিকভাবে আমল করার পজিশনে ছিল না। এ অবস্থায় যদি উপরোক্ত হুকুম নাযিল করা হতো, তাহলে সারা দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে যেতো। মদের ব্যাপারটিও ঠিক অনুরূপ। 'পাপসমূহের মূল' হওয়া সত্ত্বেও ঐ একই কারণে সূরা মায়েদা নাযিল হওয়া পর্যন্ত তা হারাম করা হয়নি।

উপরোক্ত উভয় নীতিগত তত্ত্ব সুস্পষ্ট করার জন্যে এ কয়েকটি দৃষ্টান্ত যথেষ্ট।

যদি এ দু'টি স্বীকৃতি ও নীতিগত তত্ত্বকে সামনে রাখা যায় তাহলে আলোচ্য প্রশ্নের সকল গ্রন্থি আপনা আপনি উন্মোচিত হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা কোন কোন নবীর প্রতি রাজনৈতিক হুকুম নাযিল করে না থাকেন এবং তাদের অনুসারীদেরকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েম করার হেদায়েত দিয়ে থাকেন, তো তার কারণ কিছুতেই এ নয় যে, ওসব জিনিসের আসলেই কোন গুরুত্ব ছিল না এবং এ ধরনের হুকুমগুলো তাঁদের শরীয়তের প্রয়োজনীয় অংশ ছিল না। বরঞ্চ কারণ ছিল এই যে, ও অবস্থারই সৃষ্টি হয়নি, যার মধ্যে রাজনীতি ও রাষ্ট্র সম্পর্কে কথা বলা যেতে পারতো। একথা তো আমরা সকলে জানি যে, রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করার জন্যে কিছু বিষয় একেবারে অপরিহার্য। যেমন ব্যক্তিবর্গের একটা পর্যাপ্ত সংখ্যা, দলীয় শৃঙ্খলা ও ঐক্য এবং একটা স্বাধীন পরিবেশ। অতএব যদি কোন নবীর দাওয়াত এ পর্যায়ে পৌঁছে না

www.pathagar.com

থাকে, যার মধ্যে যে এ সমুদয় বিষয় পাওয়া যেতো, তাহলে তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদেরকে কিভাবে ও কি জন্যে রাজনৈতিক হুকুম দেয়া যেতো ? শরীয়তি পার্লমেন্টে তো এসব হুকুমের পজিশন হচ্ছে যাদের ছাদের প্লাষ্টারের মতো। যতোক্ষণ পর্যন্ত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করে তার উপরে দেয়াল গাঁথা না হয়েছে এবং এসব দেয়ালের উপরে ছাদের বর্গা ইত্যাদি বসিয়ে তার উপরে ইট বিছানো না হয়েছে, প্লাষ্টার করার আদেশ কিছুতেই দেয়া যেতে পারে না। তাহলে এসব কাজ সমাধা হওয়ার পূর্বে ছাদের প্লাষ্টার করার আদেশ না দেয়া অথবা কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ না করা কি একথাই প্রমাণ করে যে, পরিকল্পিত দালানটির কাঠামো ছাদ বিহীন এবং তার তৈরী নকশায় ছাদ শামিল নেই ? সত্যি কথা বলতে কি, একমাত্র পাগলই এমন ধারণা করতে পারে। নতুবা প্রত্যেক সুস্থ্য মস্তিষ্ক ব্যক্তিই এ দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে যে, ঐ দালানের তৈরী নকশায় ছাদ অবশ্যই শামিল আছে। কিন্তু যেহেতু ও সময় এখনো আসেনি, যখন ছাদের জন্যে কিছু বলা বা করা যেতে পারে, সে জন্যে তা তৈরী করা যায়নি। যদি সে পর্যায়ের অবস্থা এসে যেতো, তাহলে অবশ্যই তা বানানো হতো। এ অবস্থাও নবীদের দাওয়াতের ছিল যে, যে দাওয়াত প্রতিকূল অবস্থার জন্যে ঐ পর্যায়ে পৌছার পূর্বেই থেমে গিয়েছিল যা রাজনৈতিক ব্যবস্থা কায়েমের জন্যে অপরিহার্য ছিল, তার শিক্ষার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই রাজনীতি এবং রাষ্ট্রগঠনের কথা শামিল হতে পারেনি। এ জন্যে তাঁদের অনুসারীগণ পর্যন্ত এর বাস্তব দাবীগুলোর মধ্যে হুকুমতে এলাহী কায়েম করার কথা শামিল করা যায়নি। তার এ অর্থ কখনোই নয় যে, রাষ্ট্রগঠন তার আপন মর্যাদার দিক দিয়ে এসব দাবীর মধ্যে সন্নিবেশিত হওয়ার যোগ্য ছিল না। বরঞ্চ এ ছিল অবস্থার প্রতিকূলতা যার জন্যে তা শামিল করা যায়নি। পক্ষান্তরে যে দাওয়াত এ পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল, তার মধ্যে রাজনৈতিক নির্দেশ দিতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করা হয়নি। আর যখন এমন হয়েছিল, তখন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক আইন জারী ও ঠিক ঐভাবে (اعبدوا الله)-এর হুকুমের বাস্তব দাবীসমূহের মধ্যে শামিল হয়ে গেল যেভাবে অন্যান্য অংশগুলো এর পূর্বে শামিল করা হয়েছিল। এখন এ হুকুমতে এলাহী কায়েম করা এবং ও সব রাজনৈতিক আইন মেনে চলাও আল্লাহর বন্দেগীর হক আদায় করার জন্যে তেমনি জরুরী হয়ে পড়লো যেমন জরুরী ছিল শরীয়তের অন্য কোন হুকুম মেনে চলা।

ইসলামী দাওয়াত ও রাষ্ট্রশক্তি

ইসলাম সম্পর্কে সারা বিশ্ব একথা জানে যে, তার দাওয়াত এমন এক দাওয়াত যা রাষ্ট্রশক্তির পর্যায়ে পৌছতে সক্ষম হয়েছিল। অতএব তার শরীয়তের

www.pathagar.com

মধ্যে রাজনৈতিক আইন-কানুন এবং নেতৃত্ব ও হুকুমতের নির্দেশাবলী বিস্তারিত ভাবে বিদ্যমান রয়েছে। খোদার রসূল (সা) শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতাই লাভ করেননি এবং যথারীতি একটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই কায়েম করেননি। বরঞ্চ নিজের জীবনে তিনি স্বয়ং এ ব্যবস্থার সর্বাধিনায়ক ছিলেন। তারপরে তাঁর সর্বোত্তম সহকর্মীগণও সে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে দ্বীনের একটা বিরাট কর্তব্য মনে করে কায়েম রেখেছেন এবং তা পরিচালনা করেছেন। অতএব অন্ততঃ পক্ষে ইসলামের ব্যাপারে তো কিছুতেই একথা বলা যায় না যে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা (اعبدوا اللّٰه)-এর আসল হুকুমের বহির্ভূত এবং রাজনীতি দ্বীনের কোন অংশ নয়। এটাও একটা কারণ এবং গুরুত্বপূর্ণ কারণ, যার জন্যে ইসলাম সত্যিকার অর্থে এবং সকল দিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা হওয়ার মর্যাদা লাভ করে। শাহ অলিউল্লাহ (র) শরীয়তের মর্যাদা বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ

اعلم انّ اتم الشرائع واكمل النواميس هو الشرع الذى يؤمر فيه بالجهاد

"জেনে রাখ, সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত এবং সবচেয়ে পরিপূর্ণ হেদায়েতে এলাহী ঐ শরীয়ত যার মধ্যে জিহাদের আদেশ করা হয়েছে।"

–(হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ)

'যার মধ্যে জিহাদের আদেশ করা হয়েছে' কথার অর্থ এই যে, সে শরীয়তে রাজনীতি ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা থাকবে। কেননা একটা আইনানুগ রাষ্ট্র ব্যবস্থা ব্যতীত জিহাদ হতেই পারে না।

ইসলাম শুধুমাত্র এমন একটি শরীয়তই নয় যার মধ্যে জিহাদের হুকুম দেয়া হয়েছে। বরঞ্চ এমন শরীয়ত যা জিহাদকে ঈমানের কষ্টিপাথর বলে ঘোষণা করেছে। এ শরীয়ত যেমন চিরন্তনের জন্যে, তেমন জিহাদের সম্পর্কেও তার সাথে চিরন্তনের জন্যে অবিচ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ রয়েছে। অতএব এ এক অনস্বীকার্য প্রমাণ যে ইসলামের ধারণা থেকে রাজনীতি ও রাষ্ট্রের ধারণা কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যদি বিচ্ছিন্ন করা হয়, তাহলে তা এমন এক বিকলাংগ ইসলাম হয়ে পড়বে যা কিছুতেই (اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ)-এর বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারবে না।

---

www.pathagar.com

শরীয়ত ও এবাদত

এবাদতের মর্যাদা

মযহাব আসলে 'খোদার বন্দেগীর' দ্বিতীয় নাম। তার প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্দেশ্য এছাড়া আর কিছু নয় যে, তা আল্লাহ তায়ালার এবাদতের পদ্ধতি বলে দেবে। কারণ এ বন্দেগী ও এবাদত এমন এক জিনিস, যা মানুষের আত্মাকে পবিত্রতা ও উচ্চমর্যাদা দান করে। এভাবে তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ লাভের যোগ্য বানিয়ে দেয়। এ ধারণাই মযহাব সম্পর্কে পোষণ করা হয়ে থাকে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ এমন ধারণা যার বিরুদ্ধে কিছু বলা সহজ কথা নয়। কোরআন মজিদ তাকে একটা সুস্পষ্ট সত্য বলে ঘোষণা করে এবং বিশদভাবে একথা বলে যে, কোন নবীর দাওয়াত এছাড়া আর কিছুই ছিল না।

اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ج (نحل : ٣٦)

"আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত (খোদাদ্রোহী শক্তি) থেকে দূরে থাক।"–(সূরা আন নাহল ঃ ২৬)

ঠিক অবিকল এ দাওয়াতই ইসলামের গয়গম্বর মুহাম্মদ (সা) পেশ করেছিলেন। তাঁর দাওয়াতের শব্দগুলো ছিল ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ (البقرة : ٢١)

"হে দুনিয়ার মানুষ ! তোমাদের প্রভুর এবাদত কর।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ২১)

শুধু এতটুকুই নয়। বরঞ্চ তার চেয়ে বেশী পরিষ্কার করে বলেছেন যে, মানুষকে তো একমাত্র এ কাজের জন্যেই করা হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ٥ (ذاريات : ٥٦)

"জ্বীন এবং মানবজাতিকে শুধু এ জন্যে পয়দা করা হয়েছে যে তারা আমার এবাদত করবে।"–(আয যারিয়াত ঃ ৫৬)

অর্থাৎ এবাদতই সেই জিনিস যার জন্যে মানুষকে পয়দা করা হয়েছে এবং নবীগণকে পাঠানো হয়েছে। এ দু'টো জিনিস ওতপ্রোত জড়িত। যে কাজের জন্যে মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছিল, নবীগণের আগমনের উদ্দেশ্য ও তা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং শিক্ষাদীক্ষা দেয়া ছাড়া আর কি হতে পারে ?

www.pathagar.com

এবাদতের মর্ম

এবাদতের এ পজিশন ও গুরুত্বের কথা শুনতেই মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে যে এবাদত এবং ঐ ইসলামের মধ্যে সম্পর্কটা কি যা পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলাম তার পরিপূর্ণ ও প্রকৃত অর্থের দিক দিয়ে বন্দেগী এবং জীবনের একটা পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা যা আকায়েদ থেকে আরম্ভ করে স্তবস্তুতি পর্যন্ত এবং স্তবস্তুতি থেকে মানুষের পার্থিব জীবনের এক একটি বিভাগ পর্যন্ত প্রত্যেক বিষয়কে তার পরিসীমার মধ্যে আবেষ্টন করে রেখেছে এবং সকল বিষয়ে বিস্তারিত হেদায়েত দিয়েছে। তাহলে কি এ সমুদয় হেদায়েতের সমষ্টির এবং তার এক একটি অংশের অনুসরণকে এবাদত বলা হবে অথবা এ শব্দটি শুধু তার কোন বিশিষ্ট অংশে অথবা কতিপয় বিশিষ্ট অংশের জন্যে নির্দিষ্ট হবে?

প্রত্যেক বিচক্ষণ ব্যক্তি অনুভব করবেন যে, এ প্রশ্নটির বাস্তব গুরুত্ব বড় অসাধারণ রকমের। কারণ ইসলামী শরীয়তের হুকুমগুলোর সাথে তার প্রত্যক্ষ ও গভীর সম্পর্ক আছে। এর যা জবাব হবে, এসব হুকুম মেনে চলার উপরে তার বিরাট প্রভাব পড়বে। এবাদতের অর্থ সাধারণতঃ যা মনে করা হয়, তাই যদি ইসলামের নিকটেও হয়, তাহলে আকায়েদ, স্তবস্তুতি ও ঈমানের গুণাবলী সম্পর্কিত অংশগুলোর আনুগত্য অন্যান্য অংশের আনুগত্যের তুলনায় অধিক পবিত্রতা ও শ্রদ্ধার সাথে করা উচিত। কিন্তু অবস্থা যদি অনুরূপ হয়, তাহলে এ পার্থক্যকরণ ঠিক হবে না এবং প্রয়োজন হবে ইসলামী শরীয়ত মেনে চলাকে এবাদত মনে করা এবং প্রতিটি অংশের আনুগত্য একই প্রকার মনোযোগ, অভিরুচি ও প্রেরণা সহকারে করতে হবে। এমতাবস্থায়, এবদাতের সঠিক মর্ম অনুধাবন করা ইসলামকে সঠিকভাবে মেনে চলার জন্যে অত্যন্ত জরুরী। অন্যথায় মানুষ দুই প্রান্তিক সীমার (Two extremes) শিকার হওয়া থেকে নিজকে রক্ষা করতে পারবে না। যাকে সে এবাদত মনে করবে, মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে তার প্রতি সে মনোনিবেশ করে বসে থাকবে। পক্ষান্তরে যাকে সে এবাদতের কাজ মনে করবে না, তাকে সে অবশ্যই পেছনে ফেলে রাখবে।

এবাদত শব্দটি যখন কেতাব সুন্নাহর ভাষায় বলা হয়, তখন তার মর্ম কি হয় এবং তার সীমা কতদূর পর্যন্ত বিস্তারিত—একথা জানার জন্যে আমাদেরকে প্রতিটি ঐ জিনিসের প্রতি লক্ষ্য করতে হবে যা এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ এবং এবাদতের মর্ম নির্ধারণে সনদের মর্যাদা রাখে, যাতে করে এ গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি সমস্যার সঠিকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা যায়। অতপর যে সমাধানই পাওয়া যাবে, তা সকল দিক দিয়ে হবে সন্তোষজনক।

এবাদত আভিধানিক অর্থের আলোকে

সর্বপ্রথম অভিধানের সাহায্য নেয়া যাক। শব্দার্থ জানার এ সাধারণ উপায় অভিধান প্রণেতাগণ এ শব্দের অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

www.pathagar.com

العبادة غاية التذلل ـ(مفردات امام راغب)

"এবাদতের অর্থ হলো নিজকে অত্যন্ত হেয় ও হীন মনে করা এবং আত্মসমর্পণ করা।"–(ইমাম রাগেবের মুফরেদাত)

العبادة الطاعة ـ(لسان العرب)

"এবাদতের অর্থ আনুগত্য।"–(লেসানুল আরব)

عبد الله عبادة ثالة له ـ(لسان العرب)

"সে আল্লাহর এবাদত করলো–এর অর্থ সে আল্লাহর স্তবস্তুতি পূজা অর্চনা করলো।"–(লেসানুল আরব)

এভাবে আবদ্ বলা হয় গোলামকে এবং তরিকে মুয়াববাদ (طريق معبد) বলা হয় ঐ পথকে যা অধিক যাতায়াতের ফলে পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে অনুকূল ও সুগম হয়েছে।

প্রকাশ্যঃ এবাদতের এ অর্থগুলো একটি অপরটি থেকে পৃথক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পৃথক নয়। বরঞ্চ তাদের মধ্যে গভীর সাদৃশ্য সামঞ্জস্য বিদ্যমান। এবাদতের বুনিয়াদী মর্ম তাই যা প্রথমে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ কারো সামনে পুরোপুরি মস্তক অবনত করা, হেয় হয়ে থাকা, নিজকে বিলীন করে দেয়া, আত্মসমর্পণ করা। কিন্তু একথা ঠিক যে হীনতার সাথে মস্তক অবনত করা আনুগত্যের রূপ ধারণ করে। অতএব এবাদতের অর্থ ন্যায়সঙ্গতভাবে আনুগত্যও হলো। অতপর যে সত্তার সামনে মানুষ নিজকে সমর্পণ করে অতিমাত্রায় হীনতা ও দীনতা প্রকাশ করে এবং তার দৃষ্টিতে যে সত্তা দয়া অনুকম্পা ও আনুগত্যের অধিকার, এ দীনতা স্বীকার দ্বারা সে সত্তার নিয়ামতের স্বীকৃতি দান করা হয়। অতপর যে হীনতা ও দীনতা স্বীকারে নিয়ামতের স্বীকৃতি দান করা হলো তা অবশেষে স্তবস্তুতির রূপ ধারণ করলো। অতএব স্বাভাবিকভাবে এবাদতের অর্থ স্তবস্তুতিও হলো।

এ আভিধানিক ব্যাখ্যা যদি সামনে রাখা যায়, তাহলে এবাদতের দ্বীনি এবং ইসলামী ধারণা বহুলাংশে উপলব্ধি করা যাবে। তার থেকে সহজেই অনুমান করা যাবে যে, এবাদতে এলাহীর আসল মর্ম কি এবং আল্লাহর এবাদতকারী কাকে বলা হয়। এবাদতের আসল এবং বুনিয়াদী মর্ম যদি চরমভাবে নতি স্বীকার করা হয়, তাহলে এটা একথারই প্রমাণ যে, এ নতি স্বীকার এবাদতে এলাহীরও আসল মর্ম। অতপর যেহেতু আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রকৃত শাসকও এবং মংগলাকাংখীও, সেজন্যেও বিবেক একথা স্বীকার করতে পারে

www.pathagar.com

না যে, তার চরম নতি স্বীকার শুধু নতি স্বীকারেই সীমিত থাকবে, আনুগত্যের এবং অতপর স্তবস্তুতির রূপ ধারণ করবে না। এটা ঠিক তেমনি অসম্ভব যেমন অসম্ভব আগুন জ্বলে ওঠা অথচ তার থেকে উত্তাপ বের না হওয়া।

মোটকথা আল্লাহ তায়ালার সামনে মানুষের নতি স্বীকারের যে স্বাভাবিক ধরন হতে পারে, তার নির্যাৎ দাবী এই যে এবাদতে এলাহীর মধ্যে তিনটি জিনিসই বিদ্যামন থাকবে ঃ চরম হীনতা ও দীনতা স্বীকার, আনুগত্য এবং স্তবস্তুতি।

দ্বীনের সর্বস্বীকৃত মতবাদের আলোকে

এ হলো আভিধানিক অর্থগত সিদ্ধান্ত। এখন দেখতে হবে যে, এ ব্যাপারে দ্বীনি কিয়াস কি বলে এবং দ্বীনের বুনিয়াদী ও সর্বস্বীকৃত সত্যের আলোকে এবাদতের মর্ম কি হতে পারে।

আল্লাহর নবীগণ মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে আগমন করেছিলেন। এ এক সর্বস্বীকৃত সত্য। এ মহান ব্যক্তিগণ আগমন করে মানুষকে যে বিষয়ে হেদায়েত দান করলেন, তা সুস্পষ্টভাবে এই ছিল (যেমন উপরে বলা হয়েছে) আল্লাহর এবাদত কর। আর এটাই হওয়া উচিত ছিল। মানুষকে যদি এবাদতের জন্যেই পয়দা করা হয়ে থাকে তাহলে কি করে এটা সম্ভব যে, যে পয়গামসহ নবীগণকে পাঠানো হয়েছে তা তার থেকে সামান্যতমও পৃথক হবে ?

প্রকৃত ঘটনা যখন এই যে, নবীগণের মিশন ছিল শুধু এবাদতকারী বানানো, তখন পরিষ্কার অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে, এসব মহান ব্যক্তিগণ নবী হিসাবে যা কিছু বলেছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন তা সবকিছুই এবাদতের কাজ ছিল। তাঁদের কোন একটি শব্দ কোন উচ্চবাচ্য এবাদত ব্যতীত আর কিছু ছিল না। কেননা একজন সাধারণ লোকের কাছ থেকেও এ ধরনের কোন বাহুল্য কাজ তো অপ্রত্যাশিত মনে করা হবে যে, তাকে একটা বিশেষ কাজের জন্যে নিযুক্ত করা হলো, কিন্তু সে তার কর্তব্য করতে গিয়ে কিছু আজেবাজে কাজ করতে লাগলো। তাহলে একজন নবী সম্পর্কে এ ধরনের কোন আচরণ অনুমান করা কি করে করা যেতে পারে ? নবী তিনিই হন, যিনি আপাদমস্তক আনুগত্যের একটা মূর্ত প্রতীক। তাঁর দৃষ্টি সবসময়ে তাঁর উপরে আরোপিত দায়িত্বের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে। তিনি আল্লাহর বান্দাহদেরকে সেসব কিছুই বলেন এবং শিক্ষা দেন, যার জন্যে তার প্রভুর পক্ষ থেকে তাঁকে হুকুম করা হয়েছে তিনি নিজের পক্ষ থেকে একটি শব্দও বলেন না। তাহলে এ কেমন করে সম্ভব যে নিজের উপরে আরোপিত দায়িত্ব মাথায় নিয়ে অন্য কোন বিষয়ে তিনি মাথা ঘামাবেন এবং মানুষকে এমন বিষয়ের শিক্ষা দেবেন, তাঁর মিশনের

www.pathagar.com

সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই ? অতএব স্বীকার করতে হবে যে নবী দ্বীনের বুনিয়াদী আকায়েদ থেকে আরম্ভ করে তামাদ্দুন ও সমাজের ছোট-খাটো ব্যাপার সম্পর্কেও যা কিছু বলেন এবং শিক্ষা দেন, তা কোন প্রকারভেদ অথবা কোন ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে সবই এবাদতের কাজ। যেসব হুকুম মেনে চলার মধ্যে আল্লাহর স্তবস্তুতির দীক্ষা দেয়া হয়, তা যেমন এবাদত, ঠিক তেমনি স্তবস্তুতি ও সব হুকুম মেনে চলাও এবাদত যার মধ্যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন যাপন করার পদ্ধতি ও আইন কানুন বলে দেয়া হয়েছে। অন্য কথায় গোটা দ্বীন এবং গোটা শরীয়ত অনুসরণ করাই হলো সেই এবাদত যার জন্যে মানুষকে পয়দা করা হয়েছে এবং নবীগণকে পাঠানো হয়েছে। এই হুকুম সমষ্টির মধ্যে যতবেশী হুকুম মানুষ সঠিকভাবে মেনে চলবে, তার এবাদত ততবেশী পূর্ণত্ব লাভ করবে। আর এ হুকুম মেনে চলা যত অপূর্ণ হবে, তার এবাদতের মধ্যে ততটা অপূর্ণতা রয়ে যাবে।

দ্বীনের বুনিয়াদী গূঢ়তত্ত্ব ও সর্বস্বীকৃত মূলনীতির আলোকে আর এক দিক দিয়েও এবাদতের এ মর্ম নির্ধারিত হয়। কোরআন যেমন মানুষের জন্মের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র এবাদত বলে, তেমনি স্বাভাবিকভাবেই তার জন্মগত পজিশনও শুধু আল্লাহর আবদ (বান্দাহ) হিসেবেই নির্ধারিত হয়। কোরআনের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় একটা সর্বস্বীকৃত ও সুস্পষ্ট সত্য হিসাবে বার বার বলা হয়েছে যে, মানুষের পজিশন বা স্থান প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একজন আবদ এবং দাসের। চিন্তা করুন আবদ এবং গোলামের বাস্তব জীবন কি হয় ? এক ব্যক্তি যখন কোন গোলাম খরিদ করে, তখন সে তার চব্বিশ ঘন্টারই গোলাম হয়। সে তার মনিবের ইশারা ইংগীতে যা কিছু করে, তার সবটুকুই গোলামী এবং বন্দেগীর কাজ বলা হয়। অথচ এ মনিব তার প্রকৃত প্রভু ও মনিব নয়। সে তার যে জিনিসটুকু খরিদ করে, তা হচ্ছে তার শক্তি, গোটা অস্তিত্ব নয়। কিন্তু মানুষ আল্লাহর সেই গোলাম যার এক একটি অংগ-প্রত্যংগের তিনি মালিক। মানুষ তাঁর পরিপূর্ণ মালিকানাধীন এবং জন্মগত গোলাম। একজন ঈমান ও ইসলাম গ্রহণকারী মানুষ আল্লাহর শুধু জন্মগত গোলামই নয়, বরঞ্চ স্বীকৃতি-দানকারী গোলামও। কোরআন করীম এ বিষয়ে পরিষ্কার ভাষায় বলেছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ـ

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুমেনদের কাছ থেকে তাদের জান এবং মাল খরিদ করে নিয়েছেন। তার বিনিময়ে তাদের জন্যে রয়েছে বেহেশত।"

–(সূরা আত তওবা ঃ ১১১)

অতএব একজন মুসলমান আল্লাহর এমন আবদ যার শুধু কর্মক্ষমতাই নয়, বরঞ্চ তার সবকিছুই আল্লাহর। সে তাঁর পয়দা করা এবং খরিদ করাও। এ

www.pathagar.com

বেচা-কেনার ব্যাপারটাও তার (বান্দার) স্বাধীন মরযী মুতাবেকই হয়েছে। এমন জন্মগত গোলাম এবং নিজের গোটা অস্তিত্ব বিক্রয়কারী এমন আবদে কামেল (পরিপূর্ণ গোলাম) তার মনিবের আনুগত্যের জন্যে যা কিছুই করবে তার কোন অংশও তার গোলামীসুলভ স্থান থেকে পৃথক ও সম্পর্কহীন কি করে হতে পারে? গোলামী ব্যতীত তার আর কোন পজিশনই যখন নেই, তখন অনিবার্য-রূপে তার এক একটি ক্রিয়া গোলামী এবং এবাদতের ক্রিয়াই হবে। এমন কি যদি সে পানাহার, নিদ্রা ও জাগরণের কাজ তার আপন প্রভুর নির্দেশে করে, যেমন তার করা উচিত, তাহলে তার এসব কাজ এবাদতের কাজ হবে।

বলতে গেলে এসব যুক্তি কিয়াসও ইসতেস্বাৎসুলভ। এ এমন এক মতবাদ যা গ্রহণ করা হয়েছে কিছু ভূমিকা সুবিন্যস্ত করে এবং দ্বীনের কিছু বুনিয়াদী গূঢ়তত্ত্ব সামনে রেখে। কিন্তু ন্যায়সংগত কথা এই যে, এসব যুক্তি কিয়াস হওয়া সত্ত্বেও কোরআন সুন্নাহর অকাট্য যুক্তিসমূহ থেকে শুধু এক ধাপ কম। বিতর্কের জন্যে সহজে তাকে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে না।

কোরআনের ব্যবহার পদ্ধতির আলোকে

অবশেষে এবাদত শব্দটির জন্যে কোরআনের ব্যবহার পদ্ধতি দেখা উচিত। কোরআন এ শব্দকে যেসব অর্থে ব্যবহার করেছে, স্বীকার করতে হবে, তাই তার প্রকৃত অর্থ। যদি এ ব্যবস্থার পদ্ধতির যাঁচাই পর্যালোচনা আমাদেরকে কোন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়ে দেয়, আলবৎ সেটা হবে সবচেয়ে বেশী মযবুত ও সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত।

কোরআন হাকিমের মধ্যে এ শব্দটিকে বিভিন্ন ক্রিয়াপদের আকারে, অসংখ্যস্থানে ব্যবহার করা হয়েছে। তার মধ্যে কিছু নির্বাচিত আয়াতের আলোচনা করা যাক।

مَاتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ ـ(يوسف : ٤٠)

"তোমরা তো আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছু (অমূলক) নামের এবাদত করছ, যা তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা নিজেরাই নির্ধারিত করে নিয়েছে।"–(সূরা ইউসুফ ঃ ৪০)

قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِيْنَ٥ (شعراء : ٧١)

"তারা বলল, আমরা আমাদের প্রতিমাগুলোর এবাদত করি এবং সারাদিন ধরে তাদের সঙ্গে বসে বসে কাটাই।"–(সূরা আশ শুয়ারা ঃ ৭১)

এ আয়াতগুলো প্রকাশ করছে যে, কারো সাথে স্তবস্তুতির আচরণ করার নাম এবাদত। কেননা, মুশরিকগণ তাদের প্রতিমাগুলোর সাথে যা কিছু করে

www.pathagar.com

তাকে এ আয়াতগুলোতে এবাদত বলা হয়েছে। সত্য কথা বলতে কি, মুশরিকদের সম্পর্ক তাদের প্রতিমাদের সঙ্গে পূজাপাঠ, অর্চনা ও স্তবস্তুতি নিয়েই হয়ে থাকে। এর অতিরিক্ত অথবা অন্য কোন কিছু নিয়ে নয়।

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى

"যারা তাগুতের এবাদত থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, তাদের জন্যে সুসংবাদ।"–(সূরা আয যুমার ঃ ১৭)

... مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ط (المائدة : ٦٠)

"যাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাৎ করেছেন, যাদের উপর তাঁর গযব পড়েছে এবং তাদের মধ্যে কতজনকে তিনি বাঁদর এবং শূকরে পরিণত করেছেন এবং যারা তাগুতের এবাদত করেছে।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৬০)

এ আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, কাউকে আনুগত্যের অধিকারী মনে করে নিজের ইচ্ছা ও মরযীতে তার আদেশ মেনে চলার অর্থ তার এবাদত করা। কেননা এ আয়াতগুলোতে সে কর্মপদ্ধতিকে এবাদত বলা হয়েছে, যার দ্বারা তাগুতের আনুগত্য করা হয়। তাগুতের শাব্দিক অর্থ সীমালংঘনকারী ও অতি বিদ্রোহী। কোরআনের পরিভাষায় তাগুতের অর্থ প্রত্যেক ঐ সৃষ্টি যে আল্লাহর বন্দেগী থেকে বের হয়ে গেছে অথবা বের হয়ে যাবার উপায় হয়েছে। এভাবে শয়তান এবং প্রতিমা যদি তাগুত হয় তাহলে সেই শাসক সর্দার জাতীয় লীডার এবং ধর্মীয় নেতাও তাগুত, যারা খোদাভীতি থেকে দূরে সরে থাকে এবং আল্লাহর হেদায়েতের মুখাপেক্ষী হয় না। তারা নিজের মত ও মরযীকে আইন মনে করে। এসব খোদাবিমুখদের সাথে তাদের অনুসারীদের আচরণ এই হয় যে, অনুসারীগণ তাদেরকে শ্রদ্ধেয় মনে করে, তাদেরকে নির্বিবাদে আইন তৈরী করার এবং সিদ্ধান্ত করার যোগ্য মনে করে। অতপর আন্তরিক আগ্রহ সহকারে তাদের আনুগত্য করে। তাদের এ বাস্তব আচরণকে যদি কোরআন তাগুতের এবাদত বলে অভিহিত করে থাকে, তাহলে একথা প্রমাণিত হয় যে, কোরআনের নিকটে সে আনুগত্যও এবাদাত বলে পরিগণিত, যদি তার পশ্চাতে স্বাধীন ইচ্ছা এবং মনের সন্তুষ্টি থাকে এবং আনুগত্য যদি করা হয় কাউকে নির্বিবাদে আনুগত্যের যোগ্য মনে করে।

... فَقَالُوْا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ (مومنون : ٤٧)

"অতপর (ফেরাউনের লোকজন) বললো, আমরা কি আমাদেরই মতো দু'টি লোকের কথা মেনে নেব। অথচ তাদের কওম আমাদের আবেদ (এবাদতকারী)।"–(সূরা মুমেনুন ঃ ৪৭)

www.pathagar.com

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ ط (شعراء : ٢٢)

(হযরত মূসা (আ) ফেরাউনের কথাবার্তা শুনে বললেন, এই বুঝি তোমার সেই অনুগ্রহ যা তুমি আমার উপরে করছ ? (আর তা হচ্ছে এই) যে তুমি বনি ইসরাঈলকে তোমার আবদ বানিয়ে রেখেছ ?"

এ আয়াতগুলোতে একথার প্রমাণ আছে যে, শুধুমাত্র ঐ আনুগত্যই এবাদত নয় যার এ তিনটি শর্ত পাওয়া যায়, যথা ইচ্ছা, মনের আগ্রহ এবং যার আনুগত্য করা হয় তাকে নিরংকুশ আনুগত্যের যোগ্য মনে করা। বরঞ্চ ঐ আনুগত্যও এবাদত হবে, যা মরযীর বিরুদ্ধে করা হয়, কিন্তু ইচ্ছা সহকারে ও কোন প্রকার টু শব্দ না করে এবং যার আনুগত্য করা হয় সে নিজকে কোন উর্ধতন আইনের অধীন মনে করে না। কেননা এ আয়াতগুলোতে বনি ইসরাঈলের গোলামীকে কিবতিদের এবাদত করা বলা হয়েছে। এটা ঠিক যে বনি ইসরাঈল যদিও নিজেদের গোলামীর এ মর্মন্তুদ অবস্থার বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করতো না, কিন্তু তা খুশীর সাথেও বরদাশত করতো না। শুধুমাত্র শাসক শক্তির রুদ্র মূর্তি এবং নিজেদের অসহায়তার জন্যেই তারা ফেরাউনী নির্দেশাবলীর পায়ের তলায় নিষ্পিষ্ট হচ্ছিল। এর থেকে জানা গেল যে, কোন স্বাধীন শাসন ক্ষমতার দাবীদার শক্তির নীরব আনুগত্যও তার এবাদত যদিও তার মধ্যে মনের সন্তুষ্টি থাকে না কিন্তু অনুভূতি ও ইচ্ছা থাকে।

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ أَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ج إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

"হে আদম সন্তান ! আমি তোমাদেরকে কি এ কথার তাকীদ করিনি যে, তোমরা শয়তানের এবাদত করো না ? কারণ নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।"–(সূরা ইয়াসীন ঃ ৬০)

يٰٓأَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ط (مريم : ٤٤)

"ইবরাহীম বললেন, আব্বা শয়তানের এবাদত করবেন না।"

এ আয়াতগুলো থেকে এবাদতের আর এক রূপ প্রকাশ হয়ে পড়লো। অর্থাৎ কারো অনুভূতিবিহীন পূর্ণ আনুগত্যও এবাদত। কেননা আয়াতগুলোতে শয়তানের এবাদত করার কথা বলা হয়েছে। অথচ যাদের সম্পর্কে এরূপ বলা হয়েছে তাদের ব্যাপারে এছাড়া আর কিছু ছিল না যে তাদের আকিদাহ আমল ছিল শয়তানের বাঞ্ছিত। নতুবা প্রকাশ্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে, তাদের মধ্যে কেউই শয়তানকে সেজদা করতো না। কেউ তার কাছে দোয়ার জন্যে হাত প্রসারিত করতো না, কেউ তাকে নিজের মনিব অথবা নেতা বলে স্বীকার করতো না ও শ্রদ্ধা করতো না। বরঞ্চ সারা দুনিয়ার ন্যায় তারাও তাকে একটা

www.pathagar.com

মূর্ত অনিষ্ট বলেই বিশ্বাস করতো। তার প্রতি তাদের ঘৃণা ও অভিশাপ ছাড়া আর কিছু ছিল না। এসব সত্ত্বেও বলা হয়েছে যে, এসব লোক শয়তানের এবাদত করে। তাহলে তার পরিষ্কার অর্থ এই যে, যদিও অনুসরণ ও আনুগত্যের ইচ্ছা না থাকে এমন কি নিজের আকিদাহ আমল সম্পর্কে এ অনুভূতি না থাকে যে, এ কাজ অমুকের হুকুম ও মরযী মুতাবেক হচ্ছে, তথাপি ঘটনা যদি এই হয়, তাহলে এ অনুভূত আনুগত্যকে কোরআন এবাদতই বলে।

কোরআন হাকিমের এ চার প্রকার ব্যবহার পদ্ধতির যে কোন একটি সম্পর্কেও একথা বলা ঠিক হবে না যে, তার মধ্যে রূপকের প্রকাশ ভংগী অবলম্বন করা হয়েছে। কারণ এ এমন এক দাবী করা হবে যার সপক্ষে কোন যুক্তি প্রমাণ পেশ করা যাবে না। অভিধান থেকেও না, কোরআন থেকেও না এবং সহীহ হাদীস থেকেও না। এ দাবী তখনই করা যেতো যখন কোরআন মজিদের অসংখ্য আয়াতের কোন একটি থেকে এ মর্ম বের হয় যে, এবাদত শুধু স্তবস্তুতির নাম, স্তবস্তুতির কাজ ব্যতীত অন্য এবাদত নয়। কিন্তু এরূপ কোন আয়াতের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। অবশ্যি এমন অনেক আয়াত আছে যেখানে এবাদত শব্দটির দ্বারা স্তবস্তুতির অর্থ নেয়া হয়েছে। যার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপরে দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিরাট পার্থক্য রয়েছে একথার মধ্যে যে এবাদতের অর্থ শুধু স্তবস্তুতি এবং একথার মধ্যে যে এবাদতের অর্থ স্তবস্তুতিও।

এবাদত শব্দের এ আভিধানিক পর্যালোচনা উপরে করা হলো তা যদি সামনে রাখা হয়, তাহলে মনে হবে যে, এবাদতের এ চারটি রূপ যা কোরআন অধ্যয়নে একটু আগে জানা গেল, এবাদতের চারটি স্থায়ী এবং পরস্পর সম্পর্কহীন নয়। বরঞ্চ প্রকৃতপক্ষে একই ব্যাপক অর্থের চারটি বিভিন্ন দিক অথবা বিভিন্ন অংশ। স্তবস্তুতিও এবাদত এবং সচেতন ও অচেতনভাবে আনুগত্য করাও এবাদত। এবাদত ব্যতীত অন্য কিছু এর একটিও নয়। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন একটি পরিপূর্ণ এবাদত নয়। যদি তার মধ্যে কোন একটি একাই পরিপূর্ণ এবাদত হতো, তাহলে অন্যটিকে এবাদত বলার কোনই কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কোরআন মজিদ যদি স্তব-স্তুতিকে এবাদত বলে থাকে, তো সংগে সংগে আনুগত্যের উপরে বর্ণিত তিনটি প্রকারকেও এবাদতই বলেছে। তার অর্থ এই যে, তার নিকটে এবাদতের অর্থ পূর্ণ তখনই হয়, যখন স্তবস্তুতি এবং আনুগত্য উভয়ই একত্রে মিলিত হয়।

আলোচনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার তিনটি দিক আমাদের সামনে রয়েছে ঃ আভিধানিক কিয়াস, দ্বীনের স্বীকৃত সত্যাবলীর দাবীসমূহ এবং কোরআনের ব্যবহার পদ্ধতি। এ তিনটিই এ বিষয়ের উপর একমত যে, এবাদত একটা

www.pathagar.com

ব্যাপক পরিভাষা যা পূজা-পার্বণ-স্তবস্তুতি ও আনুগত্য উভয়কে পরিবেষ্টনকারী। তার ব্যাপকতা সেই সীমারেখার পূর্বে শেষ হয়ে যায় না যে পর্যন্ত শরীয়তের দাবী ও আদেশসমূহ গিয়ে পৌছে।

কোরআনের বাঞ্ছিত এবাদত

আল্লাহ তায়ালা তাঁর যে এবাদতকে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করেছেন, এবং যা শিক্ষা-দীক্ষা ও হেদায়েতের জন্যে নবীর আগমন হতে থাকে তা কোন আধ-খেঁচড়া অথবা দুই বা এক-তৃতীয়াংশ ধরনের কোন এবাদত হতে পারে না। তা শুধু স্তবস্তুতি পর্যন্ত সীমিত হতে পারে না এবং না আনুগত্য পর্যন্ত। এ হচ্ছে বিবেকের সুস্পষ্ট দাবী এবং কোরআনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। বিবেকের দাবী এটা এ জন্যে যে, যে খোদা মানুষের স্রষ্টা ও মালিক জীবিকা দাতা দয়ালু, শাসক ও আনুগত্যের একক হকদার এবং বলতে গেলে যিনি সবকিছুই সকল প্রকার এবাদতের হকদার হওয়াটাই তাঁর জন্যে বাঞ্ছনীয়।

কোরআনের সিদ্ধান্ত এই যে, তার আয়াতসমূহ তার অনুসারীদের নিকটে মহান আল্লাহ তায়ালার স্তবস্তুতি ও আনুগত্য উভয়ের একই ধরনের দাবী করে। সে যেখানে একথা বলে, একমাত্র আল্লাহকেই সেজদা কর, তাঁরই নামের পবিত্রতা বর্ণনা কর, তাঁরই কাছে দোয়া প্রার্থনা কর, তাঁরই মহত্ব ও গৌরব ঘোষণা কর, সাহায্যের জন্যে তাঁকেই ডাকো, তাঁরই কাছে নিয়ামতের স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতা জানাও, সেখানে সে একথাও বলে এবং বার বার বলে, আল্লাহকেই একমাত্র নিরংকুশ আনুগত্যের অধিকারী ও শাসক বলে স্বীকার কর। তাঁকেই শাশ্বত আইন প্রণেতা বলে স্বীকার কর। তাঁরই সব হুকুম মেনে চলো। তাঁরই আইন মুতাবেক বিচার ফয়সালা কর। তাঁরই বানানো রীতি পদ্ধতিকে জীবনের রীতিপদ্ধতি বানাও। তাঁরই হালালকে হালাল এবং তাঁরই হারামকে হারাম মনে কর।

অতএব যে এবাদতকে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলা হয়েছে যা প্রত্যেক নবীর দাওয়াতের তালিকা শীর্ষে স্থান পেয়েছে, যার আদেশ কোরআন করেছে—নিশ্চিত অবশ্যম্ভাবীরূপে সে এবাদতের ব্যাপক ও পরিপূর্ণ অর্থ তাই হবে যার মধ্যে স্তবস্তুতি ও আনুগত্য উভয় বস্তুই সন্নিবেশিত আছে।

এ বিষয়ে অধিকতর নিশ্চয়তা ও সন্তোষ বিধানের জন্যে আর এক দিক দিয়ে ভেবে দেখুন। কোরআন মজিদ মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিম্নের শব্দগুলোর দ্বারাও বর্ণনা করেছে ঃ

www.pathagar.com

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ط (الملك : ٢)

"আল্লাহ তায়ালা জীবন মৃত্যুর পালা এ জন্যে সৃষ্টি করেছেন যাতে করে তিনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি আমলের দিক দিয়ে অতি উৎকৃষ্ট।"–(সূরা মুলক ঃ ২)

আর একস্থানে এভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ط (البقرة : ٣٠)

"স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি দুনিয়ায় আমার প্রতিনিধি বানাতে চাই।"

জানা গেল যে, মানুষের স্রষ্টা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলতে গিয়ে যেখানে এবাদতের মর্ম অবলম্বন করেছেন, সেখানে উৎকৃষ্ট আমল এবং প্রতিনিধিত্বের (খেলাফতের) মর্মও অবলম্বন করেছেন। তার অর্থ হলো এই যে, যদিও এসব পৃথক পৃথক অর্থে বলা হয়েছে, তবুও কিন্তু তার উদ্দেশ্য পৃথক পৃথক নয়। বরঞ্চ একই বিষয়ে প্রকাশ ও বর্ণনার জন্যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি পৃথক পৃথক শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। অন্য কথায় কোরআনের নিকটে আল্লাহর এবাদত, আমলের উৎকৃষ্টতা এবং খেলাফত আসলে একই উদ্দেশ্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যা। অতএব এবাদতের এমন কোন অর্থ গ্রহণ করা যায় না, যার মধ্যে উৎকৃষ্ট আমল খেলাফতের ধারণা পুরোপুরি খাপ খায় না এবং তার এ মর্মই গ্রহণ করা প্রয়োজন যার মধ্যে এ ধারণার প্রাণশক্তি (Spirit) অবশ্যই বিদ্যমান থাকে। একথা ঠিক যে উৎকৃষ্ট আমল শুধু স্তবস্তুতি অথবা আনুগত্যকে বলা যেতে পারে না। ঠিক তদনুরূপে অবস্থা খেলাফতেরও। যদিও তার প্রকাশ্য মর্ম স্তবস্তুতির তুলনায় আনুগত্যের অধিক নিকটবর্তী তবুও স্তবস্তুতি তার মর্ম বহির্ভূত কিছুতেই হয় না। এভাবে এ দু'টি ব্যাখ্যা দ্বারা এ সত্য অধিকতর সুস্পষ্ট হচ্ছে যে, ইসলামে এবাদতে এলাহীর যে মর্ম তা স্তবস্তুতি ও আনুগত্য উভয়কেই বুঝায় এবং শরীয়তের এমন কোন বিষয় নেই যা তার পরিসীমার বাইরে।

সূক্ষ্মদর্শী আলেমগণের নিকটে এ সত্য গোপন ছিল না এবং থাকতেও পারে না। শায়খুল ইসলাম ইমাম তাইমিয়াকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمْ আয়াতটিতে যে এবাদতের হুকুম করা হয়েছে তার মর্ম ও উদ্দেশ্য কি। তিনি এ বিষয়ের উপরে এক বিস্তারিত ভাষণ দান করলেন। বললেন ঃ

www.pathagar.com

এবাদত একটি ব্যাপক শব্দ। তার ভেতরে সে সমুদয় যাহেরী ও বাতেনী আমল এবং কথা সন্নিবেশিত আছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন। যা তার সন্তুষ্টি লাভের কারণ হয়। যেমন, নামায, যাকাত, রোযা, আত্মীয়ের প্রতি সৎ আচরণ, বিশ্বাসভাজনতা, মা-বাপের আনুগত্য অঙ্গীকার পূরণ, ভালো কাজের আদেশ মন্দ কাজে নিষেধ, আল্লাহর পথে জিহাদ, এতীম-মিসকীন ও অধীনদের সাথে (এ অধীন মানুষ হোক অথবা পশু) ভালো আচরণ, দোয়া, আল্লাহর যিকর, কোরআন তেলাওয়াত এবং এ ধরনের যাবতীয় নেক আমল এবাদতের অংশসমূহ।

এরূপ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের মহব্বত, আল্লাহর অনুগ্রহের আশা, তাঁর শাস্তির ভয়, খোদাভীতি, তাঁর প্রতি ধাবমান হওয়া, নিষ্ঠা ঐকান্তিক, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, তাওয়াক্কাল, আল্লাহতে আত্মসমর্পণ, তার সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ প্রভৃতি ভালো গুণাবলী এবাদতের মধ্যে শামিল।-(আল আবুদিয়ত)

আর এক স্থানে তিনি বলেন ঃ

কেতাব ও সুন্নাহর এসব সুস্পষ্ট উক্তি থেকে একদিকে যেমন এ সত্য প্রকট হয়ে পড়ে যে, দাসত্ব-আনুগত্য (আবদিয়ত) কোন সৃষ্টির মহত্ব এবং তার সৌভাগ্যের চরম পূর্ণতা আনয়ন করে, তখন অপরদিকে এ বিষয়ও উদঘাটিত হয়ে পড়ে যে, দ্বীন তার যাবতীয় অংশাবলীসহ এবাদতের মধ্যে সন্নিবেশিত সমগ্র আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ) আল্লাহর দ্বীন শিক্ষা দেবার জন্যে আগমন করেছিলেন। একথা কোরআনে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। প্রত্যেক নবী লোকদেরকে সম্বোধন করে فَاعْبُدُوْهُ (তাঁরই এবাদত কর) বলে হেদায়েত করেছেন এর থেকে জানা যায় যে, দ্বীন ও এবাদত একই লক্ষ্য পথে দু'টি ব্যাখ্যা।-(আল আবুদিয়ত)

এসব বিশধ বিবরণের পর আর সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না যে, এবাদত সমগ্র দ্বীনের আনুগত্যের নাম। দ্বীনের কোন একটি অংশ সম্পর্কে তা স্তবস্তুতি ধরনের হোক অথবা আনুগত্য ধরনের—একথা বলা যেতে পারে না যে, এটা এবাদতের কাজ নয়। সত্য কথা এই যে, শরীয়তের এক একটি হুকুম পালন করার পরই এবাদতের গুরুদায়িত্ব পূরণ হতে পারে। এ এমন একক বস্তু যা আমরা ভাগ করতে পারি না, ঠিক যেমন মানব অস্তিত্ব একটা পরিপূর্ণ একক বা ইউনিট যা বিভিন্ন অংশে ভাগ করা যায় না।

আরকানে ইসলামের বিশিষ্ট গুরুত্ব

মানবদেহে যেমন একটি ইউনিট হওয়া সত্ত্বেও হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক, হাত-পা, নাক, কান প্রভৃতি বিভিন্ন অংশে সমন্বিত এবং সকল অংশের গুরুত্ব সকল দিক

www.pathagar.com

দিয়ে এক রকম নয়, তেমনি এবাদতও অসংখ্য অংশে সমন্বিত এবং তাদের গুরুত্বও সকল দিক দিয়ে একই রকম নয়। তাদের মধ্যে কিছু এমন আছে যাদের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে অন্যগুলোর তুলনায়। যেমন দিল ও দেমাগ (হৃৎপিণ্ড মস্তিষ্ক) প্রধান অংগ অংশগুলোর অন্যান্য অংগের তুলনায় বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এবাদতের এ বিশিষ্ট অংশগুলো হলো ঐসব যাকে ইসলামের ব্যবহারিক আরকান বলা হয়, যথা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি।

যেসব কারণে এগুলোর বিশেষ গুরুত্ব তাহলো ঃ

এ সবের সম্পর্ক সরাসরি মাবুদ বরহকের (আল্লাহর) সাথে। আসলে এ সবের দৃষ্টিও অন্য কোন দিকে নিবদ্ধ হয় না। এসব এবাদত আনজাম দেয়ার সময় একদিকে থাকে মানুষ, আর অন্যদিকে থাকে তার প্রভু আল্লাহ। অন্যান্য দ্বীনি আমলের অবস্থা অন্যরূপ তা যদিও আল্লাহর হুকুম পালনের জন্যে এবং তারই সন্তুষ্টিলাভের জন্যে করা হয়, তথাপি মাঝখানে কোন না কোন মখলুক (সৃষ্টি) বিদ্যমান থাকে এবং তাকে ব্যতীত সে আমল করাই যেতে পারে না। মানুষ যখন নামায পড়ে, তখন তার সম্পর্ক সরাসির আল্লাহর সংগে হয়। কিন্তু যখন সে বিচারকের আসনে বসে শরীয়তের আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত করে, তখন ব্যাপার পূর্বের মতো হয় না। এমন হয় না যে, সে সরাসরি তার প্রভুর সাথে মশগুল রয়েছে এবং মাঝখানে আর কেউ নাই। বরঞ্চ হয় এই যে, তার মন যদিও একদিকে শরীয়তের হুকুম পালন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সন্ধানে মশগুল থাকে, অন্য দিকে কতিপয় মানুষের সংগেও সে জড়িত হয়ে পড়ে। তার কান ও তার চক্ষু তাদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

এসব কাজের ধরন ও আকৃতিটাই এবাদতের ধারণার সাথে নির্দিষ্ট রূপে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ যে আকার ও ভংগীমায় তা সম্পাদন করা হয়, তার উপরেও বিশেষ এবাদতের গভীর ছাপ বিদ্যমান থাকে। তা দেখা মাত্রই মনে এ বিশ্বাস জন্মে যে, এ হচ্ছে এবাদতের কাজ। এ যে অন্য কোন কাজ এমন ধারণাই জন্মে না। কিন্তু অন্যান্য আমলগুলোর পজিশন তা নয়। কারণ ওসবের বাহ্যিক আবরণের উপর এবাদতের ধারণার কোন ছাপ পড়ে না। সেসব দেখার পর হয়তো কদাচিৎ মনে এ ধারণা হয় যে এটা এবাদতের কাজ।

মানুষের মধ্যে দাসত্বের প্রাণশক্তি এবং এবাদতের প্রেরণা সৃষ্টি করার ব্যাপারে এসব আমলের একটি বিশেষ স্থান আছে যা অন্যান্য দ্বীনি আমল-সমূহের নেই। যদিও প্রতিটি নেকি এবং প্রতিটি এবাদত ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য এই যে, এর দ্বারা মনের পবিত্রতা লাভ হয়, বন্দেগীর প্রেরণা সঞ্জীবিত হয় এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বর্ধিত হয়। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় যতবেশী পরিমাণে, যত সহজে এবং যত সরাসরি এ মনের সম্পদ এসব জিনিসের দ্বারা অর্জন করা

www.pathagar.com

যায়, তা অন্য কোন জিনিসের দ্বারা করা যায় না। বরঞ্চ অধিকতর সঠিক কথা এই যে, এ বিশিষ্ট এবাদতগুলো ব্যতীত মানুষের আভ্যন্তরীণ শক্তি সৃষ্টিই হতে পারে না যা সমুদয় এবাদতের পুরোপুরি দায়িত্ব পালনের জন্যে প্রয়োজন হয়। এ কারণে এগুলোকে ফরযে আইন (فرض عين) বলা হয়েছে। এসব পালন করার আদব-কায়দা নিয়ম-নীতি বিশদভাবে বলে দেয়া হয়েছে। যাতে করে প্রত্যেকের কাছে শক্তির এ উৎস বিদ্যমান থাকে যার থেকে যাবতীয় প্রকৃত এবাদতের এক একটি অংশ সম্পাদন করার শক্তি অবিরাম পৌছতে থাকে।

মোটকথা এ কয়টি জিনিস যদিও এবাদতেরই অংশসমূহ, কিন্তু এমন অংশ যার উপরে অবশিষ্ট সমুদয় অংশগুলো নির্ভরশীল।

এ পার্থক্য বৈশিষ্ট্য সামনে রেখে যদি চিন্তা করা যায়, তাহলে স্পষ্টই মনে হবে যে, এবাদতের পরিভাষার সাথে শরীয়তের এ চারটি হুকুমের (নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ) বিশিষ্ট সামঞ্জস্য আছে। আর বিশিষ্ট সামঞ্জস্য তাদেরকে এ বিশিষ্ট অধিকার দান করে যে, পরিভাষার সর্বপ্রথম প্রয়োগ যেন তাদের উপর করা হয়। যখন এ শব্দ কানে পৌছে, তখন মন সর্বপ্রথম তাদের দিকেই যেন ধাবিত হয়। এমনকি এ চারটি কাজের বিশিষ্ট গুরুত্ব প্রকাশের প্রয়োজন যখন হয়, তখন তাদেরকে যেন সোজা কথায় এবাদত নামে অভিহিত করা হয় . এবং এবাদত শব্দ উচ্চারণের দ্বারা এ আমলগুলোকেই বুঝানো হয়। বস্তুতঃ এরূপ করাও হয়েছে। আর এটা কোন ভ্রান্ত এবং অজ্ঞানতাপ্রসূত ব্যাখ্যার ধরন নয়। বরঞ্চ নাম ও পরিচিতির জন্যে যে প্রচলিত পন্থা আছে এবং যেভাবে সমূদয় আসমানী মযহাব প্রকৃতপক্ষে ইসলাম হওয়া সত্ত্বেও 'ইসলাম' নাম শুধুমাত্র সর্বশেষ দ্বীনের রাখা হয়েছে। সেই প্রচলিত পন্থা এখানেও অবলম্বন করা হয়েছে। অর্থাৎ যদিও শরীয়তের একটি হুকুম মেনে চলা এবাদতেরই কাজ তথাপি নামায, যাকাত রোযা ও হজ্জের বৈশিষ্ট্যের কারণে এ জিনিসগুলোকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এবাদত বলা হয়। যার উদ্দেশ্য এ শুধু এই এবং এই হওয়া উচিত যে, এভাবে এবাদতের সামগ্রিক ব্যবস্থার মধ্যে এসব জিনিসের একটা বিশিষ্ট স্থান ও বিশিষ্ট গুরুত্ব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ উদ্দেশ্য কখনো নয় এবং হওয়াও উচিত নয় যে, এবাদত বলতে শুধু এগুলোকেই বুঝাবে এবং অবশিষ্ট গোটা দ্বীন এবাদতের ধারণার বাইরে।

ভ্রান্ত ধারণা ও কারণসমূহ

'এবাদত' শব্দের প্রকৃত ও ব্যাপক মর্ম সম্পর্কে বিবেকের সুস্পষ্ট দাবী, কালামে এলাহীর অকাট্য সাক্ষ্য এবং সূক্ষ্মদর্শী আলেমগণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতেই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অপর দিকে সাধারণতঃ এ ধারণা বিস্তার লাভ

www.pathagar.com

করেছে যে, এবাদত শুধু পূজা-অর্চনা, স্তবস্তুতির নাম। নামায, রোযা প্রভৃতি সর্বপরিচিত এবাদতগুলো ব্যতীত দ্বীনের মধ্যে আর যা কিছু আছে তা এবাদত নয়। শরীয়তের বহু বিভাগ আছে। তার একটি বিভাগ আছে তা এবাদতের। গোটা শরীয়তের এবং তার সমুদয় বিভাগগুলো এবাদত নয়। এ ধারণা শুধু সাধারণ লোকেরই নয়। বরঞ্চ এ বহু শিক্ষিত (আলেম) লোকের মনে বাসা বেঁধে আছে। এর সুদূর প্রসারী পরিণামও দেখা দিয়েছে। অতএব একে উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু প্রয়োজন তার কারণ অনুসন্ধান করা। জানতে হবে এত সুস্পষ্ট যুক্তি প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও এ ভ্রান্ত ধারণা কোথা থেকে পয়দা হলো। আর প্রকাশ্য দিবালোকে এ হোঁচট কি করে লাগলো ? এ ধারণার প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে হবে। যাতে করে মন নিশ্চিত হতে পারে যে, এ একটা খণ্ডনযোগ্য ধারণা। যতটুকু অনুমান করা যায়, এ ভ্রান্ত ধারণার কারণ চিন্তামূলক থেকে অধিক মনস্তত্ত্বমূলক। তাহলো নিম্নরূপ ঃ

ইসলামের বাইরে গোটা বিশ্বের এবাদত এ সীমিত ধারণার সাথে প্রচলিত। সেখানে এবাদত এবং পূজা পাঠ একই অর্থে বলা হয়। আবার অনেক ধর্ম আছে যা পূজা মন্দিরের বাইরে উঁকিঝুঁকি মারাকেও এবাদত ও দ্বীনদারির মর্যাদার খেলাপ মনে করে। প্রাচ্য প্রতীচ্য সর্বত্রই এ ধারণা বিস্তারলাভ করে আছে। দূর ও নিকট সকল পরিবেশ এ ধারণার ধূম্রজালে ঘোলাটে হয়ে আছে। স্বভাবতই অপরকে প্রভাবিত ও বশীভূত করার একটা বিরাট শক্তি এর মধ্যে এসে যায়। তাকে অবশ্যই একটা ভ্রান্ত ধারণা বলে যাদের মনে করা উচিত, তাদের চিন্তাধারাও সহজে এর থেকে নিরাপদ থাকে না। বিশেষ করে এমন এক সময় যখন চিন্তাধারার মধ্যে নৈরাজ্য এসে পড়েছে। এ সময়ে তাদের চিন্তাধারায় এমন কোন শক্তি নেই, যাতে করে অপরের বিচার প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। স্বয়ং ইসলামের ইতিহাসই এ বিষয়ে একটি দু'টি নয়, বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারে। ইসলাম যতোদিন একটা বিজয়ী ব্যবস্থা হিসাবে চিন্তা ও কাজের ক্ষেত্রকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল এবং তার মধ্যে অগ্রগতির প্রাণশক্তি প্রবহমান ছিল, ততদিন গায়ের ইসলামী মতবাদ তার গৃহের আঙিনায় প্রবেশ করতে পারতো না। অতএব ইসলামী ধ্যান-ধারণাকে গায়ের ইসলামী মতবাদ কিভাবে প্রভাবিত ও বশীভূত করবে ? কিন্তু এ অবস্থা আর যখন বাকী রইল না তখন মুসলমানদের মন- মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে নিজেদের সত্য পথে একমুখী হয়ে চলার মর্যাদা হারিয়ে ফেললো। অতপর বহির্জগতের চিন্তাধারার জন্যে নিজেদের দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। এখন অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে, অসংখ্য অনৈসলামী মতবাদ একেবারে ইসলামী হয়ে পড়লো। এমন কি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষার অর্থগত পবিত্রতাও আর অমলিন রইলো না। আল্লাহ ও রসূলের দেয়া শব্দমালাই শুধু

www.pathagar.com

রয়ে গেল। সে সবের যেমন অর্থও তাঁরা বলেছিলেন তেমনটিও আর রইলো না। এমতাবস্থায় এবাদতের পরিভাষার উপরেও চিন্তা রাজ্যের অরাজকতা প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে অনুমান করা যায়। তার যে সীমিত মর্ম অন্যান্যদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাই ধীরে ধীরে মুসলমানগণও গ্রহণ করলো।

নামায, রোযা, ইত্যাদি এবাদতের বিশিষ্ট মর্যাদা দর্শককে তাক লাগিয়ে দেয়। এসব আমলের যেসব স্বতন্ত্র গুণাবলী উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, স্বীকার করতে হবে, তার মধ্যে বড়োই মর্মস্পর্শীতা আছে যা চিন্তার ভারসাম্য থেকে মনকে সহজেই দূরে সরাতে পারে। এবাদতের কিছু অংশ যদি এমন হয় যে, তার যাহের ও বাতেন উভয়ই কিছু বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত হয়, যদি তা আবদ এবং মাবুদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক প্রকাশ করে, যদি বন্দেগীর প্রেরণা এবং ঈমানের প্রাণশক্তি সঞ্চারে তা অদ্বিতীয় হয় এবং যদি সে সবের আকার আকৃতিও আগাগোড়া এবাদতের ধারণায় প্লাবিত হয়, তাহলে মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে এটা খুবই সম্ভব যে কিছু লোক সেগুলোকেই এবাদত মনে করে বসবে। এমন কি যদি ইসলামের এবাদতের একটা সামগ্রিক ধারণা যদি মনের মধ্যে ভালভাবে বদ্ধমূল না হয়, তাহলে শুধু মাত্র ঐ কয়টি বস্তুকেই মনে করা এবং অন্যান্য যাবতীয় নেক আমলসমূহকে এবাদতের পরিসীমার বর্হিভূত মনে করা শুধু সম্ভবই নয়, বরঞ্চ বাস্তব দিক দিয়ে শুধু এটিই সম্ভব।

প্রকাশ্যতঃ এ দু'টিই বিশেষ কারণ যা এ ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দিয়েছে। নতুবা এ দৃষ্টিভংগীর সপক্ষে কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যুক্তি প্রমাণ পেশ করা যেতে পারে না।

---

www.pathagar.com

ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম

ধর্মীয় একত্বের মতবাদ

আধুনিক কালে ধর্মীয় বিশ্বে একটা মতবাদ বড়ো খ্যাতি ও গুরুত্ব লাভ করেছে, যাকে বলা হয় ধর্মীয় একত্বের মতবাদ। এ মতবাদের মর্ম হলো এই যে, সকল ধর্ম সত্য, সত্য সবই খোদা পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয় এবং সবই আখেরাতে সাফল্য ও পরিত্রাণের সমান উপায় স্বরূপ। এ মতবাদের প্রমাণ স্বরূপ বলা হয় যে, পূজা-অর্চনার পদ্ধতি যেমনই থাক না কেন, সে পূজা অর্চনা যখন খোদার জন্যেই করা হয়ে থাকে তখন সকলের মর্যাদা ও গুরুত্ব সমান হওয়া উচিত। আসলে মূল্য তো আত্মার, দেহের নয়। অতএব একথার কোন গুরুত্ব নেই যে, এবাদতকারী এবাদতের কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করছে, সে কার স্মরণে নিমগ্ন থাকে, কার জ্যোতি দর্শনের চেষ্টায় থাকে এবং কার সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়। যদি মুসলমান, ইয়াহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, পার্শী সকলেই আপন আপন মতে খোদারই পূজা করে থাকে এবং সকলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যদি তাই হয়, তাহলে তাদের পূজা-অর্চনার বাহ্যিক রীতি পদ্ধতি যতোই পৃথক হোক না কেন, সকলের পূজা-অর্চনা-স্তবস্তুতি খোদার জন্যেই হবে। সকলেই সমভাবে খোদা সন্ধানকারী হবে। অতএব সকলেই সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

এ মতবাদটি ধর্মের স্থান ও মর্যাদা সুস্পষ্টরূপে নির্ধারণ করে দেয়। ইসলামের মর্যাদাও এ নির্ধারণ করে। অর্থাৎ এ মতবাদ অনুযায়ী বলা হয় যে, ইসলামও একটি সত্য ধর্ম। তবে এ একমাত্র সত্য ধর্ম নয়। অন্যান্য ধর্মগুলোও তার মতো সত্য।

এখন প্রশ্ন হলো এই যে, ইসলাম তার এ পজিশন (মর্যাদা) কি মেনে নেবে ? এ এমন এক প্রশ্ন যার জবাব পাওয়া দরকার। কারণ এ সাধারণ বিষয়ের প্রশ্ন নয়। এর জবাব যা হবে তার পরিণাম হবে সুদূরপ্রসারী। যতক্ষণ পর্যন্ত এ মতবাদ সম্পর্কে ইসলামের নিজস্ব সিদ্ধান্ত জানা না যাবে, ততক্ষণ তাকেও সঠিকভাবে জানতে বুঝতে পারা যাবে না। এর প্রয়োজন এখন আরও বেশী হয়ে পড়েছে যখন বলা হয় যে, স্বয়ং কোরআন দ্বীনের যে উদ্দেশ্য এবং রেসালতের যে ইতিহাস বর্ণনা করেছে, তা এ মতবাদের পরিপন্থী নয়। বরঞ্চ তার থেকে খানিকটা সমর্থনই পাওয়া যায়। কেননা সে স্বীকার করে যে আল্লাহ প্রত্যেক জাতির জন্যে একজন করে নবী পাঠিয়েছেন। সে আরও স্বীকার করে যে, নবীগণ এবং তাদের প্রচারিত দ্বীন আল্লাহরই প্রেরিত ছিল। এই অবস্থায় তার এটা অস্বীকার করা উচিত নয় যে, যে কোন নবী এবং যে কোন দ্বীনের

www.pathagar.com

অনুসরণ করলে তা খোদারই বন্দেগী হবে এবং আখেরাতের নাজাতের জন্যে তাই যথেষ্ট। প্রত্যেককে কোরআন ও ইসলাম মেনে চলতে হবে তা জরুরী নয়।

রেসালতে মুহাম্মদীর স্বতন্ত্র মর্যাদা

প্রকাশ থাকে যে, এ বিষয়টি রেসালত বিষয়েরই অংশ। অতএব এ মতবাদ সম্পর্কে ইসলাম তার নিজের বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, তাই অকাট্যরূপে রেসালতে মুহাম্মদীর মর্যাদা ভিত্তিক হবে। তার নিকটে এ রেসালতের মর্যাদাও যদি ঠিক ঐরূপ হয়, যা পূর্ববর্তী রেসালতসমূহের ছিল, তবে এ মতবাদের অনুকূলেই তার সিদ্ধান্ত হবে। আর যদি তা না হয়, তাহলে সিদ্ধান্ত হবে ভিন্ন। অতএব আমাদেরকে এ বিষয়ে সর্বপ্রথম অনুসন্ধান করে দেখতে হবে যে, রেসালতে মুহাম্মদীর মর্যাদা কি। তা কি তাই, যা অন্যান্য রেসালতের ছিল? অথবা অন্য কিছু? কোরআন হাদীস অধ্যয়ন করার পর জানা যায় যে, প্রকৃত ব্যাপার প্রথমটি নয়, দ্বিতীয়টি। কেননা রেসালতে মুহাম্মদী অন্যান্য রেসালত-সমূহের তুলনায় কয়েকটি বিশিষ্ট স্বাতন্ত্রের অধিকারী যথা ঃ

প্রথম স্বাতন্ত্র এই যে, নবী মোস্তফার (সা) নুবয়্যত ছিল বিশ্বজনীন। তাঁকে পৃথিবীর কোন বিশেষ ভূখণ্ড অথবা কোন একটি জাতির জন্যে নবী করে পাঠানো হয়নি। বরঞ্চ পাঠানো হয়েছিল সমগ্র মানব জাতি এবং সমগ্র বিশ্বের জন্যে। এটা সেই প্রভুরই ঘোষণা ছিল, যিনি তাঁর অন্যান্য যাবতীয় নবী রসূলগণের ন্যায় নবী মুহাম্মদকেও (সা) তাঁর রসূল করে পাঠিয়েছেন ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُوْنَ ○

"(হে মুহাম্মদ !) আমরা যে তোমাকে পাঠিয়েছি, তা গোটা মানবজাতির জন্যেই পাঠিয়েছি, সুসংবাদদাতা এবং সাবধানকারী হিসাবে। কিন্তু অধিকাংশ লোকেই তা বুঝতে পারে না।"–(সূরা আস সাবা ঃ ২৮)

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ـ(اعراف : ١٥٨)

"(হে মুহাম্মদ) বলে দাও। হে মানবজাতি, শোন। আমি তোমাদের সকলেরই জন্যে আল্লাহর রসূল।"–(সূরা আল আরাফ ঃ ১৫৮)

এ এমন এক কথা যা শুধু তাঁর অর্থাৎ নবী মুহাম্মদের (সা) জন্যেই নির্দিষ্ট। তাঁর পূর্বে যত নবী এসেছেন, তাদের এ মর্যাদা ছিল না। কাউকে সমগ্র পৃথিবী এবং গোটা মানবজাতির জন্যে নবী করে পাঠান হয়নি। বরঞ্চ প্রত্যেকের এলাকা বা অধিক্ষেত্র (Jurisdiction) ছিল সীমিত। তাঁরা কোন

www.pathagar.com

একটি দেশ বা বিশেষ জাতির কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌছাবার জন্যে আদিষ্ট হয়েছিলেন। কোন নবীর দাওয়াত যদি সম্মুখে অগ্রসর হয়েও থাকে তো আশেপাশে এবং তা শুধু অতিরিক্তভাবে। নতুবা তাদের আসল নিয়োগ হতো আপন জাতির জন্যেই। নবী (সা) বিশদভাবে বলেছেন ঃ

كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ اِلٰى قَوْمِهٖ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ عَامَّةً ـ

"আমার আগে প্রত্যেক নবীকে নবী করে পাঠানো হতো বিশেষভাবে তাঁর আপন জাতির কাছে। কিন্তু আমাকে পাঠানো হয়েছে সমগ্র মানবকূলের জন্যে।"–(বুখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় স্বাতন্ত্র্য এই যে, নবী মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়ত যেমন বিশ্বজনীন তেমনি তা চিরন্তনের জন্যেও। তার সাথে অহী এবং রেসালত পরম্পর শেষ হয়ে গেছে। এখন কেয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবেন না। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ط (احزاب : ٤٠)

"কিন্তু তিনি আল্লাহর রসূল এবং নবীকূলের খাতাম।"

–(সূরা আল আহযাব ঃ ৪০)

'খাতাম' বলে সীলমোহরকে। যখন কোন খাম অথবা দলিল দস্তাবেজের উপরে সীলমোহর মেরে দেয়া হয়, তখন তার মধ্যে আর কোন কিছু দেয়া যায় না অথবা কোন কথা বাড়ানো যায় না। বরঞ্চ বলতে হয় যে, এভাবে সব কথার বাস্তব সম্ভাবনাই ফুরিয়ে যায়। অতএব নবী মুহাম্মদকে (সা) স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সকল নবীর 'খাতাম' বা সীলমোহররূপে অভিহিত করা এ সত্যেরই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা যে, এখন রেসালত পরম্পরা শেষ হয়ে গেছে এবং এ সর্বশেষ রসূলকে পাঠানো হয়েছে আল্লাহর বাণী নিয়ে যা চলতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না।

আল্লাহর এ সিদ্ধান্তের সংবাদ নবী (সা) তাঁর নিজের ভাষায় দিয়েছেন। বার বার দিয়েছেন এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দিয়েছেন। যেমন ঃ

خُتِمَ بِيَ الْبُنْيَانُ وَخُتِمَ بِيَ الرُّسُلُ ـ(بخارى و مسلم)...

"আমার দ্বারা নবুয়তের প্রাসাদ নির্মাণ শেষ হয়েছে এবং আমার দ্বারা শেষ হয়েছে রেসালত পরম্পরা।"–(বুখারী ও মুসলিম)

اِنَّهٗ لَانَبِيَّ بَعْدِيْ ـ(بخارى و مسلم)....

"নিঃসন্দেহে আমার পরে আর কোন নবী আসবে না।"

www.pathagar.com

নবী মুহাম্মদের (সা) তুলনায় অন্যান্য নবীগণের যে পজিশন ছিল তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন করে না। তাঁদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না, যার পরে আর কোন নবী আসেননি। তার অর্থ যে তাঁদের নবুয়ত যেমন সীমিত ভূখণ্ডের জন্যে ছিল, তেমনি তা ছিল সীমিত কালের জন্যে।

রেসালতে মুহাম্মদীর তৃতীয় স্বাতন্ত্র্য এই যে, তিনি যে দ্বীন ও শরীয়ত এনেছেন, তা সব দিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ। কিন্তু পূর্ববর্তী নবীগণের দ্বীন ও শরীয়তের মর্যাদা এরূপ ছিল না। প্রত্যেক দ্বীনই যে আল্লাহর প্রেরিত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যতদিন এ দ্বীন (দ্বীনে মুহাম্মদী) না এসেছে, ততদিন আল্লাহ তায়ালার নিম্ন ঘোষণা মুলতবী ছিল ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ ـ(المائدة : ٣)

"লোকেরা ! আজ আমি তোমাদের জন্যে দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদেরকে আমার নিয়ামত উজাড় করে দিলাম।"

এভাবে এ মর্যাদা আল্লাহ তায়ালার শুধু ইসলামের জন্যেই নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন যে, তা একটা পূর্ণাঙ্গ দ্বীন।

অবশ্যি এর অর্থ এ নয় যে, অন্যান্য দ্বীনগুলো সব অপূর্ণ ছিল এবং তা যেসব লোকের হেদায়েতের জন্যে এসেছিল তাদের হেদায়েতের পুরোপুরি মাল-মশলা তার মধ্যে ছিল না। এরূপ মনে করা মারাত্মক ভুল হবে। বরঞ্চ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ওসব দ্বীনের মধ্যে যখন যে দ্বীনই এসেছে, তা সেই জাতি, সেই যমানা এবং সেই অঞ্চলের সংস্কার হেদায়েতের জন্যে যথেষ্ট ছিল, যাদের জন্যে আল্লাহ তা নাযিল করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু সে সময়ের মধ্যে প্রতিটি দ্বীন ছিল শুধু একটি জাতির জন্যে সমগ্র মানব জাতির জন্যে নয়, শুধু একটি সীমিত ভূখণ্ডের জন্যে যারা—বিশ্বের জন্য নয়, শুধু একটা বিশেষ কাল ও সময়ের জন্যে চিরন্তনের জন্যে নয়, এ জন্যে স্বাভাবিকভাবেই না তাদের মধ্যে ছিল বিশ্বজনীন বিষয় ও সমস্যাবলী সম্পর্কে কোন হেদায়েত, না তার সমগ্র শিক্ষার মধ্যে ছিল আন্তর্জাতিক মেজায-প্রকৃতি আর না তা কোন কিছু বলতে পারতো ভবিষ্যৎ সমস্যাবলীর আলোকে।

মোটকথা তাদের দাওয়াতের ক্ষেত্র যেমন ছিল সীমিত, তেমনি তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষার সমষ্টিও ছিল সংক্ষিপ্ত ও সীমিত। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও হিকমতের সিদ্ধান্ত হলো এই যে, এখন এমন এক নবী পাঠানো হোক যিনি হবেন সকলের জন্যে এবং সকল কালের জন্যে। তখন তাঁর এ সিদ্ধান্তের স্বাভাবিক দাবী এই ছিল যে, সে নবীর উপর প্রেরিতব্য দ্বীনের মেজায-প্রকৃতি

www.pathagar.com

হবে আন্তর্জাতিক এবং তাঁর শিক্ষা সকল যুগ সকল দেশ এবং সকল প্রকার মানবীয় সমস্যার হবে উপযোগী। কোরআন মজীদের উপরে বর্ণিত আয়াত এ স্বাভাবিক দাবীরই ঘোষণা করছে। তার মর্ম এই যে, আল্লাহ তায়ালার যে হেদায়েত আদমের (আ) সময় থেকে নাযিল হওয়া শুরু হয়েছিল এবং মানবজাতির মানসিক ও তামাদ্দুনিক উন্নতির সাথে সাথে ব্যাখ্যা বিস্তৃতি ও প্রসারতা লাভ করেছিল, তা আজ নবী মুহাম্মদের (সা) সময়ে সকল দিক দিয়ে পৌঁছে গেল পূর্ণতার চরম পর্যায়ে।

এ রেসালতের চতুর্থ স্বাতন্ত্র্য এই যে, নবী মুহাম্মদের (সা) উপরে যে কেতাব নাযিল হলো তা অবিকল বিদ্যমান আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। তার একটি শব্দ তো দূরের কথা, একটা নোক্‌তা (বিন্দু) পর্যন্ত কমবেশী হয়নি এবং হতে পারবেও না।

আল্লাহ স্বয়ং ওয়াদা করেছেন ঃ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ (حجر : ٩)

"এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ কোরআন আমরাই নাযিল করেছি এবং নিশ্চিতরূপে আমরাই তার রক্ষণাবেক্ষণকারী।"–(সূরা আল হিজর ঃ ৯)

নিছক শ্রদ্ধা বিশ্বাসের কথা নয়, ইতিহাস সাক্ষী যে কোরআন আজ পর্যন্ত রক্ষিত হয়ে আসছে। শুধু হিফয তেলাওয়াতের দিক দিয়ে নয়, তামাদ্দুনিক অবস্থাও একথা বলে যে, ভবিষ্যতের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার এ গুণটিতে কোন মলিনতার সম্ভাবনা নেই।

তারপর দেখুন, এ গ্রন্থখানি এমন এক ভাষায় অবতীর্ণ যা একটা জীবন্ত ভাষা। কোটি কোটি মানুষ এ ভাষায় কথা বলে এবং দুনিয়ার স্থানে স্থানে অসংখ্য অগণিত লোক আছে যারা এ ভাষা জানে, বুঝে পড়তে ও শিক্ষা দিতে পারে। এর তুলনায় আর এমন একটি কেতাবও নেই যার মধ্যে এ গুণাবলী পাওয়া যেতে পারে যে, যে শব্দমালা ও এবাদত-বন্দেগীসহ তা তাঁর প্রচারক নবীর উপর নাযিল হয়েছিল, তা অবিকল সেই শব্দমালাসহ বিদ্যমান আছে এবং যার ভাষা আজকালকার দুনিয়ার কোন একটি জীবন্ত ভাষা। অধিকাংশ আসমানী গ্রন্থের অবস্থা তো এই যে, আর তার কোন একটি অংশও বিদ্যমান নেই। যেসব গ্রন্থ বিদ্যমান আছে তার বহুলাংশ বিকৃত ও পরিবর্তিত। কিছু তার মধ্যে বর্ধিত করা হয়েছে, কিছু পরিত্যক্ত হয়েছে। বহু প্রাচীন এবং ঐতিহাসিক যুগের পূর্ববর্তীকালের কথা ছেড়েই দিন। ঐতিহাসিক যুগের যেসব গ্রন্থাবলী তাদের অবস্থা সম্পর্কে কোরআন বলে যে, সেগুলো তাদের আসল আকৃতিতে

www.pathagar.com

বিদ্যমান নেই। তার অনুসারীগণ তার এবাদত পদ্ধতি পরিবর্তন করেছে এবং যে হেদায়েত তাদেরকে দেয়া হয়েছিল তার বেশীর ভাগই তারা ভুলে বসে আছে।

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ (مائدة : ١٣)

"তারা কালামে এলাহীকে তার প্রকৃত স্থান থেকে পরিবর্তন করে দেয় এবং তাদেরকে যে হেদায়েত দেয়া হয়েছিল, তার থেকে একটা বড় অংশ তারা ভুলে বসে আছে।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ১৩)

স্বতন্ত্র মর্যাদার স্বাভাবিক দাবী

অন্যান্য রেসালতসমূহের তুলনায় রেসালতে মুহাম্মদীর এ স্বতন্ত্র মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখুন এবং তারপর চিন্তা করে দেখুন যে, এ মর্যাদার অনিবার্য দাবী কি হতে পারে। এ স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও এ নবুয়তের মরতবা ও মকাম সকল দিক দিয়ে কি তাই হবে যা অন্যান্য নবীগণের ছিল ? এবং দ্বীন ইসলামের অধিকারও কি তাই যা অন্যান্য দ্বীনের ? একথার জবাবে বিবেক, ইনসাফ, কোরআন এবং সুন্নাহ সকলেরই সিদ্ধান্ত হবে পরিষ্কার নেতিবাচক। তাদের কাছে এসব তত্ত্বের স্বাভাবিক দাবী অনিবার্যরূপে বিলকুল পৃথক হবে এবং তা এই ঃ

একমাত্র ইসলামের অনুসরণ আবশ্যক ঃ রেসালতে মুহাম্মদীর এ স্বতন্ত্র মর্যাদার প্রথম স্বাভাবিক ও অনিবার্য দাবী এই যে, অন্যান্য যাবতীয় মযহাব মনসুখ করা হোক এবং তা করা হয়েছে। এখন আল্লাহর কাছে মনোনীত দ্বীন শুধু ইসলাম। এর উপরে ঈমান আনা অত্যাবশ্যক এবং প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক দেশ ও যুগের মানুষের জন্যে প্রয়োজন এর অনুসরণ করা। কেননা এ যখন সমগ্র দুনিয়ার দ্বীন,এবং তার প্রচারক যখন সমগ্র দুনিয়ার প্রচারক, যখন সমগ্র মানব জাতির নবী বলে ঘোষিত, তখন আর কোন দ্বীন ও কোন নবীর সময়কাল বাকি থাকতে পারে না। রসূলের আগমন তো এ জন্যেই হয় যে, যাদের জন্যে তাঁর আগমন, তারা তাঁকে রসূল বলে মেনে নেবে এবং তাঁর নিরংকুশ আনুগত্য করবে। এ এক সর্বজনস্বীকৃত পথ।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط (النساء : ٦٤)

"আমি তো রসূল এ জন্যে পাঠাই যে, আল্লাহর আদেশেই মানুষ তার আনুগত্য করবে।"–(সূরা আন নিসা ঃ ২৪)

পয়গম্বরে ইসলামের ব্যাপারে এ স্বীকৃত মৌলিক সত্য অর্থহীন হয়ে যাওয়ার কথা নয়। এর কোনই কারণ নেই যে, এখানেও সেই মৌলিক নীতি ঠিক

www.pathagar.com

ঐভাবেই প্রযুক্ত হবে যেমন হয়ে এসেছে অন্যান্য নবীগণের বেলায়। অতএব তাঁর সমগ্র মানবজাতির জন্যে প্রেরিত হওয়া এবং সর্বশেষ রসূল হওয়া একথারই সুস্পষ্ট দাবী জানায় যে, প্রতিটি মানুষ, প্রত্যেক যুগের প্রতিটি মানুষ তাঁর উপরে ঈমান আনবে এবং তাঁর আনীত দ্বীনকে নিজের দ্বীন বলে মেনে নিয়ে তার অনুসরণ করবে। যদি কোন ব্যক্তি তাঁর নবুয়তও স্বীকার না করে এবং তাঁর নিয়ে আসা দ্বীনকে নিজের দ্বীন বলে গ্রহণ না করে, তাহলে এটা তাঁর বিরুদ্ধে নয়, বরঞ্চ সেই বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও শাসকের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা হবে যিনি তাঁকে বিশ্বনেতা ও বিশ্বনবী করে পাঠিয়েছেন।

উপরন্তু যখন কোরআন ব্যতীত এখন আর অন্য কোন আসমানী গ্রন্থ নেই, যা পুরোপুরি রক্ষিত আছে এবং যার মূল ভাষা দুনিয়ার মৃত ভাষাগুলোতে পরিগণিত হয়নি, তখন অন্যান্য কেতাবসমূহ ও শরীয়তসমূহের সঠিক অনুসরণ কি করে সম্ভব হতে পারে ? অবস্থা তো এই যে, স্বয়ং ঐসব কেতাব এবং শরীয়তের নিজেদেরই ঘোষণা এই যে, আমাদের সময়কাল ফুরিয়ে এসেছে এবং এখন আমাদেরকে মনসুখ (রহিত) করা হয়েছে।

এতো গেল কিয়াস ও বিবেকের সিদ্ধান্ত। এখন আসুন ইসলামের নিজস্ব যথারীতি সিদ্ধান্ত শুনুন ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ق (ال عمران : ١٩)

"এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর কাছে গৃহীত দ্বীন একমাত্র আল ইসলাম।"-(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯)

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ـ(ال عمران : ٨٥)

"আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন অনুসরণ করবে, তার সে দ্বীন আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছুতেই কবুল করা হবে না।"

-(সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৫)

এ দু'টি আয়াত দিবালোকের মতোই সুস্পষ্ট। এর দ্বারা প্রকৃত ব্যাপারটি সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

প্রথম আয়াতটির বক্তব্য এই—আল্লাহর কাছে গৃহীত দ্বীন হলো ইসলাম।' বিষয়টি পরিষ্কার করে দেয়ার জন্যে এ যথেষ্ট। দ্বিতীয় আয়াতটি একথা বলে তাকে অধিকতর সুস্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, এখন আল্লাহর নিকটে অন্য কোন দ্বীন স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য হবে না এবং ইসলাম ব্যতীত যদি অন্য কোন শরীয়তের অনুসরণ করা হয়, তাহলে তা খোদার বন্দেগীতে পরিগণিত হবে না।

www.pathagar.com

একথা অনুমান করা কিছুতেই ঠিক হবে না যে, এ আয়াতগুলোতে ইসলাম বলতে সাধারণ অর্থগত ইসলাম বলা হয়েছে—বিশিষ্ট পারিভাষিক ইসলাম নয়। কারণ এখানে আল ইসলাম বিশিষ্ট ইসলাম শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, সাধারণ অর্থবোধক ইসলাম নয়। আরবী ভাষার মূলনীতির দাবী এই যে, কোরআন যখন 'আল ইসলাম' শব্দ ব্যবহার করে, তখন তার সামনে ইসলামের শুধু আভিধানিক অথবা সাধারণ অর্থ বুঝায় না। বরঞ্চ পারিভাষিক অর্থই বুঝায়।

কিন্তু একথায় যদি একমত পোষণ করা না হয়, (অবশ্যি এরূপ করাও ঠিক হবে না) তবুও উপরের যুক্তির উপরে কোনই প্রভাব পড়ে না। প্রকৃত ব্যাপার তাই থাকে, যা পূর্বে বলা হয়েছে। কেননা, এ অবস্থাতেও ঐ আয়াতদ্বয়ের মর্ম এই হবে, আল্লাহর নিকটে সঠিক এবং গৃহীত দ্বীন (বন্দেগীর পদ্ধতি) এই যে, তার পরিপূর্ণ আনুগত্য করতে হবে এবং নিজকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর কাছে সমর্পণ করতে হবে। চিন্তা করে দেখুন এ অর্থ ও মর্মের উদ্দেশ্য ও বাস্তব ফল আর কিছু হবে কি ? নিশ্চয়ই না। কারণ হযরত মুহাম্মদ (সা) বিশ্বনবী হিসাবে আগমন করার পর আল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্যের এবং নিজকে তাঁর কাছে পরিপূর্ণরূপে সমর্পণ করে দেয়ার এ ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না যে, নবী মুহাম্মদের (সা) উপরেই ঈমান আনতে হবে এবং তাঁরই অনুসরণ করতে হবে। কারণ কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা দ্ব্যর্থহীনভাবে একথা ঘোষণা করেছেন যে, এ রেসালত সমগ্র বিশ্বের জন্যে এবং চিরকালের জন্যে। এখন যদি কেউ এ রেসালতের উপর ঈমান না আনে, অথবা নবী মুহাম্মদকে (সা) সত্য রসূল (রসূলে বরহক) স্বীকার করা সত্ত্বেও তাঁর অনুসরণের পথ অবলম্বন না করে, তাহলে এটা আল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্য হবে না। বরঞ্চ হবে আপন প্রবৃত্তির পরিপূর্ণ আনুগত্য। এ হবে আল্লাহ তায়ালার প্রকাশ্য নাফরমানি।

ইসলামের অনুসরণ করবে—একথার প্রমাণ নবী মুহাম্মদের (সা) বাস্তব জীবনেই বিদ্যমান। এমন প্রমাণ বিদ্যমান যার সামনে নতি স্বীকার না করলে তা হবে বেইনসাফি এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব। কোরআনের নিকটে যদি একথা সঠিক বলে বিবেচিত হতো যে, সকল দ্বীনই সত্য এবং সকল নবীর অনুসরণ সমানভাবেই ন্যায়সংগত তাহলে তার যুক্তিসংগত দাবী এই ছিল যে, ইয়াহুদ এবং নাসারাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেয়া থেকে নবী মুহাম্মদ (সা) বিরত থাকতেন। কারণ তিনিই তো ছিলেন সাহেবে কেতাব (তাঁর উপরেই কেতাব নাযিল হয়েছিল) এবং যদি দাওয়াত দিতেনই ত অন্তত ইসলাম গ্রহণের উপর কিছুতেই জোর দিতেন না। তাহলে তো তিনি তাদেরকে একথাই বলতেন, আন্তরিকতার সাথে তোমরা তাওরাত ও ইঞ্জিলের অনুসরণ কর।

www.pathagar.com

আমি তোমাদের কাছে এতটুকু চাই। আমার নবুয়ত মেনে নেয়ার এবং কোরআনের হুকুম মেনে চলার কোন দাবী তোমাদের কাছে করি না।

কিন্তু সমগ্র দুনিয়া একথা জানে যে, এরূপ করা হয়নি। তিনি তাদেরকে তেমনিভাবেই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন, যেমন ভাবে দিয়েছেন মুশরিকদেরকে। তাঁকে অনুসরণ তাদের জন্যেও তেমনি প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন, যেমন মুশরিকদের জন্যে।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ
أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمْ ـ(نساء : ٤٧)

"হে ঐসব লোকেরা যাদেরকে আসমানী কেতাব দেয়া হয়েছিল, শোন। আমার নাযিল করা কেতাবের উপরে তোমরা ঈমান আন। আর এই কেতাব তোমাদের ঐ কেতাবের উপরে ভবিষ্যদ্বাণীর ঠিক ঠিক মুতাবেকই। (আর ঈমান আন ঐ সময়ের) পূর্বে যখন আমি মুখমণ্ডল বিকৃত করে দেব এবং পিঠের দিকে ফিরিয়ে দেব অথবা তাদের উপরে অভিসম্পাৎ করব।"
–(সূরা আন নিসা ঃ ৪৭)

শুধু তাই নয় যে, তিনি তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছেন, বরঞ্চ তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় কুফর করার অপরাধে অপরাধী এবং জাহান্নামী বলে অভিহিত করেছেন। এমনকি কোন কোন স্থানে তাদের ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতিকে শুধু কুফরই নয়, বরঞ্চ অতি নিকৃষ্ট ধরনের কুফর বলেছেন এবং তাদেরকে শুধু কাফের নয়, বরঞ্চ পাকাপোক্ত কাফের বলে আখ্যায়িত করেছেন।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ لا وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ
سَبِيلًا ۝ أُولَٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝

"যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলগণের সাথে এবং আল্লাহ এবং তাঁর রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে চায় এবং বলে, "কিছু নবী-রসূলকে তো আমরা মানব এবং কিছুকে মানব না। এবং এভাবে যারা কুফর ও ঈমানের মাঝখানে কোন পথ অবলম্বন করতে চায়, তারা হলো পাকা পোক্ত কাফের। এরূপ কাফেরদের জন্যে আমরা ঠিক করে রেখেছি অতি লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১৫০-১৫১)

www.pathagar.com

এ আয়াতে আহলে কেতাবকে যে ধরনের আচরণের জন্যে 'আল কাফেরুনা হাক্কা' বলা হয়েছে তা শুধু এই যে, একদিকে যেমন অন্যান্য নবী-রসূলকে মানতো, অন্যদিকে হযরত মুহাম্মদকে (সা) মানতে কিছুতেই প্রস্তুত ছিল না। অথচ তাঁরা যেমন আল্লাহর রসূল ছিলেন, ঠিক তেমনি তিনিও ছিলেন। এটাকেই ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করার কথা বলা হয়েছে। কেননা, অন্যান্য নবীগণকে মেনে নিয়ে ঈমান বিল্লাহর দাবী পূরণ করতে তাদেরকে দেখা গেলেও, রেসালতে মুহাম্মদীকে অস্বীকার করে আল্লাহর মাবুদিয়াত (আনুগত্যের অধিকার) ও হাকেমিয়াত (হুকুম শাসনের অধিকার) তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল। এ আচরণকেই বলা হয়েছে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের সংগে কুফরী করা। কারণ, খোদার কোন রসূলকে মেনে নেয়া এবং কোন রসূলকে অস্বীকার করাই হলো প্রকৃতপক্ষে না খোদাকে মানা, আর না কোন রসূলকে মানা। বরঞ্চ তা হয় আপন প্রবৃত্তিকে মেনে চলা।

কোরআন মজীদ আর এক স্থানে আহলে কেতাবের ইসলাম অস্বীকার করার উল্লেখ করে নিজের মন্তব্য নিম্ন ভাষায় প্রকাশ করছে ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ (البقرة : ٩١)

"এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, এ কেতাবের উপর ঈমান আন যা আল্লাহ নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে, আমরা ঐ জিনিসের উপর ঈমান আনি যা আমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে এবং এভাবে তারা এছাড়া আল্লাহর অন্যান্য হেদায়েতসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করে।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ৯১)

ইসলামী দাওয়াতের জবাবে তারা যা কিছু বলতো, তা একবার চিন্তা করে দেখুন। এ ছিল ঠিক সেই দর্শন যা এ কালের ধর্ম ঐক্য মতবাদের বুনিয়াদ। অর্থাৎ তাদের কথা এই যে, আমাদের নিকটে যখন খোদারই প্রেরিত দ্বীন আছে, তখন তার উপর ঈমান রাখা ও তার অনুসরণ করাই কি যথেষ্ট নয় ? আবার অন্য কোন জিনিস গ্রহণ করা আমাদের জন্যে প্রয়োজন হবে কেন ?

প্রত্যেকে আপন আপন জায়গায় ঠিক। কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, তাদের এ দর্শনকে আল্লাহ তায়ালা শুধু যে, ভ্রান্ত বলেছেন, তাই নয়, বরঞ্চ পরিষ্কার ভাষায় তাকে কুফরী দর্শন বলে বর্ণনা করেছেন এবং 'ঐটাও সত্য ওটাও সত্য' বলা সত্ত্বেও তাদেরকে প্রকৃত সত্যের মুনকের (কাফের) বলে অভিহিত করেছেন।

www.pathagar.com

মোটকথা, কোরআন হাকিম আহলে কেতাবের ইসলাম অস্বীকৃতিকে ঠিক সেই স্থান দিয়েছে, যে স্থান দিয়েছে, মুশরিকদের অস্বীকৃতিকে। পরিণামও উভয়ের একই বলেছে। সে আহলে কেতাবের জন্যে এমন কোন অবকাশ রাখেনি যে, তারা ইসলামের পরিবর্তে নিজেদের দ্বীনের উপরে অবিচল থাকতে পারবে এবং তাও খোদা গ্রহণ করবেন।

কথা এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না। নবী (সা) বলেছেন ঃ

لَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا مَّاوَسِعَهُ الاَّ اتِّبَاعِىْ ـ(مشكوة)

"যদি মূসা (আ) জীবিত থাকতেন, তাহলে আমার অনুসরণ ব্যতীত তাঁর কোন উপায় থাকতো না।"–(মিশকাত)

এ এরশাদে নবী বিষয়টিকে এতই সুস্পষ্ট করে দেয় যে, যার পরে সুস্পষ্টতার কোন স্তরই আর বাকি থাকে না। যে নবীর পজিশন এই হয় যে, অন্যান্য নবী যদি সে সময়ে বিদ্যমান হতেন, তাহলে তাঁরাও তাঁর উম্মাত ও অনুসারী হয়ে যেতেন এবং তাদের নিজেদের শরীয়ত অনুসরণ করার কোন অবকাশই বাকী থাকতো না, তাহলে সাধারণ মানুষের বেলায় ব্যতিক্রম কি করে হতে পারে যে, সে শরীয়ত তারা মেনে চলবে ? তাদের জন্যে অন্য কোন দ্বীন কি করে অনুসরণ যোগ্য হতে পারে যখন খোদার প্রেরিত দ্বীনটি বিদ্যমান আছে ?

ইসলামের অনুসরণই নাজাতের শর্ত ঃ রেসালতে মুহাম্মদীর এসব বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্যের দ্বিতীয় অনিবার্য দাবী এই যে, আখেরাতের নাজাত ইসলাম অনুসরণের উপরেই নির্ভরশীল। কেননা প্রত্যেকের জন্যে যখন ইসলাম অনুসরণ করা জরুরী এবং এখন আর কোন দ্বীন আল্লাহর মনোনীত গ্রহণযোগ্য নেই, তখন তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে, ইসলাম একমাত্র নাজাতের শর্ত। পরিষ্কার কথা এই যে, যেসব শরীয়তকে আল্লাহ তায়ালা এ সময়ে নিজেই মনসুখ এবং অগ্রহণযোগ্য করে দিয়েছেন তা অনুসরণ করার পুরস্কার তিনি কি করে দিতে পারেন ?

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ـ(ال عمران : ٨٥)

একথা বলার পরই তিনি তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন।

وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ـ(ال عمران : ٨٥)

"এবং এ ধরনের লোক আখেরাতে নিশ্চিতরূপে ব্যর্থ মনোরথ হবে।"
–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৫)

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালার উপরোক্ত সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যাদান প্রসংগে নবী (সা) বলেছেন ঃ

وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَايَسْمَعُ بِىْ اَحَدٌ مِّنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يَهُوْدِىٌّ وَّلَا نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَّا كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ -

"কসম সেই সত্তার যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ আছে, এ উম্মতের যে কোন ব্যক্তি পর্যন্ত, তা সে ইয়াহুদী হোক অথবা নাসারা হোক আমার নবুয়তের দাওয়াত পৌছেছে, অথচ এতদসত্ত্বেও সে আমার আনীত দ্বীনের উপর ঈমান না এনেই মৃত্যুবরণ করেছে, সে হবে জাহান্নামী।"–(মিশকাত)

এ হাদীসে নাম যদিও ইয়াহুদ এবং নাসারার নেয়া হয়েছে কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ নাম শুধু দৃষ্টান্ত স্বরূপ নেয়া হয়েছে। নতুবা তা বলা হয়েছে সাধারণভাবে এবং এ একটা মৌলিক নীতির মর্যাদা সম্পন্ন। দুনিয়ায় এমন কোন দল, জাতি এবং মিল্লাত নেই যার উপরে এ প্রযোজ্য হয় না। এ এমন কোন কথা নয় যা সুকৌশলে বের হচ্ছে। বরঞ্চ এমন এক সত্য যা এ হাদীসের (اَحَدٌ مِّنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ) শব্দগুলোরই সুস্পষ্ট মর্ম। প্রকাশ থাকে যে هذه الامة। -এর অর্থ উম্মতে দাওয়াত। অর্থাৎ সেই মানব দল যাদের প্রতি তিনি নবী হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন। আর একথাও জানা যে, যে দলের প্রতি তাঁকে নবী করে পাঠানো হয়েছিল সে দল গোটা মানবজাতিকে নিয়ে গঠিত। অতএব এ হাদীসটি সত্যের উপরে কোন আবরণ থাকতে দেয় না যে, শেষ নবীর উপরে ঈমান আনা প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্যে জরুরীও এবং নাজাতের শর্তও তার জন্যে যে তার নবুয়তের সময় বিদ্যমান ছিল অথবা তারপর জন্মগ্রহণ করেছে। খোদার এ সিদ্ধান্তের আওতায় যেভাবে ইয়াহুদ ও নাসারা পড়ে, এভাবে অন্যান্য জাতি এবং মিল্লাতও পড়ে। বরঞ্চ এক দিক দিয়ে তো অন্যান্য জাতি ও মিল্লাতের ব্যাপারটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। তা এ জন্যে যে, দুনিয়ার যাবতীয় জাতির মধ্যে ইয়াহুদ এবং নাসরাই এমন দুই জাতি যাদেরকে কোরআন পরিষ্কার ভাষায় আহলে কেতাব বলে অভিহিত করেছে। এখন যদি এ ধরনের মিল্লাতের লোকদের জন্যেও রেসালতে মুহাম্মদীর অনুসরণ নাজাতের শর্ত হয়, তাহলে বিবেক বলে যে, ঐসব জাতি এবং মিল্লাতের জন্যে তা নাজাতের শর্ত হওয়া আরও বেশী জরুরী হয়ে পড়ে, যাদেরকে কোরআন আহলে কেতাব ও শরীয়ত বলেনি।

মোটকথা ইসলামের চূড়ান্ত ও অকাট্য সিদ্ধান্ত এই যে, তার অনুসরণ সমগ্র মানবজাতির জন্যে জরুরী এবং তা নাজাতের শর্ত। এর ব্যতিক্রম শুধু সেই ব্যক্তিই হতে পারে যার কাছে এ পয়গাম মোটেই পৌছেনি। যেমন لَايَسْمَعُ بِىْ (যে শুনেনি বা যার কাছে দাওয়াত পৌছেনি) কথার শর্ত

www.pathagar.com

সংযোজিত করে নবী করিম (সা) কথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। কেননা এমতাবস্থায় সে প্রকৃতপক্ষে ওজর পেশ করার অধিকার হবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে ওজর পেশ করার অধিকারী হবে। (معذور) তার কাছে সত্যের বাণী মোটেই পৌঁছেনি, ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপরে আনুগত্য অনুসরণের দায়িত্ব চাপানো এবং তাকে এ ব্যাপারে জবাবদিহি করতে বলা অন্যায় হবে। কিন্তু যারা ইসলাম সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হওয়ার পরেও তাকে মানবে না, তাদেরকে পাকড়াও করা কোনক্রমেই অন্যায় হবে না। কেননা তাদের এ না মানার কাজটা কোন ছোট কথা নয়। এবং একটা সাধারণ সত্য অস্বীকার করা নয়। বরঞ্চ দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সত্যকে অস্বীকার করা। এ আল্লাহর শাসন ক্ষমতার অধিকার অস্বীকার করা। অতএব এ এক বিরাট বিভ্রান্তি হবে যদি মনে করা হয় যে, এসব লোককে পাকড়াও করা হলে তা হবে ইনসাফ ও ন্যায়ের পরিপন্থী। দুনিয়া এমন কোন শাসকের ধারণা পর্যন্ত করতে পারে না—যে প্রজাদেরকে এ স্বাধীনতা দিয়ে রাখবে যে, তারা মরযী মতো তার আদেশের সাথে আচরণ করবে। মরযী হলে তারা তার গভর্নরদেরকে ও প্রচলিত আইন-কানুনসমূহ মেনে চলবে এবং মরযী না হলে মানবে না। তার পরিবর্তে তারা অবসরপ্রাপ্ত গভর্নরদেরকে এবং বাতিল করা আইন-কানুন মানতে থাকবে। তাহলে তিনি যে সকল শাসকের শাসক ও গোটা সৃষ্টিজগতের পরিচালক তাঁর সম্পর্কে এরূপ কোন অন্যায় ধারণা পোষণ করা কি যুক্তিসংগত হবে? এ কি করে সম্ভব যে, তিনি যে পয়গম্বরগণের পয়গম্বরী খতম করে দিয়েছেন এবং নিজের যে শরীয়তগুলোকে বাতিল করে দিয়েছেন, সে সবের আনুগত্য অনুসরণের জন্যে যারা জিদ করে, তাদেরকে তিনি তাঁর বিশ্বস্ত ও অনুগত বান্দাহ বলে স্বীকার করতে থাকবেন এবং এ শেষ পয়গম্বরের আনুগত্য ও তাঁর এ শাসনক্ষমতার বিরোধিতা করা সত্ত্বেও তাদেরকে বিদ্রোহ করার শাস্তি দেবেন না অথচ এ শেষ পয়গম্বরকে তিনি বিশ্বজনীন ও চিরন্তনের পয়গম্বর এবং তাঁর শরীয়তকে বিশ্বজনীন শরীয়ত বলে ঘোষণা করেছেন। এ এক অদ্ভুত ধরনের বন্দেগী ও ফরমাবরদারী হবে যে, আল্লাহ তায়ালা তো তাঁর স্তবস্তুতি, আনুগত্য সন্তোষলাভের জন্যে যাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে হাদী (পথপ্রদর্শক) নিয়োগের ঘোষণা করলেন, কিন্তু তার (যায়েদের) মুখের উপর একথা বলে দেয়া হলো, 'না আমরা এ উদ্দেশ্যে তো বকরকেই ছায়ার মতো অনুসরণ করতে থাকবো।' অবশ্যি, আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমোদিত আদেশ- দানকারী যে যায়েদ, একথা যার জানা নেই, তার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যার জানা আছে এবং যাকে একথা বলে দেয়া হয়েছে, সে যদি এরূপ আচরণ করে, তাহলে এ আচরণ কিছুতেই ন্যায়সংগত বলা যেতে পারে না।

---

www.pathagar.com

মুসলিম জাতির গুরুদায়িত্ব

ইসলামের বিশিষ্ট মর্যাদার বিশিষ্ট দাবী

ইসলামের সাধারণ ও জরুরী পরিচিতির আলোচনা পূর্বের আলোচনায় প্রকাশ্যতঃ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এই পরিচিতি এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উদ্ভব করেছে যার বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন। এ বিষয়টি ইসলামের সেই বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র মর্যাদার সাথে সম্পর্কযুক্ত যা সে অন্যান্য জীবন বিধানের তুলনায় লাভ করে। অর্থাৎ এ ইসলামই সব দিক দিয়ে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এ সমগ্র মানব জাতির জন্যে। এ হচ্ছে সর্ব শেষ দ্বীন বা জীবন বিধান। নাজাতের জন্যে এরই অনুসরণ একান্ত প্রয়োজন। বিবেক বলে ইসলামকে যদি এ বিশিষ্ট মর্যাদা দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে এ বিশিষ্ট মর্যাদার একটা বিশিষ্ট দাবীও আছে। আর তা হচ্ছে এই যে, দুনিয়ার প্রতিটি আনাচে-কানাচে একে পৌছাতে হবে এবং সর্বদা পৌছাতে থাকা উচিত। প্রত্যেক জাতির কাছে একে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা দরকার এবং হর-হামেশা এ কাজ জারী থাকা উচিত। প্রতিটি ব্যক্তির কাছেও ইসলামের পয়গাম পৌছাতে থাকা উচিত। নতুবা দুনিয়া তাকে জানতে বুঝতে পারবে না। আর জানতে না পারলে তার উপরে ঈমানই বা আনবে কি করে ? অথচ ঈমান আনার দায়িত্ব তার উপরে চাপানো হয়েছে। যদি ঈমান না আনে, তাহলে দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হবে। এ এক অন্যায় কথা হবে যে মানুষের জন্যে তাদের প্রভুর প্রেরিত দ্বীন অজ্ঞাত রহস্য হয়ে থাকবে এবং তা না জানলেও তাদেরকে পাকড়াও করা হবে। অতএব মানবতার যদি কর্তব্য হয়ে থাকে যে, তারা ইসলামেরই অনুসরণ করবে তাহলে এ কর্তব্য পালনের পূর্বে তাদের এ অধিকার থাকবে যে তাদেরকে দ্বীন সম্পর্কে পরিজ্ঞাত করতে হবে। এ যদি না হয় তাহলে এ ইসলামের প্রতিও অবিচার করা হবে, কারণ এভাবে সে অনেকাংশে অব্যবহৃত হয়ে থাকবে। তারপর মানবতার প্রতিও অবিচার করা হবে। কেননা এভাবে মানবজাতি এ সম্পদ থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে, যে সম্পদের উপর তাদের ভাগ্য নির্ভরশীল। যতদিন পর্যন্ত ইসলামের নবী বিদ্যমান ছিলেন, নিঃসন্দেহে ততদিন তিনি উৎকৃষ্ট পন্থায় মানবতার এ হক আদায় করেছেন। কিন্তু তাঁর চলে যাওয়ার পরও এ হক দাবী জানাচ্ছে যে, তাকে আদায় করে যেতে হবে। এখন তো আর কোন নবী আসবেন না যে — এ হক তাঁর অপেক্ষায় থাকবে।

এখন যদি ইসলামের এ বিশিষ্ট মর্যাদার এ অনিবার্য দাবী কিছুতেই অস্বীকার করা না যায়, তাহলে তা পূরণ করতেই হবে। কেমন করে পূরণ করা যায় তা এক বিরাট সমস্যা যার কোন একটা বাস্তব সমাধান হওয়া একান্ত

www.pathagar.com

বাঞ্ছনীয়। শুধু এই নয় যে, কোন না কোন বাস্তব সমাধান বাঞ্ছনীয়, বরঞ্চ ইসলামের নিজস্ব উপস্থাপিত সমাধানই বাঞ্ছনীয়। কেননা ইসলাম যদি খোদার প্রেরিত দ্বীন হয় এবং তাকে যদি প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বিশ্বের জন্যে ও চিরকালের জন্যে পাঠানো হয়ে থাকে, তাহলে এ সমস্যার কোন নির্ধারিত সমাধান তার কাছে অবশ্যই আছে।

মুসলিম জাতির দায়িত্ব

এ প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে যখন আমরা কোরআনের পৃষ্ঠার দিকে দৃষ্টিপাত করি—তখন সাথে সাথেই মনে হয় যে, স্বাভাবিকভাবেই এ সমস্যা সমাধানের পূর্ণ ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে। যত বিরাট এ সমস্যা ছিল, তত বিস্তারিত সমাধান দেয়া হয়েছে। যে সুস্পষ্ট ভাষায় সমাধান দেয়া হয়েছে, তাহলো ঃ

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ط (البقرة : ١٤٣)

"এবং এভাবে আমরা তোমাদেরকে (মুসলমানদেরকে) একটি উত্তম জাতি বানিয়েছি। যেন তোমরা অন্যান্য সমস্ত লোকের জন্যে (আমার নাযিল করা দ্বীনের) সাক্ষী হতে পার এবং আমাদের রসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষী হতে পারেন।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৩)

আল্লাহ তায়ালার এ এরশাদ থেকে এ সমাধানের বাস্তব রূপ নির্ধারিত হয় ঃ

* ইসলামকে আল্লাহর বান্দাদের কাছে পৌছার যে কাজ রসূল তাঁর জীবনে করেছিলেন তার চলে যাওয়ার পর সে কাজ তাঁর অনুসারীদের দায়িত্বে এসে গেল। এখন এরা যতদিন এ দুনিয়ায় থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এ কাজের জন্যে তারা দায়ী থাকবে।

* ইসলামকে অন্যান্যদের কাছে পৌছাবার অর্থ সাধারণ ধরনের তবলীগ ও প্রচার নয়। বরঞ্চ এমন তবলীগ ও প্রচার যাকে শাহাদাত (সাক্ষ্য) বলা যেতে পারে।

* ইসলামের সাক্ষ্যদানেরও একটা নির্ধারিত মর্ম আছে। রসূলে খোদা (সা) তাঁর কর্মজীবনে সে মর্ম নির্ধারণ করে দেন। অর্থাৎ ইসলামকে মানুষের কাছে পৌছাবার কাজ মুসলমান সাধ্যমত ঠিক ঐভাবেই করবে যেভাবে স্বয়ং নবী (সা) সাহাবায়ে কেরাম (রা) পর্যন্ত তা পৌছাবার কাজ করেছেন।

www.pathagar.com

জানা গেল যে, পূর্ববর্তী উম্মতগণ যদি একটি দায়িত্ব পালন করে থাকেন এবং তা এই যে,—তাঁরা আন্তরিকতার সাথে নিজেদের দ্বীনের অনুসরণ করে চলতেন ও এ সাধারণ দায়িত্বের সাথে সাথে আর একটি অতিরিক্ত দায়িত্বও মুসলিম জাতির রয়েছে, তা হচ্ছে এই যে—বহির্জগতে তারা সঠিকভাবে ইসলামের সাক্ষ্য দিতে থাকবে। যার বাস্তব দৃষ্টান্ত রসূল তাদের সামনে রেখে গেছেন। আসলে এ ব্যাপারে অবস্থাই ছিল এই যে, নবী (সা) যদিও সারা দুনিয়ার জন্যে এবং কিয়ামত পর্যন্ত নবী ছিলেন, কিন্তু এ বিশ্বব্যাপী দাওয়াত অবিরাম জারী রাখার বাস্তব রূপ আল্লাহ তায়ালা এরূপ নির্ধারিত করেছিলেন এবং স্বাভাবিকভাবে এটাই ছিল যে, নবী (সা) তাঁর স্থলাভিষিক্ত স্বরূপ এমন একটি দল তৈরী করবেন যারা ঈমানের দিক দিয়ে এমন মজবুত এবং বাস্তবের দিক দিয়ে এতটা উচ্চমানের মুসলমান হবে যাতে করে তারা তাঁর পরে তাঁরই মতো সত্যের সাক্ষ্য দিতে পারেন। অতপর এ দলটি তাদের পরবর্তী বংশধরকে এ কাজের জন্যে তৈরী করবে এবং এ কাজের ধারা আপনা আপনি শেষ পর্যন্ত চলতে থাকবে। যেহেতু আমরা দেখছি যে, যখন আরব জাতি দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো এবং যখন নবীর (সা) শিক্ষাপ্রাপ্ত সাহাবীগণের পবিত্র দলটি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলো, তখন নবীর মূল দায়িত্বের অবসান ঘোষণা করে তাঁকে আল্লাহর কাছে ডেকে নেয়া হলো। তারপর বহির্জগতে ইসলামের তবলীগ ও সাক্ষ্যদানের কাজ এ মুসলিম জাতির দ্বারা যথারীতি সম্পাদিত হতে লাগলো যাদেরকে নবী (সা) 'শুহাদায়া আলান্নাস' (মানুষের কাছে দ্বীনের সাক্ষ্যদাতা) বানিয়ে গিয়েছিলেন। এভাবে প্রকৃত অবস্থা এই দাঁড়াচ্ছে যে, নবীর আগমনও সরাসরি আরববাসীদের কাছে ছিল, কিন্তু অবশিষ্ট দুনিয়ার দিকে তাঁর আগমন ছিল এ মুসলিম জাতির মাধ্যমে—যাদেরকে তিনি তৈরী করে গিয়েছিলেন এবং যারা বংশানুক্রমে তৈরী হয়েছিল। অতএব নবীর (সা) চলে যাওয়ার পর এখন কিয়ামত পর্যন্ত এ কাজ এ উম্মতের। সে জন্যে তারা দুনিয়ার সামনে সত্যের সাক্ষ্য দিতে থাকবে এবং নিজেদের সাধ্যমত সেভাবেই দেবে যেভাবে নবী (সা) দিতেন তার জীবদ্দশায়।

সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, উম্মত সমষ্টিগতভাবে নবীর স্থলাভিষিক্ত এবং উম্মত হিসাবে তাদের জীবনের মিশন ঠিক তাই যা নবী জীবনের ছিল।

মুসলিম জাতির এ দায়িত্ব কোন সাধারণ দায়িত্ব নয়। বরঞ্চ এত বিরাট ও সর্বব্যাপী দায়িত্ব যে, তাই তাদের অস্তিত্বের গোটা উদ্দেশ্য হয়ে পড়ছে। আমরা তোমাদেরকে একটি উত্তম জাতি বানিয়েছি যেন তোমরা অবশিষ্ট সমগ্র মানবজাতির জন্যে দ্বীনে হকের সাক্ষী হতে পার—আল্লাহ তায়ালার এ উক্তি এ জাতির মর্যাদা সুস্পষ্টরূপে তাই নির্ধারিত করে। তাঁর এ এরশাদের অধিকতর বিশদ ব্যাখ্যা নিম্নের আয়াতে পাওয়া যায় ঃ

www.pathagar.com

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (ال عمران : ١١٠)

"তোমরা একটি উত্তম জাতি। তোমাদের অভ্যুত্থান করা হয়েছে গোটা মানবজাতির জন্যে।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০)

এ শব্দগুলো থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ জাতি শুধু ঐ ধরনের একটি জাতি নয় যে ধরনের জাতিসমূহের আগমন আজ পর্যন্ত দেখা গেছে। বরঞ্চ এ এমন একটি জাতি যাকে অবশিষ্ট সমগ্র মানবজাতির পথপ্রদর্শক ও রক্ষক বানানো হয়েছে। এ হলো তার অস্তিত্বের প্রথম এবং শেষ উদ্দেশ্য। কোন জিনিসের মর্যাদা ও মূল্য ততক্ষণ পর্যন্তই বাকী থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার আপন অস্তিত্বের উদ্দেশ্য পূরণ করতে থাকে। এ উদ্দেশ্য থেকে সম্পর্কচ্যুত হয়ে যাওয়ার পর সে তার সকল গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। অতএব মুসলিম জাতির প্রকৃত মর্যাদা ও মূল্য এ সাক্ষ্যের উপরেই নির্ভরশীল। তারা উম্মতে ওয়াসত এবং খায়রু উম্মত—প্রকৃতপক্ষে ততদিন পর্যন্তই, যতদিন তারা দুনিয়ার সামনে সত্যের সাক্ষ্যদাতা হিসাবে দণ্ডায়মান থাকবে। নতুবা এ উপাধিসমূহের অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে যাবে। এমন কি নিজের মূল নামের (উম্মতে মুসলেমা বা মুসলিম জাতি) পর্যন্ত তারা যোগ্য থাকবে না। কেননা, যেমন বলা হয়েছে, তাদের এ নাম শুধু একটি নাম নয়, বরঞ্চ একটি গুণবাচক নাম এবং নির্দিষ্টরূপে শুধু এজন্যে এ নাম দেয়া হয়েছিল যখন মুসলমানসুলভ দায়িত্ব অন্যান্য উম্মতের তুলনায় দ্বিগুণ ছিল। সূরা হজ্জের এ কথাগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন ঃ

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ ط هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ لا مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ج (الحج : ٧٨)

"তিনি তোমাদেরকে বেছে নিয়েছেন এবং তোমাদের জন্যে দ্বীনের মধ্যে কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমাদের পিতা ইবরাহীমের পথ অনুসরণ কর। তিনি প্রথম থেকেই তোমাদের নাম 'মুসলিম' রেখেছেন এবং এ বৈশিষ্ট্যের সাথে রাখা হয়েছে, যাতে করে রসূল তোমাদের জন্যে (দ্বীন হকের) সাক্ষ্যদাতা হন এবং তোমরা অন্যান্য সমস্ত মানব জাতির সাক্ষাদাতা হও।"–(সূরা আল হজ্জ ঃ ৭৮)

এ আয়াতে মুসলিম জাতির বিশিষ্ট মর্যাদা এবং তার নির্দিষ্ট দায়িত্ব উভয়ই সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরা হয়েছে। সর্বপ্রথম এর اِجْتَبَا শব্দের প্রতি লক্ষ্য

www.pathagar.com

করুন। اجتبا শব্দের প্রায় ঐ অর্থ যা اصطفا শব্দের হয়। তার অর্থ উৎকৃষ্ট জিনিস বেছে নেয়া। এ শব্দটি কোরআন মজীদে সাধারণতঃ নবীদের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এমন একটি শব্দ যা সাধারণতঃ নবুয়ত ও রেসালতের পদের জন্যে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে বলা হতো। তা যদি একটি জাতির জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাহলে এটা তাদের পয়গম্বরসুলভ মর্যাদার সুস্পষ্ট প্রমাণ। তারপর هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ শব্দগুলোর দিকে লক্ষ্য করুন। শব্দগুলো একথা বলে যে, বিশেষ করে এ উম্মতকে মুসলিম নামে অভিহিত করা হয়েছে। আজ নয়, আবহমান কাল পূর্ব থেকে তার এ উপাধি দেয়া হয়েছে। এ উম্মতের একটা স্বতন্ত্র ও অসাধারণ মর্যাদার অধিকারী হওয়ার এ দ্বিতীয় প্রমাণ। অর্থাৎ যেভাবে শেষ নবীর আগমনের সুসংবাদ তাঁর আগমনের হাজার হাজার বছর পূর্বে দেয়া হয়েছিল এবং দুনিয়া এত কাল থেকে এ সুসংবাদ প্রকাশ হবার অপেক্ষায় অপলকনেত্রে তাকিয়ে ছিল এখনও তাদের আগমনের জন্যে দিবারাত্রির লক্ষ কোটি আবর্তন বিবর্তন বাকি ছিল। কিন্তু তাদের নামের, কাজের ও গুণাবলীর ঘোষণা পূর্ব থেকেই দেয়া হলো। একথা সুস্পষ্ট যে, এ ঘোষণা শুধু একটিমাত্র ঘোষণাই ছিল না—একটি সুসংবাদও ছিল। এ সুসংবাদ এ উম্মতের একটি অসাধারণ উম্মত হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ ছিল। কেননা কোন ব্যক্তি অথবা দলের জন্মের খবর ও সুসংবাদ এত পূর্ব থেকে তখনই দেয়া হয়, যখন তাদের মধ্যে কোন বিশিষ্ট গুরুত্ব পাওয়া যায়।

এখন তৃতীয় জিনিস وَفِيْ هٰذَا শব্দগুলোর দিকে লক্ষ্য করুন। এ শব্দগুলো সেই কারণ এবং উদ্দেশ্য উন্মোচিত করে দেয়া যার জন্যে এ উম্মতকে এ মহান নাম ও মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে। এ শব্দগুলো একথা প্রকাশ করে যে, এ উম্মতকে যদি ঐ নাম ও মর্যাদা দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে অযথা দেয়া হয়নি। বরঞ্চ اجتبا (নির্বাচন) এর ভিত্তিতে দেয়া হয়েছে। একথা আগে বলা হয়েছে। এ শুধু মুসলিম জাতির উচ্চস্থান লাভের প্রমাণই নয়, বরঞ্চ মহান ও অসাধারণ দায়িত্ব বহনের প্রমাণ। এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, এ উম্মতকে এ নাম শুধু এ জন্যে দেয়া হয়েছে যে, তাদেরকে নামের মর্যাদা রেখেই কাজ করতে হবে।

সর্বশেষ لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ ..... شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ শব্দগুলো যাচাই করে দেখা যাক। এ হলো জবাব ঐ প্রশ্নের যে, মুসলিম জাতির নির্বাচন যে কাজের জন্যে হলো নির্দিষ্টভাবে তা কি এবং তা সঠিকভাবে কোন আকারে করা যেতে পারে।

মোটকথা এ আয়াতে যেখানে বলা হয়েছে যে, মুসলিম জাতির নাম ও মর্যাদা কি, সেখানে তাদেরকে এবং সারা জাহানকে এ তত্ত্ব বুঝিয়ে দেয়া

www.pathagar.com

হয়েছে যে, এ নাম এবং মর্যাদার কারণ তার ঐ কাজ যা তাদের উপর সোপর্দ করা হয়েছে। যদি তারা এ কাজ সমাধা করে, তাহলে নিশ্চিতরূপে তারা মুসলিম জাতি। আর যদি সমাধা না করে তাহলে পরিচয় হিসাবে এ নাম বলতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হয়তো এ নাম তাদের থেকে কেড়ে নেবার মতো।

'দ্বীনে হকের সাক্ষ্যই' যদি এ জাতির অভ্যুত্থানের আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয়ে থাকে (যেমন এসব আয়াতের দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে) তাহলে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তাদেরকে এ ব্যাপারে খোদার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহর সামনে যেখানে এক একজন মুসলমানকে তার ব্যক্তিগত দায়িত্বের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে এবং সেখানে গোটা জাতিকে একটা জাতি হিসেবে তাদের সমষ্টিগত জবাবদিহি করতে হবে। অতপর একথাও জেনে রাখা উচিত যে, এ জবাবদিহি কোন মামুলি ধরনের জবাবদিহি হবে না। বরঞ্চ কিছুটা এমন ধরনের হবে যেমন হবে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের আপন আপন পয়গম্বরসুলভ মর্যাদাসহকারে। যদিও তারা অর্থাৎ মুসলিম জাতি পরিভাষার দিক দিয়ে পয়গম্বর নয়, তবুও কিন্তু তারা পয়গম্বরসুলভ দায়িত্ব বহন করে। কিয়ামতের হিসাব কেতাব সম্পর্কে কোরআন বলে ঃ

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ (اعراف : ٦)

"অতপর আমরা হিসাব নেব তাদের কাছ থেকে যাদের কাছে পয়গম্বর পাঠানো হয়েছে এবং হিসাব নেব পয়গম্বরগণের কাছ থেকেও।"

–(সূরা আল আরাফ ঃ ৬)

এর থেকে জানা গেল যে, যেভাবে লোকদেরকে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে, তারা নবীদের দাওয়াতের কি জবাব দিয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে নবীদেরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে, তাঁরা আল্লাহর দ্বীনকে লোকের মধ্যে কিভাবে পৌঁছিয়ে দিয়ে ছিলেন এবং তার কি জবাব তাঁরা পেয়েছিলেন। মুসলিম জাতি পয়গম্বরসুলভ দায়িত্ব বহন করে—এ মৌলিক ঘোষণার সুস্পষ্ট দাবী অনুযায়ী সে প্রশ্ন বা জিজ্ঞসাবাদ তাদেরকেও করা হবে —যা করা হবে নবীগণকে এবং জিজ্ঞাসা করা হবে যে, খোদার বান্দাদের সামনে তারা দ্বীনের সাক্ষ্য কিভাবে দিয়েছিল এবং প্রত্যুত্তরে তারা কি বলেছিল।

চিন্তা করুন, এ দায়িত্ব পালনে মুসলিম জাতি যদি অবহেলা করে তাহলে হাশরের ময়দানে কোন্ কঠিন মুহূর্তের সম্মুখীন তাদেরকে হতে হবে এবং কত কঠিন হবে সে জবাবদিহি। কিন্তু খোদা না করুন অবস্থা যদি এর চেয়েও

www.pathagar.com

খারাপ হয়, যেমন দেখা যায় যে, তারা যে শুধু সত্যের সাক্ষ্য দেয় না তাই নয়, বরঞ্চ সত্যকে গোপন করে, তাহলে জবাবদিহি শুধু কঠিনই হবে না, বরঞ্চ হবে অন্য কিছু। কারণ এ এক অত্যন্ত শক্ত অপরাধ এবং এ সম্পর্কে আল্লাহ সতর্কবাণী ঘোষণা করেছেন ঃ

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ط (البقرة : ١٤٠)

"তার চেয়ে বড় যালেম আর কে হতে পারে, যার কাছে আল্লাহর সাক্ষ্য ছিল কিন্তু সে তা গোপন করেছে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৪০)

শাহাদতে হক (সত্যের সাক্ষ্য) কাকে বলে ?

ইসলামের এ সাক্ষ্য কি বস্তু ? তার মর্ম এবং বাস্তব পদ্ধতি কি ? এ একটা বিরাট প্রশ্ন—যা এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার পর অনিবার্যরূপে মনের মধ্যে উদিত হয়। ইসলামকেই বুঝবার জন্যে এ প্রশ্নের জবাব অত্যন্ত জরুরী।

এ ব্যাপারে নীতিগতভাবে এবং মোটামুটি এতটুকু জানা হয়ে গেছে যে, ইসলাম এবং দ্বীনে হক যেমন একটি নির্ধারিত বস্তু তেমনি দ্বীনে হকের এ শাহাদত বা সাক্ষ্যের মর্ম ও তার বাস্তব পদ্ধতিও নির্ধারিত আছে। রসূলুল্লাহর (সা) আদর্শই তা নির্ধারিত করে রেখেছে। এতটুকু সাধারণ কথাকে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব মনে করা সংগত হবে না। অতএব আসুন এ সাধারণ কথার বিশ্লেষণ করা যাক।

'শাহাদত' বা সাক্ষ্য সচরাচর একথাকে বলা হয় যে, লোক কোন ঘটনা অথবা বস্তু সম্পর্কে যা কিছু নিশ্চিতরূপে জানে, তা অন্যের কাছে অবিকল বলে দেয়া। অতএব দ্বীনে হকের সাক্ষ্য কথাটির আভিধানিক এবং সাধারণভাবে প্রচলিত অর্থ এই যে, ইসলাম যেমন ঠিক তেমনি লোকের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া। এখন রইলো কোরআনের পারিভাষিক মর্ম। তা যদিও মৌলিক দিক দিয়ে তাই, তবুও এর মধ্যে আছে বিরাট ব্যাপকতা, আছে মহত্ব যার বিশ্লেষণ নবীর (আ) আদর্শের আলোকে নিম্নরূপ ঃ

শাহাদতে হকের দু'টি দিক আছে ঃ প্রচারমূলক ও বাস্তব প্রচারমূলক সাক্ষ্য (قولى شهادت)। প্রচার মূলক সাক্ষ্য এই যে, ইসলামের বুনিয়াদী আকায়েদ থেকে শুরু করে তার বিস্তারিত নির্দেশাবলী অমুসলিমদের কাছে সুন্দর ভাষায় পেশ করতে হবে। অবশেষে এ দ্বীন যেন তাদের কাছে একটি প্রকাশ্য গ্রন্থস্বরূপ হয়ে পড়ে, অতপর তাদের নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসের ভ্রান্তি ও ইসলামের সত্যতা নির্ধারণে যেন কোন যুক্তিসংগত প্রতিবন্ধকতা অবশিষ্ট না থাকে।

www.pathagar.com

এ কাজ সঠিকভাবে সমাধা করতে হলে কিছু কথা বলা প্রয়োজন ঃ

প্রথম কথা এই যে, ইসলামের বুনিয়াদী আকায়েদের জ্ঞান ও বিবেক ভিত্তিক যুক্তি প্রমাণাদি এবং প্রকৃতি ও বিশ্বজগতের এমন সাক্ষ্য পেশ করতে হবে যাতে করে ইসলামের সত্যতা প্রকট হয়ে পড়ে। তাওহীদ, রেসালত ও আখেরাতের উপর কোরআন যেমন জোরালো ও ব্যাপক ভংগীমায় যুক্তির পর যুক্তি পেশ করেছে, তা অনুসরণ করা ইসলামী তবলীগের জন্যে বড়ো বুনিয়াদী প্রয়োজন। এভাবে জীবনের বিভিন্ন বিভাগে ইসলাম যেসব নির্দেশ দিয়েছে, তাও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরতে হবে। দেখিয়ে দিতে হবে যে, ইসলাম জীবনের সমস্যাবলীর কত সুন্দর ও সুষ্ঠু সমাধান পেশ করে এবং তা কিভাবে পার্থিব জীবনেরও সুখ স্বাচ্ছন্দের নিশ্চয়তা দান করে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, ইসলামের বিপরীত আদর্শের শালীনতাপূর্ণ ও যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা করতে হবে। এ সমালোচনার জন্যে স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজন যে, প্রথমে ঐসব চিন্তাধারা ও মতবাদের গভীর জ্ঞানলাভ করতে হবে, অমুসলিম জগত যার অনুসরণ করে চলছে এবং যা এখন ধর্ম, তাহযিব, দর্শন ও জীবন বিধানের বুনিয়াদ হয়ে পড়েছে। ভালোভাবে জেনে নিতে হবে যে, এসব মতবাদ যেসব যুক্তি প্রমাণাদির উপর প্রতিষ্ঠিত, তা কি। অতপর এসব মতবাদ সর্বশক্তি দিয়ে খণ্ডন করতে হবে এবং এমনভাবে করতে হবে যে, তা যে বিবেকহীন অযৌক্তিক ও অস্বাভাবিক, তা যেন প্রকট হয়ে পড়ে। অতপর তার সাথে সাথে এসব মতবাদ থেকে উদ্ভূত ক্রিয়াকর্মের পরিণাম ফলগুলোর উপর অংগুলি রেখে গুণে দেখতে হবে কোন কোনটা মানবতার জন্যে সুখকর বলা যেতে পারে না। অনৈসলামী আদর্শের এরূপ যুক্তিসংগত প্রতিবাদ শাহাদতে হকের একটি অনিবার্য স্তর এবং এ ছাড়া এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনই করা যেতে পারে না। কেননা ইসলামের দাওয়াত একটি নতুন নির্মাণ কাজের মর্যাদাসম্পন্ন। যখন কোন নতুন গৃহ নির্মাণের প্রয়োজন হয়, তখন প্রয়োজন হয় ভিত্তি খনন করার, মাটির উপরিভাগ থেকেই কোন গৃহনির্মাণ করা যায় না। প্রয়োজন মতো ভিত্তি খননের পরই দেয়াল গাঁথা শুরু হয়। এভাবে যে মন-মস্তিষ্কে ইসলামের বীজ বপন করতে চান তার মধ্যে প্রথমে স্থান তৈরী করে নিন যেখানে এ বীজের মূল বিস্তার লাভ করতে পারে। একথা ঠিক যে, এ স্থান তখনই তৈরী করা যেতে পারে যখন এসব মন-মস্তিষ্ক থেকে ঐসব ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও মতবাদ উৎপাটিত করে ফেলা হবে যা পূর্ব থেকে বংশানুক্রমে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। আপনি কোন পাত্রে কোন জিনিস একমাত্র তখনই রাখতে পারেন—যখন তা খালি থাকে। এভাবে কোন মনের মধ্যে ইসলাম তখনই বাসা বাঁধতে পারে যখন তা কোন দ্বীন অথবা ইজমের দখলে

www.pathagar.com

থাকে না। কোরআন হাকিম তার দাওয়াত প্রসংগে শুধু এতটুকুই যথেষ্ট মনে করেনি যে, তওহীদ, রেসালত এবং আখেরাতের যুক্তি পেশ করে বসে থাকবে। বরঞ্চ প্রয়োজন বোধ করেছিল যে, শিরক কুফর ও খোদাদ্রোহিতার দর্শনসমূহ এবং রেসালত ও আখেরাত অস্বীকার করার দৃষ্টিভংগী প্রচণ্ডভাবে খণ্ডন করতে হবে। বস্তুত কুফর ও হক অস্বীকার করার যে যে পদ্ধতি ছিল তার প্রতিটির খণ্ডন কোরআন করলো। যে যে পথ দিয়ে এসব মতবাদ মনের মধ্যে প্রবেশ করেছিল, কোরআন তার প্রতিটির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলো। এসব মতবাদের সপক্ষে লোকের কাছে যা কিছু যুক্তি প্রমাণাদি ছিল, একটি একটি করে তা নোট করে নিল। অতপর এসব ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও মতবাদের উপর আলোচনা শুরু করলো। তাদের অন্যায় অযৌক্তিকতা সুস্পষ্ট করে তা নস্যাৎ করে দিল। তার ফলশ্রুতি স্বরূপ কা'বা ঘরের তিনশ' ষাট প্রতিমা ধূলায় লুণ্ঠিত হলো। قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (অসত্য থেকে সত্য সুস্পষ্ট হয়ে পড়লো) এর অবস্থা সৃষ্টি হলো।

তৃতীয় কথা এই যে, ইসলামকে সত্য এবং গায়ের ইসলামকে বাতিল প্রমাণ করার এ কাজ হৃদয়গ্রাহী এবং নতুন দৃষ্টিভংগিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। সমকালীন মানুষের যে ভাষা, সেই ভাষাতেই তা হতে হবে। এ এমন প্রকাশ ভংগীতে হওয়া দরকার যা মানুষের মনে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে। বর্তমান বিবর্তনের যুগে আলোচনা ও যুক্তি প্রদর্শনের যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় সেই পদ্ধতিতে করতে হবে, কেননা ইসলামকে হক এবং গায়ের ইসলামকে বাতিল প্রমাণ করার এ প্রচেষ্টা নিছক একটা বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্কের জন্যে নয় বরঞ্চ দ্বীনে হকের প্রচার ও প্রসারের জন্যে। এমন ব্যাখ্যাকে ব্যাখ্যাই বলা যেতে পারে না, যার পর শ্রোতা কথাটি বুঝতেই পারলো না। এমন প্রচারকে (তবলীগ) প্রচারই বলা যেতে পারে না, যার দ্বারা পয়গামে হককে মন-মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট করা গেল না। অতএব প্রয়োজন নিজের কথা বলার সময় শ্রোতার মনস্তত্ব এবং অভিরুচি যেন অবশ্যই সামনে থাকে। আলোচনা ও যুক্তি প্রদর্শনের ধরন এমন হতে হবে, যাকে শ্রোতা আলোচনা ও যুক্তি প্রদর্শনের ধরন মনে করবে। কোরআন মজিদ তার দাওয়াত পেশ করার জন্যে ভাষা বর্ণনাভংগী, যুক্তি প্রদর্শনের ধরন, মোটকথা সবকিছুই সেরূপই অবলম্বন করেছে যার সাথে আরববাসী পরিচিত ছিল। এক দিকে সে যা কিছু বলেছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় বলেছে। بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ-(شعراء : ١٩٥) উৎকৃষ্ট প্রকাশ ও বর্ণনাভংগীতে এবং তৎকালীন উচ্চমানের সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছে। যাতে করে মূল পঠিতব্য বিষয় বা আখ্যানভাগ ও বর্ণনাভংগীর কোন কিছু হৃদয়ংগম করতে প্রতিবন্ধক না হয়। কোরআন আয়াতগুলোর মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক রক্ষা করে, ছোট ছোট বাক্যে

www.pathagar.com

অনলবর্ষী ভাষণের দ্বারা তার বাণী পেশ করেছে। কারণ এ ধরনের ভাষা মাধুর্য আরবদের কাছে ছিল বড়ই আকর্ষণীয়।

অপর দিকে যুক্তি প্রদর্শনের জন্যে বিবেক স্বীকৃত বিষয়সমূহ প্রকৃতির ইংগিত এবং উর্ধাকাশ ও অন্তর্জগতের পর্যবেক্ষণের সাহায্য নেয়া হয়েছে। কেননা এ যুক্তি পদ্ধতি সঠিক মঙ্গলকর ও ফলপ্রসু তো ছিল, উপরন্তু তা ছিল আরববাসীর মনের সাথে বিশেষ সামঞ্জস্যশীল।

আল্লাহ তায়ালা তার নবীকে হকের দাওয়াত দেয়ার ব্যাপারে হেদায়েত দিয়ে বলেন ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ط (نحل : ١٢٥)

"মানুষকে তোমার প্রভুর এ পথের দিকে হিকমত এবং উত্তম উপদেশ সহকারে ডাক এবং (প্রয়োজন হলে) উৎকৃষ্ট প্রকাশ ও বর্ণনাভংগী সহকারে তর্কবিতর্ক কর।"–(সূরা আন নাহল ঃ ১২৫)

চতুর্থ কথা এই যে, এ তবলীগ ও দাওয়াতের পশ্চাতে কোন জাতীয় অহংকার, কোন দলীয় ভাবপ্রবণতা এবং বিতর্কমূলক স্পৃহা যেন কাজ না করে। বরঞ্চ মুখ ও মন থেকে যা কিছু বেরুবে ; বেরুবে আন্তরিকতা সহকারে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে। নিছক আপন দায়িত্বের অনুভূতি, বনী আদমের প্রতি ভালোবাসা ও শুভাকাংক্ষার ভিত্তিতে বেরুবে। এ অবস্থায় বেরুবে যে, গোমরাহীর জন্যে আর্তনাদ উঠবে খোদার বান্দাদের মধ্য থেকে এবং তারা অনুভব করবে যে, ইসলামের আহ্বায়ক তাদের কাছে কিছু গ্রহণ করছে না, বরঞ্চ কিছু দান করছে। দান করছে একটা বিরাট সম্পদ। লোকের ঈমান আনার ব্যাপারে নবী করীমের (সা) যে ঐকান্তিক বাসনা ছিল এবং মনের মধ্যে যে তীব্র ব্যাকুলতা ছিল, তার উল্লেখ কোরআনে এমনি দেখা যায়।

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ○

"(হে মুহাম্মদ) মনে হচ্ছে যদি এসব লোক ঈমান না আনে, তাহলে তাদের জন্যে দুঃখ ও চিন্তা-ভাবনা করে নিজেকে মেরে ফেলবে।"

–(সূরা কাহাফ ঃ ৬)

বাস্তব সাক্ষ্য

'বাস্তব শাহাদত' এই যে, ইসলামের যে চিত্র ভাষায় প্রকাশ করা হয়, তা নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করতে হবে। প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে এবং গোটা

www.pathagar.com

জাতিকে সমষ্টিগতভাবে ইসলামের বাস্তব নমুনা হতে হবে। তওহীদ, রেসালত ও আখেরাত প্রভৃতি আকায়েদের উপর তাদের দৃঢ় প্রত্যয় থাকতে হবে এবং এ প্রত্যয় প্রকাশ হতে হবে তাদের এক একটি অঙ্গভঙ্গী থেকে। ইসলামের মনঃপুত চরিত্রই তাদের হতে হবে। তাদের আচার-আচরণ হতে হবে কোরআন সুন্নাহ মুতাবিক। তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক, মোটকথা তাদের জীবনের সামগ্রিক ব্যবস্থা, তার এক একটি বিভাগ ঠিক ঐ রূপরেখার উপরে গড়ে উঠতে হবে যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল তৈরী করে দিয়েছেন—যেন দুনিয়া তার নিজ চোখে দেখতে পায়—ইসলাম কাকে বলে এবং সে গড়তে চায় কোন ধরনের মানুষ, কিরূপ সমাজব্যবস্থা ও কোন ধরনের রাষ্ট্র।

বাস্তব সাক্ষ্যের স্থান প্রচারমূলক সাক্ষ্য থেকে অনেক অগ্রবর্তী এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত এ জন্যে যে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা দল নিজেই কোন দ্বীন অনুসরণ না করেছে, ততদিন অন্যকে তা অনুসরণ করার দাওয়াত দেয়া তাদের পক্ষে মোটেই শোভনীয় নয়। শুধু যে শোভনীয় নয়, তাই নয়, বরঞ্চ এ এমন এক প্রচেষ্টা হবে যার প্রভাব কারো উপরে পড়বে বলে মনে হয় না।

দ্বিতীয় কথা এই যে, শ্রোতাদের বিরাট সংখ্যা সম্ভবতঃ শতকরা নিরানব্বই জনেরও বেশী প্রকৃতপক্ষে যুক্তি-প্রমাণাদির বাস্তব রূপ দেখেই তা বুঝতে পারে। তাত্ত্বিক (THEORETICAL) যুক্তি-প্রমাণাদি বুঝার শক্তি তাদের কমই থাকে।

এ ব্যাপারে নবী করীমের (সা) আদর্শ সম্পর্কে কিছু বিষয় সুস্পষ্ট করে দেয়া প্রয়োজন। সমগ্র দুনিয়া একথা জানে যে, নবী যখন লোকের কাছে ঈমানের দাওয়াত দিয়েছিলেন, তখন এ অবস্থায় দিয়েছিলেন যে, তিনি স্বয়ং এ ঈমান ও একীনের মূর্তরূপ হয়ে পড়েছিলেন এবং আল্লাহর কোন হুকুম যখন কাউকে শুনাতেন তার আগেই তিনি সে হুকুমের সামনে নতি স্বীকার করতেন।

এ হলো ইসলামের সাক্ষ্যদানের যথার্থ মর্ম এবং উচ্চমানের পন্থা। মুসলিম জাতির বাস্তব চেষ্টা চরিত্র এ মানের যত নিকটবর্তী হবে, তত পরিমাণ তারা তাদের দায়িত্ব পালনে সমর্থ হবে এবং নিজেদের উদ্দেশ্য লাভে সফল হবে। আর যত তাদের চেষ্টা চরিত্র এ মান থেকে দূরে থাকবে, ততটা তারা ব্যর্থ ও বিফল মনোরথ হবে।

প্রতিবন্ধকতা ও তার দাবী

এ দুনিয়ায় ভালোমন্দ উভয়েরই স্থান, ভালো-মন্দ উভয় শক্তিই এখানে বিদ্যমান। উভয়ের আপন আপন পদ্ধতিতে কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।

www.pathagar.com

তার ফল এই হয় যে, এ শুভ অশুভ শক্তিদ্বয় সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং একটি অপরটিকে পরাজিত করার জন্যে সর্বদা শক্তি প্রয়োগ করে। অতএব এটা স্বাভাবিক যে, ইসলামের পথেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে এবং শুধু এতটুকুই নয় যে, ইসলামের সাক্ষ্য দাতার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। বরঞ্চ তার সাক্ষ্যদান বরদাশতই করা হবে না। প্রত্যেক দাওয়াতের প্রচারক তাই বলে সাবধান করে দেয় এবং তার প্রতিদিনের অভিজ্ঞতাও তাই বলে। অতএব স্বাভাবিকভাবে এ প্রশ্ন জাগে যে, এসব প্রতিবন্ধকতার ব্যাপারে মুসলিম জাতির আচরণ কি হওয়া উচিত।

ইসলাম এ প্রশ্নের জবাবে একথা বলে যে, প্রতিবন্ধকতা যা কিছুই হোক তা দূর করার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে এবং করতে হবে শেষ পর্যন্ত। এ প্রচেষ্টাকে শরীয়ত জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ (আল্লাহর পথে জিহাদ) নামে অভিহিত করেছে।

জিহাদের শাব্দিক অর্থ হলো কাজের জন্যে নিজের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং উদ্দেশ্য সফল না হওয়া পর্যন্ত তার জন্যে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করা। অতএব আল্লাহর পথে জিহাদ করার মর্ম এই হলো যে, শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে তাঁর দ্বীনের অনুসরণ ও শাহাদতে হক আদায় করার জন্যে আপন সাধ্য যা আছে তার সবটুকু করা।

প্রকাশ থাকে যে, কোন উদ্দেশ্যের জন্যে যে চেষ্টা চরিত্র করা হয়ে থাকে, অবস্থা ও পরিস্থিতির সাথে তার গভীর সম্পর্ক থাকে। যেমন অবস্থা ও পরিস্থিতি হবে, চেষ্টা চরিত্রের পন্থাও তদনুযায়ী অবলম্বন করতে হবে। এ সুযোগ সন্ধান নয়। বরঞ্চ এ হলো নীতিসংগত কাজ। কোন প্রচেষ্টাই শুধু প্রচেষ্টার জন্যে করা হয় না, করা হয় কোন উদ্দেশ্যের জন্যে এবং উদ্দেশ্যের খেদমত তখনই হয়, যখন সময় এবং পরিবেশকে সামনে রেখেই তার প্রচেষ্টার পন্থা নির্ধারণ করা হয়। নতুবা সে প্রচেষ্টায় সবকিছু নিয়োজিত করা হলেও সুফল হয়তো খুব কমই পাওয়া যাবে। এটা কোন বুদ্ধিমত্তার কাজও হবে না। আর যে কাজ বুদ্ধিমত্তার নয়, তা ন্যায়সংগতও নয়। অতএব আল্লাহর পথে জিহাদের ধরন কি হবে, তা পরিস্থিতিই বলে দেবে। ইসলাম নীতিগতভাবে বিভিন্ন অবস্থার জন্যে জিহাদের যে বিভিন্ন ধরন ও রূপ নির্ধারিত করে দিয়েছে তা তিন প্রকার ঃ

(১) আভ্যন্তরীণ জিহাদ (২) প্রচারমূলক ও চিন্তামূলক জিহাদ এবং (৩) সশস্ত্র জিহাদ।

www.pathagar.com

আভ্যন্তরীণ জিহাদ

আভ্যন্তরীণ জিহাদের মর্ম এই যে, স্বয়ং ইসলামী সমাজের অভ্যন্তরে যেসব অনাচার মাথাচাড়া দেয়, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তা উচ্ছেদ করতে হবে। কারণ এ আভ্যন্তরীণ অনাচারসমূহ শাহাদতে হকের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক—বরঞ্চ সবচেয়ে বিরাট প্রতিবন্ধক। এ সম্পর্কে নবী করীমের (সা) এরশাদ হচ্ছে ঃ

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ فِيْ أُمَّتِهٖ قَبْلِيْ اِلاَّ كَانَ لَهٗ فِيْ أُمَّتِهٖ حَوَارِيُّوْنَ وَأَصْحَابٌ يَّأْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهٖ وَيَقْتَدُوْنَ بِأَمْرِهٖ ثُمَّ اَنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ يَقُوْلُوْنَ مَالاَ يَفْعَلُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ مَالاَ يُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْاِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ۔

"আমার পূর্বে আল্লাহ যে নবীকেই পাঠিয়েছেন তিনি তাঁর উম্মতের মধ্যে এমন একনিষ্ঠ অনুসারী ও সাথী পেয়েছেন, যাঁরা তাঁর পথ ও মতকে শক্ত করে ধরে রাখতেন এবং তাঁর নির্দেশ মেনে চলতেন। অতপর তাঁর পরে এমন লোক আসতে লাগলো, যাদের অবস্থা এই ছিল যে, তারা যা বলতো তা করতো না এবং যা করতো তা তাদেরকে করতে বলা হয়নি। অতপর যে তাদের বিরুদ্ধে হাত দিয়ে জিহাদ করলো সে মুমেন। যে মুখ দিয়ে জিহাদ করলো সেও মুমেন। যে তার মন দিয়ে জিহাদ করলো সেও মুমেন। এরপরে তিল পরিমাণ ঈমানের স্থান আর বাকি রইলো না।"

–(মুসলিম)

প্রকাশ থাকে যে, এরশাদ শুধু একটা সংবাদ নয়, একটা হেদায়েত এবং নির্দেশও। তার উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে মুসলিম জাতিকে একথা স্মরণ করিয়ে দেয়া যে, ভবিষ্যতে তাদেরকেও এ অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে এবং যখন তাঁরা এ অবস্থার সম্মুখীন হবে, তখন তাদের কি করতে হবে। এ হাদীস থেকে দু'টি বিষয় সুস্পষ্ট হয়।

* একটি এই যে, মুসলিম সমাজের মধ্যে অনাচার ও পথভ্রষ্টতার সৃষ্টি হবে, তা উচ্ছেদ করার নামই জিহাদ।

* দ্বিতীয়তঃ এ প্রচেষ্টা অথবা জিহাদের বাস্তবরূপ কি কি হতে পারে এবং ঈমানের দিক দিয়ে তার মধ্যে প্রত্যেকটির স্থান কি হবে।

www.pathagar.com

সর্বোত্তম উপায় এই যে, এ অনাচার এবং পথভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে সংগত পরিমাণে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে এবং নিজ হাতে তার কণ্ঠরোধ করতে হবে। কিন্তু যদি এতটা শক্তি না থাকে যে, কোন প্রকারেই ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে না, তাহলে মুখের দ্বারা প্রতিবাদ সমালোচনার মাধ্যমে এ কাজ করতে হবে। অনাচারকে প্রকাশ্যভাবে অন্যায় বলতে হবে, নির্দেশ দিতে হবে, বুঝাতে হবে, আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির ভয় দেখাতে হবে। আর যদি এসবের দ্বারা কাজ না চলে, তাহলে অবস্থা অনুযায়ী তিরস্কার ও সাবধানবাণী উচ্চারণ করতে হবে।

কিন্তু যদি এমন করার সুযোগ ও সাহস না হয়, তাহলে অবশ্য অবশ্যই মন যেন ঐসব অনাচারের জন্যে চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। সেসব কন্টক হয়ে যেন চোখে বিদ্ধ হতে থাকে। কামনা করতে হবে যেন এসব অনাচার সত্বর দূর হয়ে যায়। দোয়া করতে হবে এই বলে, হে খোদা ! তোমার এসব বান্দাদেরকে শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা কর। তাদের বিবেক পুনর্জীবিত কর। তাদের ঈমান জাগ্রত করে দাও যেন এসব অনাচারের প্রতি তাদের ঘৃণা জন্মে এবং এ অভিশাপ থেকে তারা নিজেদেরকে বাঁচাতে পারে।

মুসলিম সমাজকে অনাচার থেকে রক্ষা করার এ তিনটি বাস্তব পন্থা আছে এবং এ তিনটিই সম্ভব। তার প্রত্যেকটি জিহাদ। কেননা সত্য প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং ইসলামের সাক্ষ্য দান প্রচেষ্টার এ একটা অংশ। আর সত্যের জন্য চেষ্টা করার নামই 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'।

অনাচার মিটাবার জন্যে চেষ্টা-চরিত্রকে উপরোক্ত হাদীসে 'জিহাদ' বলা হয়েছে, ঠিক অনুরূপ চেষ্টাকে কোন কোন হাদীসে 'অনাচার পরিবর্তন করে দেয়া' বলা হয়েছে যেমন ঃ

مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذَالِكَ اَضْعَفُ الاِيمَانِ ـ(مسلم)

"তোমাদের মধ্যে যে অন্যকে অনাচার করতে দেখবে, তখন তার উচিত হবে তা তার হস্ত দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া। যদি তা করতে না পারে, তাহলে করবে মুখের দ্বারা, সে শক্তিও যদি না থাকে তাহলে এ চেষ্টা করবে মনের দ্বারা। আর এ হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম অবস্থা।"–(মুসলিম)

আবার এ ধরনের প্রচেষ্টাকে 'নিহি আনিল মুনকার'ও বলা হয়েছে। যেমনঃ

وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ(لقمان : ١٧)

www.pathagar.com

"ভালো কাজের আদেশ কর এবং অনাচার থেকে বিরত রাখ।"
-(সূরা লোকমান ঃ ১৭)

اِئْتَمِرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ۔

"ভালো কাজের জন্য পরস্পর পরস্পরকে আদেশ কর এবং অনাচার থেকে একে অপরকে বিরত রাখ।"-(তিরমিযি)

এসব উদ্ধৃতি থেকে জানা গেল যে, মুসলিম সমাজের মন্দ লোকের বিরুদ্ধে 'জিহাদ' করা তাদের অনাচার ও পথভ্রষ্টতা পরিবর্তন করে দেয়া এবং তাদেরকে অনাচার থেকে বিরত রাখা এ সবকিছুই আসলে একই উদ্দেশ্যের জন্যে বিভিন্ন প্রকাশ ভংগী এবং এসবের জন্যে যে কোন শব্দ বা পরিভাষা ব্যবহার করা হোক না কেন, উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে কোনই পার্থক্য হবে না।

অতপর আর একটি তত্ত্ব এসব হাদীস থেকে জানা গেল। তাহলো এই যে, জিহাদ উম্মতের একটা সমষ্টিগত দায়িত্ব। এ দায়িত্ব থেকে না ব্যক্তি মুক্ত হতে পারে, আর না সমাজ ও রাষ্ট্র। বস্তুত আপন মর্যাদা অনুযায়ী সকলেই এ দায়িত্বের অংশীদার। এ বিষয়ে অতিরিক্ত যুক্তি-প্রমাণ ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন হলে কোরআন মজীদের নিম্ন এরশাদের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত। ব্যক্তি সম্পর্কে কোরআন বলে ঃ

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔(التوبة : ٧١)

"মুমেন পুরুষ এবং মুমেন নারী একে অপরের বন্ধু। (তাদের কাজ হলো) তারা পরস্পর ভালো কাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজে বাধা দান করে।"-(সূরা আত তওবা ঃ ৭১)

এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, ভালো কাজের আদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজে বাধা দেয়া। মুসলমানদের এ একটা স্থায়ী গুণ যার অভাব থাকা চলবে না। এ হলো ঈমানের স্বভাব, ইসলামের বৈশিষ্ট্য। যেখানেই মুসলমান থাকবে, এ কাজ হতেই হবে এবং যে মুসলমান হবে তাকে এ কাজ করতেই হবে।

ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ۔ (الحج : ٤١)

www.pathagar.com

"এরা ঐসব লোক যাদেরকে আমি দুনিয়ার রাষ্ট্রশক্তি প্রদান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে। ভালো কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজে বাধা দেবে।"-(সূরা আল হজ্জ্ব ঃ ৪১)

এর থেকে জানা গেল যে, মুসলমানগণ যেভাবে তাদের সাধারণ ও ব্যক্তিগত মর্যাদা হিসাবে অনাচার সহ্য করতে পারে না, তেমনি ক্ষমতাহীন হয়েও তাদেরকে সেরূপ হতে হবে। অনাচারের উচ্ছেদ সাধন তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বুনিয়াদী উদ্দেশ্য এবং দায়িত্বে পরিগণিত হবে।

প্রচারমূলক জিহাদ

প্রচার মূলক জিহাদের অর্থ এই যে, অমুসলিম মহল থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে যেসব সন্দেহ সৃষ্টি করা হয়, যেসব অভিযোগ উত্থাপন করা হয়, তার যথাযথ জবাব দিতে হবে। এমন কোন সন্দেহ যুক্তি-প্রমাণ ও অভিযোগ থাকতে দেয়া হবে না যার দ্বারা ইসলামের উপরে সূক্ষ্ম আবরণও পড়তে পারে। ইসলামী আন্দোলনের মক্কা অধ্যায়ে এ জিহাদই চলেছিল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তার নবীর প্রতি এরশাদ হয়েছিল ঃ

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ٥(الفرقان : ٥٢)

"(হে মুহাম্মদ!) ইসলাম অস্বীকারকারীদের কথা শুনো না এবং (কোরআন প্রচারের মাধ্যমে) তাদের বিরুদ্ধে পুরোপুরি জিহাদ করতে হবে।"
-(সূরা আল ফুরকান ঃ ৫২)

কোরআনের মাধ্যমে জিহাদেয় তাৎপর্য এই যে এবং এই হতে পারে যে, ইসলাম অস্বীকারকারীদের সামনে কোরআনের ঐসব যুক্তি-প্রমাণাদি পেশ করতে থাক, যা ইসলামের সত্যতা এবং তাদের অস্বীকার করার অমূলক কারণগুলো সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং তাদের যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা তাদেরই যে দুর্বলতা প্রকাশ পায়, তাও এমনভাবে তুলে ধরতে থাক যেভাবে কোরআন শিক্ষা দেয়। এ কাজ সর্বশক্তি দিয়ে করতে থাক যেন শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করার সপক্ষে তাদের বলার কিছুই না থাকে এবং চারদিকের চাপে তা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

নবী করীম (সা) এ কাজকে মৌখিক জিহাদ বলে অভিহিত করেছেন।

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ -

"মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল জান এবং মুখ দিয়ে জিহাদ কর।"-(আবু দাউদ)

www.pathagar.com

প্রচারমূলক জিহাদ প্রকৃতপক্ষে বিবেক এবং যুক্তি-প্রমাণের অস্ত্র দিয়ে করারই নাম। এ সংগ্রাম ততক্ষণ পর্যন্ত করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ইসলাম বিরোধিতার সকল চিন্তা ও যুক্তির দুর্গ ধূলিসাৎ হয়েছে। তা সে খোদা সম্পর্কে হোক, প্রকৃতি বিজ্ঞান সম্পর্কে হোক, তাহযিব তামাদ্দুনের ক্ষেত্রে অথবা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হোক। অথবা তা হোক বিজ্ঞান লব্ধ কিংবা দর্শন লব্ধ। কোরআন হাকিম আরববাসীর এক একটি যুক্তি এবং তাদের উত্থাপিত অভিযোগ যে নস্যাৎ করে দিয়েছে তা না বললেও চলে। এ ব্যাপারে আল্লাহ যে ঘোষণা করেছিলেন তার শব্দগুলোর প্রতি একবার লক্ষ্য করুন ঃ

وَلَا يَاتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ط(الفرقان : ٣٣)

"[হে মুহাম্মদ ! (সা)] এসব লোকেরা তোমার কাছে যেসব নিত্য নতুন অভিযোগ নিয়ে আসছে, আমি তার জবাবে তোমাকে সঠিক এবং অতি উত্তম ও সুস্পষ্ট যুক্তি অবশ্যই বলে দেব।"–(সূরা আল ফুরকান ঃ ৩৩)

এ চিন্তা ও যুক্তির লড়াই যেভাবে লড়তে হবে, তার জন্যে কোরআন এ মৌলিক হেদায়েত দিয়েছে যে, তর্ক বিতর্কের পদ্ধতি এমন হতে হবে যা হবে সবচেয়ে ভালো। وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ط(النحل : ١٢٥) কোন জিনিসের ভালো এবং মন্দ হওয়া একথার দ্বারা বুঝায় যে, যে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যে এ পন্থা অবলম্বন করা হবে, সত্যিকারভাবে তার দ্বারা কতটা সে উদ্দেশ্য সফল হবে। অতএব ইসলামের সপক্ষে তর্ক বিতর্কের সঠিক ও কোরআন সম্মত তাই হতে পারে, যা শ্রোতাকে তার নিকটবর্তী করে দেয়, যাতে করে ইসলামের সত্যতার স্বীকৃতি দান সে করতে পারে এবং এর জন্যে তার মনের দুয়ার খুলে দিতে পারে। এ জিনিস তখনই অর্জন করা যেতে পারে যখন ইসলামের সপক্ষে ব্যবহৃত শব্দমালা এক দিকে তা বিবেকের কাছে আবেদন জানাবে এবং তা বলা হবে শ্রোতার মন ও মনস্তত্ত্বকে সামনে রেখে। তৃতীয়তঃ তার মধ্যে হতে হবে মনের ঐকান্তিক আবেদন আকুতি।

এ চিন্তা ও যুক্তিমূলক সংগ্রাম ছাড়াও প্রচারমূলক জিহাদের আর একটি অতিরিক্তি দিক আছে। তা যদিও অতিরিক্ত কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তার বড়ো গুরুত্বও আছে। এ ছাড়া জিহাদ সফলই হতে পারে না। তা হচ্ছে ধৈর্য ও অবিচলতা। এ এক স্বীকৃত সত্য যে ইসলামী দাওয়াতে ভদ্রতার জবাব ভদ্রতার সাথে পাওয়া যায় না। বাতিলের যে ধ্বজাবাহকদের সামনে আপনি দ্বীনে হক পেশ করবেন, তাদেরকে এতটা উদার ও এতটা সত্যানুরাগী খুব কমই পাওয়া যাবে যে, আপনার কথা ভালো মন দিয়ে এবং বিবেচনা সহকারে শুনবে এবং কথার জবাব কথা দিয়ে ও যুক্তির জবাব যুক্তি সহকারে দেবে, বরঞ্চ অধিকাংশ

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে এই হবে যে, তাদের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলবে। যার ফলে তারা বিবেচনা প্রসূত আলোচনা ন্যায়সংগত যুক্তি প্রমাণাদির জবাবে শক্ত কথা ও বেদনাদায়ক প্রগলভতা শুরু করে দেবে। নবীর পরে সাহাবায়ে কেরামের (রা) চেয়ে অধিকতর মন জয়কারী ও শুভাকাংখী আর কে হতে পারে এবং তাদের চেয়ে মনোমুগ্ধকর ও যুক্তিসংগত দাওয়াতের পন্থাকে অবলম্বন করতে পারে ? কিন্তু তাঁদেরকেও এ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এমন কি এক অসহনীয় অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাদেরকে। এ ব্যাপারে প্রথম থেকেই আল্লাহ তাঁদেরকে যে কথার দ্বারা সতর্ক করে দিয়েছিলেন তাও লক্ষ্য করার বিষয় ঃ

...وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا ـ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ○

"এবং তোমাদেরকে শুনতে হবে আহলে কেতাব ও মুশরিকদের পক্ষ থেকে অনেক দুঃখজনক কথা, যদি এমন সময়ে তোমরা ধৈর্যের কাজ কর এবং তাকওয়া আচরণে অবিচল থাক, তাহলে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ হবে বড়ই দৃঢ় সংকল্পের কাজ।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৬)

জানা গেল যে, ইসলামের এই প্রচারমূলক শাহাদতের ফলশ্রুতি স্বরূপ বিপদ আপদের ঘাত-প্রতিঘাত এক নিশ্চিত ব্যাপার। এ বিপদ-আপদ বিভিন্ন মূর্তি ধারণ করে আসতে থাকবে। অর্থাৎ এমন হবে যে, শুভাকাংঙ্খার জবাব জাহেলিয়াতের আত্মগরিমার দ্বারা, মিষ্টি কথার গালাগালির দ্বারা এবং যুক্তির জবাব প্রস্তরাঘাতে দেয়া হবে। দাবী করা হবে, বরঞ্চ আদেশ করা হবে মুখ বন্ধ করার। কিন্তু শাহাদতে হকের দাবী এই যে, এসব দাবী এবং আদেশ প্রত্যাখ্যান করে সর্বপ্রকার বিরোধিতা সত্ত্বেও আল্লাহর বান্দাহদেরকে বন্দেগীর দাওয়াত দিতেই হবে, দিতে হবে কোন প্রকার ভৎসনা তিরস্কারের ভয় না করেও। অবস্থার চাপ যেমনই হোক না কেন, কোন রূপ আপোষ নিষ্পত্তির চিন্তা মনে স্থান দেয়া চলবে না। এরূপ অবস্থাতেই নবীকে বলা হয়েছিল ঃ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ○ (الحجر : ٩٤)

"যে কথার আদেশ তোমাকে করা হয়েছে তা পরিষ্কার ভাষায় শুনিয়ে দাও। মুশরিকদের কোনই পরোয়া করো না।"–(সূরা আল হিজর ঃ ৯৪)

সত্য কথা এই যে, দাওয়াতী তৎপরতাকে সত্যিকার অর্থে জিহাদ তখনই বলা হয়, যখন তা করা হয় বিরোধিতার দমকা হাওয়ার মধ্যে।

www.pathagar.com

সশস্ত্র জিহাদ

সশস্ত্র জিহাদের অর্থ এই যে, ইসলামের পথ রোধকারী শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করতে হবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত করতে হবে যতক্ষণ না সে এ পথ মুক্ত করে দিয়ে পশ্চাদ্ধাবন করেছে। এ হলো জিহাদের শেষ পর্যায়। এরও দ্বিতীয় বিশিষ্ট নাম 'কেতাল'। বাস্তব দিক দিয়ে এ হলো জিহাদের সবচেয়ে কঠিন ধৈর্য পরীক্ষার এক বিশেষ ধন কিন্তু দ্বীনের অস্তিত্বের জন্যে এ বিশেষ প্রয়োজন। যে সময়ে এ সশস্ত্র জিহাদের আহ্বান করা হয়েছিল, তখনই একথা পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছিল ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ (البقرة : ٢١٦)

"(মুসলমান !) তোমাদের জন্যে কেতাল ফরয করে দেয়া হলো। যদিও তা তোমাদের কাছে অপ্রিয় বলে মনে হয়। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, একটি জিনিসকে তোমরা অপছন্দ করছ, অথচ প্রকৃতপক্ষে সেটিই তোমাদের জন্যে মংগলজনক।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২১৬)

এ কেতাল এবং সশস্ত্র জিহাদ, ইসলাম ও আহলে ইসলামদের জন্যে কিভাবে মংগলজনক হতে পারে ?

তার বিশ্লেষণ ঐসব আয়াতে পাওয়া যাবে যার মধ্যে কেতালের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করা হয়েছে।

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ۗ (البقرة : ١٩٣)

"এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাও। সর্বশেষে যেন ফেৎনার মূলোচ্ছেদ হয় এবং 'দ্বীন' (আনুগত্য) পুরোপুরি আল্লাহর জন্যে হয়ে যায়।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৩)

অর্থাৎ যুদ্ধের আদেশ এ জন্যে দেয়া হয়েছে যাতে করে আল্লাহর নাম নেয়ার এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করার পথ সুগম হয়ে যায় এবং ফেৎনার অবসান ঘটে।

ফেৎনা কোরআনের একটি পারিভাষিক শব্দ। তার অর্থ হলো মানুষকে ইসলাম অনুসরণের অধিকার না দেয়া। তাদেরকে তাদের প্রকৃত মাবুদের বন্দেগী থেকে বিরত রাখা। সত্য কথা এই যে, এ এমন এক জুলুম, যার চেয়ে বড় জুলুম আর কিছু হতে পারে না। এমন কি তার তুলনায় অন্যায়ভাবে খুন করার গুরুত্বও এতটা নয়। কারণ কাউকে খুন করা হলে তার অর্থ বড়োজোর

www.pathagar.com

এই তাকে দুনিয়ার ক্ষণকালের সুখ-সম্ভোগ থেকে বঞ্চিত করা হলো। কিন্তু কাউকে যদি খোদার আনুগত্য থেকে বঞ্চিত করা হয়, তাহলে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তার প্রকৃত জীবন ধ্বংস করে দেয়া হলো এবং তাকে আখেরাতের চিরন্তন সুখ-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হলো। অবশ্য উভয় বস্তুটিই যে অবাঞ্ছিত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ দু'টি অবাঞ্ছনীয় জিনিসের কোন একটি যদি গ্রহণ করতে হয় তাহলে কোন নির্বোধ ব্যক্তিও প্রথমটির পরিবর্তে দ্বিতীয়টি গ্রহণ করবে না। এ জন্যে কোরআন হাকীম যখন একথা বলে যে ঃ

وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ع (البقرة : ١٩١)

"ফেৎনা হত্যা কর্ম থেকে অধিকতর কঠিন।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯১)

তখন এমন এক কথা বলে যার সত্যতা সম্পর্কে দ্বিমত থাকতে পারে না। যদি এ ব্যাপারে দ্বিমত না থাকে, তাহলে নিজের জীবন দিয়ে এবং অপরের জীবন নিয়ে ইসলামের পথের জবরদস্তিমূলক প্রতিবন্ধকতা যদি দূর করা হয়, তাহলে তা দু'টির মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভালো হওয়ায় দ্বিমত হবে কেন ?

আর একটি আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করুন, যা জিহাদের প্রয়োজনীয়তার উপরে নীতিবাচক দিক দিয়ে আলোকপাত করছে।

وَلَوْ لَادَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ بِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ط وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُوْهُ ط

"এবং যদি আল্লাহ কিছু লোকের দ্বারা কিছু লোককে ঠেকিয়ে না রাখতেন, তাহলে ধূলিসাৎ করে দেয়া হতো নাসারাদের নিভৃত হুজরাসমূহ ও এবাদতখানা, ইয়াহুদদের এবাদতখানা এবং মুসলমানদের মসজিদসমূহ যেখানে অধিক পরিমাণে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় এবং আল্লাহ অবিশ্য তাদেরকে সাহায্য করেন যারা তাঁর দ্বীনের সাহায্য করে থাকে।"

–(সূরা আল হজ্জ ঃ ৪০)

এ আয়াতটি দ্বারা একথা আরও সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, যদি দ্বীনের জন্যে অস্ত্র ধারণ করা না হয় এবং ফেৎনার মূলোচ্ছেদ করা না হয়, তাহলে স্বয়ং দ্বীনেরই মূলোচ্ছেদ করা হবে ফেৎনা সৃষ্টিকারী মহল ইসলামের নাম উচ্চারণ করা কঠিন করে দেবে এবং খোদা পরস্তির এক একটি নিদর্শন মিটিয়ে দেবে। অতএব, দ্বীনের অস্তিত্ব ও উন্নতির জন্যে সশস্ত্র জিহাদ একটি অনিবার্য প্রয়োজন।

www.pathagar.com

সশস্ত্র জিহাদের প্রকারভেদ

যেসব প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্যে সশস্ত্র জিহাদের আদেশ করা হয়েছে সকলেই অনুভব করবে যে, এসব একই ধরনের হতে পারে না। তাদের মধ্যে প্রকার ভেদ আছে পার্থক্য আছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা জানতে পারা যায় যে, এসব প্রতিবন্ধকতা মৌলিক দিক দিয়ে দুই প্রকারের।

(ক) এক হচ্ছে এই, যার সম্পর্ক ইসলাম গ্রহণকারীদের সংগে অর্থাৎ যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে এ অপরাধে তাদের উপর নির্যাতন করা হয়। তাদের কাছে দাবী করা হয় ইসলাম ত্যাগ করার। এ উদ্দেশ্যে তাদের উপর বলপ্রয়োগও করা হয়।

(খ) দ্বিতীয়টির সম্পর্ক অমুসলিমদের সাথে। অর্থাৎ অমুসলিমদের কাছে ইসলাম পেশ করতেই দেয়া হয় না। অথবা তাদের উপর এমন এক সামাজিক শাসন চাপিয়ে দেয়া হয় যে, ইসলামকে নিকট থেকে দেখার ও বুঝার সুযোগই তাদেরকে দেয়া হয় না।

প্রতিবন্ধকতা যখন দু' রকমের, তখন সেসব দূর করার জন্যে যে জিহাদ করা হবে তাও হবে দু' রকমের।

প্রথম ধরনের প্রতিবন্ধকতা শুধু কঠোর ও অসহনীয়ই নয়, বরঞ্চ অত্যন্ত পৈশাচিক। অতএব এর বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে তা হবে আত্মরক্ষামূলক। তাকে বলা হবে আত্মরক্ষামূলক জিহাদ। কেননা যার বিরুদ্ধে জিহাদ করা হয়, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় প্রথমে তাদের দ্বারা। এ ধরনের জিহাদের আদেশ নিম্নরূপ ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ط وَإِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ نِ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ (الحج : ٤٠)

"যাদের বিরুদ্ধে (মুশরিকরা) যুদ্ধ করছে, তাদেরকে মুকাবিলার জন্যে অনুমতি দেয়া হলো। কেননা তাদের উপর জুলুম করা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে সম্পূর্ণ শক্তিমান। তাদেরকে শুধু একথার জন্যে অন্যায়ভাবে গৃহ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে যে, তারা বলতো— আমাদের প্রভু একমাত্র আল্লাহ।"–(সূরা আল হজ্জ ঃ ৪০)

এ আয়াতটি মদিনার প্রাথমিক যুগে নাযিল হয়েছিল। এর মধ্যে একথার বিশ্লেষণ আছে যে, মুসলমানদেরকে কুরাইশদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের অনুমতি তখন যে দেয়া হয়েছিল, এ তাদের নির্যাতিত হওয়ার কারণেই দেয়া হয়েছিল

www.pathagar.com

এবং আরও এ জন্যে দেয়া হয়েছিল যে, তাদের উপর সশস্ত্র আক্রমণ করা হয়েছিল। যতদিন পর্যন্ত কুরাইশগণ একটা স্বাধীন দল হিসেবে বিদ্যমান ছিল এবং যুদ্ধের এ অবস্থা বিরাজ করছিল, ততদিন পর্যন্ত মজলুম মুসলমানদেরকে বারবার একথা শুনানো হচ্ছিল। বস্তুতঃ সে সময় পর্যন্ত যাবতীয় সশস্ত্র জিহাদ ছিল আত্মরক্ষামূলক।

এখন রইল দ্বিতীয় প্রকারের প্রতিবন্ধকতা ও এর বিরুদ্ধে যে জিহাদ হবে তার ধরনটা ভালভাবে হৃদয়ংগম করা দরকার। ইসলামের মর্যাদা এবং মুসলিম জাতির জীবনের দায়িত্ব এ উভয় বিষয়ে ইতিপূর্বে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলাম এসেছে সমগ্র বিশ্বের জন্যে। এ হচ্ছে হক এবং নাজাতের উপায়। ইসলাম ছাড়া আর যা কিছু আছে তা বাতিল এবং আল্লাহর কাছে অগ্রহণযোগ্য। মুসলিম জাতির দায়িত্ব এই যে, তারা ইসলামের মর্যাদার দাবী পূরণ করবে। তার সত্যতার সাক্ষ্যদান করবে। প্রত্যেকে সম্ভাব্য উপায়ে চেষ্টা করবে যাতে করে খোদার বান্দাগণ প্রকৃতই তাঁর বান্দাহ ও অনুগ্রহ হয়ে যায়। তাঁর প্রেরিত এই দ্বীনে হক থেকে তারা যেন নিজের জীবন এবং আখেরাত ধ্বংস না করে। এ দু'টি কথার সুস্পষ্ট দাবী এই যে, মুসলিম জাতি তাদের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরঞ্চ সম্মুখে অগ্রসর হবে। আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে দুনিয়ার আনাচে-কানাচে পৌঁছে যাবে। এ পথে কোন কিছু প্রতিবন্ধক হতে দেবে না। ইসলাম গ্রহণের জন্যে যাদের হৃদয় দ্বার উন্মোচিত হবে না, তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে কিছুতেই বলপ্রয়োগ করবে না। কেননা তাতে কোন লাভ নেই। কিন্তু তাদেরকে এ অনুমতিও দেয়া যেতে পারে না যে, তারা অপরের মন-মস্তিষ্কের উপরে চেপে বসে থাকবে, অথবা এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখবে—যার দ্বারা লোক ইসলামের নিকটবর্তী হতে পারবে না। সত্য কথা এই যে, ইসলাম এ ধরনের মুক্ত পরিবেশ পেতে পারে না, যতক্ষণ না জীবনের সামগ্রিক ব্যবস্থা বাতিলের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তার নিজের হাতে নিয়েছে। কেননা মানব সমাজে যে ব্যবস্থা কায়েম করা হয়, তা মানুষের মন-মস্তিষ্ক তার নিজস্ব মতবাদের দিকে আকৃষ্ট করে। অথবা নিজের পক্ষে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। অন্য কোন মতবাদ ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দেয়ার সুযোগই দিতে চায় না। অতএব যতদিন কোন অনৈসলামী ব্যবস্থা কোন সমাজের উপর চালু থাকবে, ততদিন বাস্তব ও মনস্তাত্বিক দিক দিয়ে ইসলামের জন্যে সাধারণ মানুষের মনের দুয়ার বন্ধ থাকবে। এ এমন এক ব্যাপার যাকে ইসলামের পথে প্রতিবন্ধকতাই বলা হবে। যে ব্যক্তি উপরোক্ত বিষয়টি সামনে রেখে চিন্তা করবে, সে একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, ইসলামের এরূপ ধারণা করাই উচিত। এখন যদি প্রতিটি অনৈসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা ইসলামের পথে প্রতিবন্ধক হয়, তাহলে তার অর্থ এই যে, দুনিয়ার কোথাও

www.pathagar.com

কোন অনৈসলামী জীবন বিধান চালু থাকার অধিকার ইসলাম স্বীকারই করে না। সে চাইবে যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা শুধু তার হাতে থাকবে—মুসলমানদের হাতে নয়, ইসলামের হাতে এবং যেখানেই তার রাষ্ট্রক্ষমতা মেনে নিতে অস্বীকার করা হবে সেখানে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। বস্তুতঃ কোরআন যেখানে দীর্ঘদিন যাবত আত্মরক্ষামূলক জিহাদের বারবার তাকীদ করে, সেখানে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তার শেষ লক্ষ্য এটাও ঘোষণা করে যে ঃ

هُوَ الَّذِىٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ (التوبة : ٣٣)

"তিনিই (আল্লাহ) যিনি তাঁর রসূলকে হেদায়েত এবং সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন যেন তা তিনি সমুদয় দ্বীনের উপরে বিজয়ী করতে পারেন। তা এ ব্যাপারটা মুশরিকদের কাছে যতই অবাঞ্ছিত হোক না কেন।"
-(সূরা আত তওবা ঃ ৩৩)

সমুদয় দ্বীনের উপর বিজয়ী করার অর্থ আদর্শের বিজয়—(IDEOLOGICAL VICTORY) এবং রাজনৈতিক বিজয়ও। বস্তুতঃ এ কারণেই তিনি এ ঘোষণার সাথে আরও আদেশ দিয়েছেন ঃ

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً -(التوبة : ٣٦)

"তোমরা সকলে মিলে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যেমন তারা সকলে মিলে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।"-(সূরা আত তওবা ঃ ৩৬)

নবী করিম (সা) বলেন যে, এ যুদ্ধ এবং জিহাদ এমন এক প্রয়োজন ও দায়িত্ব যা কখনও শেষ হবার নয় এবং তিনি উম্মতকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন ঃ

اَلْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِىَ اللّٰهُ اِلٰى اَنْ يُّقَاتِلَ اٰخِرُ اُمَّتِىْ اَلدَّجَّالَ لَايُبْطِلُهٗ جَوْرُ جَائِرٍ وَّلَا عَدْلُ عَادِلٍ -

"জিহাদ আসার সময় থেকে আরম্ভ করে ঐ সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে, যতক্ষণ না আমার উম্মতের শেষ ব্যক্তি দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। এ জিহাদ না কখনও কোন জালেম শাসকের জুলুমের জন্যে স্থগিত থাকবে, আর না কোন ন্যায় বিচারকের ন্যায় বিচারের জন্যে।"

নবী করিম (সা) তাঁর শেষ জীবনে এবং খোলাফায়ে রাশেদীন (রা) তাঁদের সময়ে বাইরের শাসকদের কাছে ইসলামের যে দাওয়াত পেশ করেছিলেন এবং

www.pathagar.com

তা অস্বীকার করার কারণে যেভাবে শক্তি প্রয়োগে তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত বানিয়েছিলেন তা ঐ দায়িত্ব ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই।

যেহেতু এ জিহাদের ধরন আত্মরক্ষামূলক নয়, সে জন্যে একে অগ্রাভিযানমূলক জিহাদ বলা উচিত। অগ্রাভিযানমূলক জিহাদ সম্পর্কে দু'টি বিষয় মনের মধ্যে সুস্পষ্ট হওয়া দরকার ঃ

১. একটি হলো এই যে, তার উদ্দেশ্য কখনও মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা নয়, ইসলামের সম্পর্ক মনের সাথে এবং মনকে জোর করে কোন কিছুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল করা যায় না। অতএব জোর করে ইসলামও পয়দা করা যায় না। কোরআন মজিদে একথা বারবার বলা হয়েছে যে, আল্লাহ যদি এরূপ চাইতেন যে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেউ পথভ্রষ্ট এবং অবাধ্য না থাক, তাহলে তিনি তাকে মুমেন এবং মুসলিম করেই পয়দা করতেন অথবা পয়দা করার পর বলপূর্বক মুসলমান বানিয়ে দিতেন। لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا (الرعد : ٣١)- এ কাজ তাঁর নবী এবং উম্মতের জন্যে রেখে দিতেন না যে তারা তাদেরকে বলপূর্বক মুসলমান বানাবে।

কিন্তু যে উদ্দেশ্যে মানুষকে পয়দা করা হয়েছে, তাকে সামনে রেখে এ ধরনের জবরদস্তিমূলক ইসলাম কিছুতেই ঠিক হতো না। অতএব তিনি তা করেননি। বস্তুতঃ তাঁর সুস্পষ্ট ঘোষণা এই যে, তিনি মানুষকে দ্বীনের ব্যাপারে স্বাধীন করে পয়দা করেছেন। বলপ্রয়োগে কোন কাজ নেয়া হয়নি। لَاۤ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ (البقرة : ٢٥٦)- "দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৬)

এমতাবস্থায় তিনি কি করে এটাকে সঠিক বলতে পারেন যে, দ্বীনের ব্যাপারে আমি বলপ্রয়োগ না করলেও আমার নবীগণ ও মুসলিম বান্দাগণ তা করবে তাঁর ঘোষণায় পরিষ্কার এই যে কোন অবস্থাতেই ইসলাম গ্রহণে বলপ্রয়োগ করা হবে না। না জন্মগতভাবে, আর না বাহির থেকে, না রাজনৈতিক দিক থেকে। এ ব্যাপারে প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনতা আছে। সে ইচ্ছা করলে তা গ্রহণ করতে পারে এবং ইচ্ছা করলে গ্রহণ নাও করতে পারে।

২. দ্বিতীয় কথা এই যে, কোন একটি জাতিকে প্রভু এবং অন্যটিকে তার গোলাম বানাবার অভিযানও এটা কিছুতেই নয়। অর্থাৎ যাকে সাম্রাজ্যবাদ বলা হয়, তার সাথে ইসলামের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। পক্ষান্তরে এটা হচ্ছে শুধুমাত্র এমন কিছু মৌলিক সত্যতার জন্যে রাজনৈতিক বশ্যতা স্বীকারের অভিযান। যে সত্যতার উপরে গোটা সৃষ্টিজগতের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত আছে

www.pathagar.com

এবং যা মেনে নেয়ার উপরে মানুষের ইহ-পরকালের সাফল্য নির্ভরশীল। অতপর যারা অন্যান্যদের নিকট থেকে এসব বুনিয়াদি সত্যতার শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও আংশিক বশ্যতা স্বীকার করার জন্যে বদ্ধপরিকর তাদের অবস্থা এই যে, তারা স্বয়ং সে সবের সামগ্রিক বশ্যতা স্বীকার করে। এখন চিন্তা করুন, যে দল স্বয়ং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভুর পরিপূর্ণ দাস, তারা অপরকে কিভাবে তাদের দাসে পরিণত করবে? এই বুনিয়াদী সত্যতার আংশিক বশ্যতা নিজেদের জন্যে নয়, বরঞ্চ তাদেরই উপকারের জন্যে স্বীকারে বাধ্য করে। তারা তাদের নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করে না বরঞ্চ দেবার চেষ্টা অবশ্যই করে। কেননা এভাবে তাদের ইহ-পরকালের সুখ-শান্তি লুক্কায়িত আছে। অবশ্যি তাদের আত্মমর্যাদার কাছে এ রাজনৈতিক অধীনতা অসহনীয় মনে হবে। কিন্তু আত্মমর্যাদা একটা মিথ্যা আত্মমর্যাদা বই কিছু নয় এবং এ তাদের আপন স্বার্থেরই পরিপন্থী, অতএব তা কিছুতেই বিবেচ্য বিষয় নয়।

সশস্ত্র জিহাদের শর্তাবলী ঃ সশস্ত্র জিহাদ, আত্মরক্ষামূলক হোক অথবা অগ্রাভিযানমূলক, সবসময়ে করা যায় না। করা যায় শুধুমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রে। অর্থাৎ তার কিছু প্রয়োজনীয় শর্ত আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এ শর্তগুলো পূরণ করা না হবে, ততক্ষণ তা করা কিছুতেই জায়েয হবে না, তাহলে জিহাদ মূল্যহীন ও মর্যাদাহীন হয়ে পড়বে এবং তাকে জিহাদই বলা যাবে না। এমনকি তা কোন সওয়াব ও প্রতিদানের পরিবর্তে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে পড়বে।

সশস্ত্র জিহাদের শর্তাবলী নিম্নরূপ ঃ জিহাদকারী মুসলমানদেরকে হতে হবে স্বাধীন ও আত্মনিয়ন্ত্রণশীল। তাদের যথারীতি একটা সামগ্রিক সামাজিক ব্যবস্থা কায়েম থাকতে হবে এবং একজন খলিফা অথবা আমীরের নেতৃত্বে হতে হবে। এ সামষ্টিক ব্যবস্থা ও শৃংখলা (DISCIPLINE) ব্যতীত যুদ্ধের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে না। আত্মরক্ষামূলক হোক অথবা অভিযানমূলক —যুদ্ধের এ পদক্ষেপ শুধুমাত্র করা যেতে পারে একটি স্বাধীন পরিবেশে এবং একজন ক্ষমতাসম্পন্ন আমীরের পরিচালনাধীনে।[১]

বস্তুতঃ মক্কার পরাধীন জীবনে আত্মরক্ষার জন্যে মুকাবিলা করার অনুমতি নবী করীমকে (সা) দেয়া হয়নি। অথচ কুরাইশদের অত্যাচার নির্যাতনের চরম

১. এর অর্থ এই নয় যে, কোন দেশের মুসলমান যদি স্বাধীন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণশীল না হয় এবং তাদের উপর যদি নির্যাতন হতে থাকে, তাহলে তারা এ নির্যাতন থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করবেন। কোন জালেমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাও পুণ্যের কাজ। যদি নিজেদের আত্মরক্ষার কাজে কেউ মৃত্যুবরণ করে তাহলে সেও আল্লাহর নিকট শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ اَهْلِهٖ اَوْ دُوْنَ دَمِهٖ اَوْ دُوْنَ دِيْنِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ - কিন্তু সত্যি কথা এই যে, যে পারিভাষিক জিহাদ ও যুদ্ধের কথা এখানে বলা হয়েছে তা অন্য জিনিস এবং নিজেদের জান-মাল রক্ষা করার জন্যে জালেম ও আক্রমণকারীর মুকাবিলা করা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। —গ্রন্থকার

www.pathagar.com

পর্যায়ে পৌছেছিল। এ অনুমতি দেয়া হয়েছিল হিজরতের পর এবং মদিনায় একটা স্বাধীন পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার পর যেখানে নবীর নেতৃত্বে যথারীতি একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়েছিল। এ অবস্থা অন্যান্য নবীগণেরও ছিল যাদের দাওয়াত সশস্ত্র জিহাদের পর্যায়ে পৌছেছিল।

যতক্ষণ পর্যন্ত এসব শর্ত পূরণ না হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বীনের কারণে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদ সহ্য করাই সত্যিকার জিহাদ।

দ্বিতীয়তঃ বিপক্ষ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করার প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন করতে হবে। কেননা শরীয়ত তার অনুসারীদের নিকটে স্থানে স্থানে মূলনীতি বর্ণনা করেছে।

لاَتُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلاَّ وُسْعَهَا ـ(البقرة : ٢٣٣)

"কোন ব্যক্তির উপরে তার শক্তি সামর্থ অনুযায়ী দায়িত্ব চাপানো হয়।"
–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৩)

এ মূলনীতি অনুযায়ী শরীয়ত এ হেদায়েতও দিয়েছে ঃ

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ـ(التغابن : ١٦)

"আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর—যতখানি শক্তিতে কুলায়।"
–(সূরা আত তাগাবুন ঃ ১৬)

অতএব দুশমনের সংগে লড়বার জন্যে যতক্ষণ না প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন করবে, ততক্ষণ জিহাদ করার দায়িত্ব মুসলমানদের উপর অর্পিত হবে না।

তৃতীয় কথা এই যে, জিহাদ এবং কেতাল পুরোপুরি আল্লাহর পথে হতে হবে। সংগ্রামকারী মুসলমান শুধু দ্বীনের জন্যে এবং আল্লাহর কালেমা সমুন্নত করার জন্য সংগ্রাম করবে। পাপ ও অত্যাচারের মূলোচ্ছেদ করা এবং নেকী ও ইনসাফ কায়েম করাই তাদের উদ্দেশ্য হবে, এ সবকিছু এ জন্যে করতে হবে যে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন, এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য ও প্রেরণা এ যুদ্ধের পেছনে থাকবে না।

নবী করিমকে (সা) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল "একজন মালে গনিমতের জন্যে যুদ্ধ করে, অন্যজন খ্যাতি অর্জনের জন্যে, তৃতীয় ব্যক্তি (জাতীয় অথবা আঞ্চলিক স্বার্থের জন্যে, পারিবারিক অথবা অন্য কোন) গৌরব রক্ষার্থে করে। এ তিনের মধ্যে কার যুদ্ধ আল্লাহর পথে ?

www.pathagar.com

নবী (সা) বলেন ঃ

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

"যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর কালেমা সমুন্নত করার জন্যে লড়াই করে, তার লড়াই (জিহাদ) হবে আল্লাহর পথে।"–(বুখারী ও মুসলিম)

একবার একজন নবীকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রসূল, এক ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করতে চায়, কিন্তু তার সাথে দুনিয়ার স্বার্থও জড়িত আছে।"

তার সম্পর্কে নবী (সা) বলেন ঃ لَا اَجْرَلَهٗ "তার জন্যে কোন প্রতিদান নেই।"–(আবু দাউদ)

এমনিভাবে তিনি মূলনীতি বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ

.... لَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَصْبِيَّةً وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَّاتَ عَلٰى عَصَبِيَّةٍ ـ

"সে আমাদের নয়, যে যুদ্ধ করে অন্ধ বিদ্বেষের জন্যে এবং সেও আমাদের নয়, যে মৃত্যুবরণ করে অন্ধ বিদ্বেষের কারণে।" —(আবু দাউদ)

প্রথম দু'টি শর্তের আবশ্যকতা তো একেবারে সুস্পষ্ট। কিন্তু উপরে বর্ণিত তৃতীয় শর্তটির প্রয়োজনীয়তা বুঝতে হলে একটু চিন্তা করে দেখতে হবে। উপরে বলা হয়েছে যে, ইসলাম অনাচার ও ফেৎনা উৎপাটনের জন্যে এবং নেকী ও খোদা পুরস্তি কায়েম করার জন্যে যুদ্ধে আদেশ দিয়েছে। এখন যারা তাদের অন্তরে লালিত-পালিত ভ্রান্ত প্রেরণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে, তারা কি যুদ্ধের ফলে নেকী এবং খোদা পুরস্তির বিস্তার লাভ করতে পারবে ? নিশ্চয়ই না। এসব লোক যা কিছু করবে তা শুধু এই যে, একটি অনাচারের স্থলে আর একটি প্রতিষ্ঠিত করবে। এটা ইসলামের খেদমতের পরিবর্তে তার শত্রুতা সাধন করাই হবে। কারণ এসব লোক অনাচারের এ খেলা ইসলামের নামেই খেলবে যার ফলে আল্লাহর বান্দা ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে।

দ্বীনের মধ্যে জিহাদের গুরুত্ব

যে জিহাদের উপর দ্বীনের অস্তিত্ব নির্ভরশীল এবং যা ঈমানের স্বাভাবিক চাহিদা, দ্বীনের মধ্যে তার গুরুত্ব কম নয়, এ কারণেই আপনি দেখেছেন যে, কোরআন মজিদ যখন ঈমানদারদের বুনিয়াদী গুণাবলী বর্ণনা করে তখন তার মধ্যে জিহাদকে অবশ্যই শামিল করে। যেমন ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ط (انفال : ٧٤)

www.pathagar.com

"এবং যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর জন্যে বাড়ি-ঘর ছেড়েছে এবং জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, তারাই সত্যিকার মুমেন।"–(সূরা আল আনফাল ঃ ৭৪)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ط

"ওগো যারা ঈমান এনেছো শুনে রাখ। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসার কথা বলব, যা তোমাদেরকে (আখেরাতের) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে ? তাহলো এই যে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং খোদার পথে নিজের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করবে।"–(সূরা আস সফ ঃ ১০-১১)

জিহাদ ব্যতীত সত্যিকার দ্বীন ও ঈমান এবং আখেরাতের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন ধারণাই করা যেতে পারে না।

এ আয়াতটিতে যদিও সশস্ত্র জিহাদেরই উল্লেখ করা হয়েছে, তথাপি মৌলিক দিক দিয়ে এ আদেশের মধ্যে জিহাদের দ্বিতীয় প্রকারও শামিল আছে। তার অর্থ এই যে, সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী জিহাদের প্রত্যেক প্রকৃতি ও ধরন ঈমানের কষ্টিপাথর। আসুন আল্লাহ ও রসূলের (সা) ভাষায় এ বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা ও সাক্ষ্য দান জেনে রেখে দিই।

আভ্যন্তরীণ জিহাদ ঃ সর্বপ্রথম আভ্যন্তরীণ জিহাদ সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। উপরে এ বিষয়ে জানতে পারা গেছে যে, কোরআন মজীদ এ জিহাদকে ঈমান ও মুনাফেকীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী রেখা রূপে বর্ণনা করেছে। নবী (সা) তাকে ঈমানের প্রয়োজনীয় নিদর্শন বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ কেতাব ও সুন্নাহ উভয়েরই সিদ্ধান্ত এই যে, যে হৃদয়ের মধ্যে ভাল কাজের উপদেশ ও মন্দ কাজের বাধা দেবার প্রেরণা থাকে না তার মধ্যে মুনাফেকীর অন্ধকারই বিরাজ করে। ঈমানের আলো সেখানে থাকতে পারে না। কেননা একজন ঈমানদার ব্যক্তির পক্ষে মন্দ কাজ সহ্য করা কিছুতেই সম্ভব নয়। কোন মন্দ কাজ দেখার পর সে যদি কিছু করতে না পারে, এমন কি তার বিরুদ্ধে মুখও খুলতে না পারে, তাহলে অন্ততপক্ষে মনে মনে তাকে তার মন্দ বলাই উচিত। এ হলো ঈমানের সবচেয়ে দুর্বলতম অবস্থা। কোন মুসলমান যদি এরূপ মনও না রাখে, তাহলে সে আল্লাহ ও রসূলের নিকটে মুসলমানই নয়।

www.pathagar.com

ঈমানের সাথে এ জিহাদের স্বাভাবিক সম্পর্ক এত গভীর যে, তাকে জাতির জীবন মৃত্যুর নিদর্শন বলা হয়েছে। এরূপ জাতির এ জগতে কোন মূল্যই থাকে না। যে জাতির ভালো লোকেরা শুধু তাদের নিজেদের মধ্যে ভালো হওয়া নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে এবং তাদের চারপাশে অত্যাচারের প্লাবন দেখেও তার কোন পরোয়া করে না বনের শুকনো ঘাস পাতা যেভাবে জ্বালিয়ে দেয়া হয়, তেমনি এ জাতিকেও ধ্বংস করে দেয়া হয়। এভাবে ধ্বংস যখন আসে, তখন পাপাচারী এবং পাপাচারের নীরব দর্শক পুণ্যবান নির্বিশেষে উভয় দলকে নিয়ে জনপদ বিধ্বস্ত করে দেয়া হয়। আর এ পাইকারী শাস্তি থেকে রক্ষা যদি কেউ পায়, তাহলে একমাত্র তারাই রক্ষা পেতে পারে, যারা অনাচার এ প্রবল বন্যার মধ্যেও নিজেদের কর্তব্য ও দায়িত্ব ভুলে যায়নি এবং নিজেদের সাধ্যমত লোককে অনাচার থেকে দূরে থাকার আদেশ উপদেশ দিয়ে চলেছে। জাতিসমূহের প্রাচীন ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে খোদায়ী কানুনের বাস্তবায়নেরই ইতিহাস। কোরআন মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেবার জন্যে যে ইতিহাস উল্লেখ করে বলেছে ঃ

فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْ بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ قَلِيْلاً مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ج (هود : ١١٦)

"তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে এমন ভালো লোক কেন হয়নি যারা যমীনের উপরে অনাচার বিপর্যয় সৃষ্টিকে বাধাদান করতো শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতীত, যাদেরকে আমি তাদের মধ্য থেকে শাস্তি থেকে রক্ষা করেছি।"–(সূরা হুদ ঃ ১১৬)

নবী করিম (সা) এ শাস্তি ও নাজাতের পদ্ধতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলেন ঃ

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَتَاْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْلَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهٗ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ -(ترمذى)

"কসম সেই সত্তার যার হাতে আমার জীবন রয়েছে, তোমরা অবশ্যই ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে বাধাদান করতে থাকবে। নতুবা সেদিন শীঘ্রই আসবে যেদিন আল্লাহ তোমাদের উপরে আজাব নাযিল করবেন। অতপর তোমরা তাকে ডাকতে থাকবে। কিন্তু তোমাদের কোন কথাই শুনা হবে না।"–(তিরমিযি)

www.pathagar.com

এ ধরনের আরও এরশাদ আসলে খোদায়ী ঐ ফরমানের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বিশেষ ঃ

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ـ(انفال : ٢٥)

"ঐ ফেৎনা থেকে দূরে থাক, যার আক্রমণ শুধুমাত্র ঐসব লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না যারা জুলুমের পথ অবলম্বন করেছে। জেনে রাখ যে আল্লাহ বড়ো কঠোর শাস্তি দাতা।"–(সূরা আল আনফাল ঃ ২৫)

বনী ইসরাঈল জাতি আল্লাহ তায়ালার কঠোর শাস্তির সম্মুখীন তখনই হয়েছিল যখন তাদের মধ্য থেকে এই আভ্যন্তরীণ জিহাদের অনুভূতি প্রায়ই শেষ হয়ে গিয়েছিল। বনের আগাছার মতো অনাচার স্বাধীনভাবে বেড়ে চলেছিল এবং তার থেকে সমাজকে দূরে রাখার কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টাই তারা করেনি। কোরআন এ প্রসংগে বলে ঃ

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ـ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ○ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ـ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ○ (المائدة : ٧٨-٧٩)

"বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরের আচরণ অবলম্বন করেছিল, তাদের উপরে মরিয়ম পুত্র ঈসার ভাষায় অভিসম্পাৎ করা হয়েছে। এ জন্যে করা হয়েছিল যে, তারা অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী হয়েছিল। তাদের মধ্যে অনাচার করা হতো। তার থেকে একে অপরকে বিরত রাখত না। তাদের এ আচরণ কতই না মন্দ ছিল।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৭৮-৭৯)

এই প্রকারের জিহাদ, শাহাদতে হকের ইতিবাচক দিক থেকেও অধিক গুরুত্ব রাখে। কিন্তু একদিক দিয়ে এর গুরুত্বই সর্বাধিক। কারণ বহির্জগতে ইসলামের সাক্ষ্যদানের সাফল্য নির্ভর করে একথার উপরে যে, এ সাক্ষ্যদাতা-গণের আপন সমাজও নিজেদের আমলের দ্বারা সে সাক্ষ্যদানের শরীক হবে। অন্যথায় যদি একদিকে লোকের কাছে ইসলামের সত্যতা প্রমাণ করা হয় এবং অন্যদিকে স্বয়ং ইসলামের অনুসারীগণ খোদাদ্রোহিতার প্রতি তাদের অনুরাগ প্রমাণিত করে, তাহলে জগত এ সাক্ষ্যদানের কতটা প্রভাব স্বীকার করবে ? এমতাবস্থায় সে হয়তো তাকে শুধু মুসলিম জাতীয়তাবাদের গর্ব অহংকারের প্রেরণা ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ মনে করবে। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত না

www.pathagar.com

মুসলিম জাতি তাদের আভ্যন্তরীণ অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত থাকবে, ততক্ষণ তারা এ মর্যাদা লাভ করতে পারে না যে, অপরের সামনে ইসলামের বাণী এবং কোরআনের দাওয়াত নিয়ে হাজির হবে।

দাওয়াতী ও আদর্শমূলক জিহাদ

এখন দাওয়াতী ও আদর্শমূলক জিহাদের গুরুত্ব অনুধাবন করা যাক। জাতি হিসাবে মুসলিম জাতির অস্তিত্ব যদি ইসলামের সাক্ষ্যদানের জন্যে হয়ে থাকে, তাহলে এতে সন্দেহ নেই যে, তাদের জন্যে এ জিহাদ আবশ্যকতা ও ব্যাপকতার দিক দিয়ে অসাধারণ গুরুত্বের অধিকারী। তার আবশ্যকতাও সুস্পষ্ট। যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামকে অপরের কাছে যেভাবে পেশ করা দরকার সেভাবে পেশ করা হলো না, ততক্ষণ তার সাক্ষ্যদানের প্রশ্নই উঠতে পারে না। অতএব এটা অপরিহার্য যে, প্রয়োজনীয় যুক্তি প্রমাণাদিসহ ইসলাম পেশ করতে হবে। লোকের কাছে সঠিকভাবে তার ব্যাখ্যা করে তাদের মনের গ্রন্থি এক একটি করে উন্মোচন করে দিতে হবে।

এখন তার ব্যাপকতাও গোপন কিছু নয়। ইসলাম যদি এক হয় তো গায়ের ইসলাম একের অনেক বেশী। ইসলামের একটা সরল ব্যাখ্যা এবং গতানুগতিক তবলীগের জন্যেও একটা বক্তৃতাই তো যথেষ্ট হতে পারে, কিন্তু যাকে 'ইসলামের সাক্ষ্যদান' বলা হয়, তা ঐ সরল ব্যাখ্যা এবং গতানুগতিক তবলীগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কেননা 'সাক্ষ্যদান' শব্দটির মর্মকথাই গতানুগতিক তবলীগ থেকে অনেক মহান। দ্বিতীয়তঃ যাদের সামনে এ সাক্ষ্যদান করতে হবে তারা একই চিন্তাধারা ও একই মতবাদের লোক নয়। বরঞ্চ তারা বিভিন্ন মতবাদ, বিভিন্ন চিন্তাধারায় (Schools of Thoughts) এবং বিভিন্ন ইজম ও ধর্মের অনুসারী। সাক্ষ্যদান এ সকলের সামনেই করতে হবে। এখন অনুমান করুন যে, এ যুগে এ দায়িত্ব পালনের জন্যে কত বড় বিশাল ও বিস্তৃত ক্ষেত্রে সংগ্রাম চালাতে হবে। কত রকমারি অস্ত্রের মুকাবিলা করতে হবে। অতপর তৃতীয় প্রকারের জিহাদ (সশস্ত্র জিহাদ)। বিশিষ্ট অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং কতগুলো শর্তপূরণের পরে করা যেতে পারে। কিন্তু এই আদর্শের প্রচারমূলক জিহাদের অবস্থা এই যে, এর জন্যে সময় এবং পরিবেশের যেমন কোন বাধা-নিষেধ নেই, তেমনি কোন শর্তেরও বালাই নেই। এ দায়িত্ব পালন করতে হবে যে কোন অবস্থায় ও পরিবেশে এবং যে কোন যুগে ও স্থানে। এ এমন এক দায়িত্ব যার কোন গুরুত্ব নেই, শেষও নেই, যা কখনও স্থগিত রাখা যায় না এবং যতদিন পর্যন্ত সশস্ত্র জিহাদের প্রয়োজনীয় অবস্থা ও পরিবেশ অনুকূল না হয়, ততদিন সত্যের জিহাদের সবকিছুই এর উপর নির্ভরশীল। বস্তুতঃ অধিকাংশ নবীদের ইতিহাস একথা বলে যে, তাঁদের নবুয়তের গোটা সময়কাল

www.pathagar.com

এ জিহাদেই সীমিত ছিল এবং সশস্ত্র জিহাদের সময় সুযোগ তাদের মোটেই আসেনি। সত্য কথা এই যে, মৌলিক দিক দিয়ে এ আদর্শের প্রচারমূলক জিহাদই বহির্জগতের সাথে সত্যিকার জিহাদ। সশস্ত্র জিহাদ তো একটা বাধ্যবাধকতার ফল। কেননা, দ্বীনের দাওয়াত এবং শাহাদতে হকের উদ্দেশ্য হচ্ছে লোককে খোদাভীরু বানানো এবং তাদের মনে ঈমানের সঞ্চার করা, আর মনের মধ্যে খোদাভীতি ও ঈমান পয়দা হয় ভালো কথা ও ন্যায়সংগত যুক্তির দ্বারা তরবারীর দ্বারা নয়, তরবারী এ জন্যে ব্যবহার করা হয় যে, ঐসব ভালো কথা ও ন্যায়সংগত যুক্তি প্রমাণাদির পেশ করার জন্যে পথের প্রতিবন্ধকতা দূর করা হয়।

এ জিহাদ আল্লাহর দৃষ্টিতে এতো মর্যাদা লাভ করে যে, একে তিনি তাঁর সাহায্য বলে বর্ণনা করেন এবং জিহাদকারীগণকে বলেন—তাঁর সাহায্যকারী যদিও তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দাস।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ط قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা সব আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও। যেমন মরিয়ম পুত্র ঈসা হাওয়ারীদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, কে আছে এমন যারা আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে আমার সাহায্যকারী হতে পারে ? তখন হাওয়ারীগণ জবাবে বলেছিল, আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী।"

–(সূরা আস সফ ঃ ১৪)

সকলেই একথা জানে যে, হযরত ঈসার (আ) দাওয়াত সশস্ত্র জিহাদের পর্যায়ে পদার্পণই করেনি। তাঁর সবকিছুই আদর্শ প্রচারের জিহাদ পর্যন্ত সীমিত ছিল। এতদসত্ত্বেও তাঁর হাওয়ারীদেরকে (অনুসারী সংগী-সাথী) আল্লাহর সাহায্যকারী বলা হয়েছে। তাঁর অর্থ এই যে, বিরাট সম্মানজনক উপাধি তাঁরা লাভ করেছিলেন—আল্লাহর দ্বীন লোকের মধ্যে পৌছাবার হক আদায় করে। এ স্থানে 'হক আদায় করা' শব্দগুলো ভালো করে হৃদংয়গম করে নিন। এর অর্থ হলো, আল্লাহর সাহায্যকারী হওয়ার মর্যাদা তখনি লাভ করা যায়—যখন ঐ দ্বীনকে অপরের কাছে পৌছাবার ব্যাপারে নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ও চেষ্টা সর্বত্র পুরোপুরি নিয়োজিত করা হয়। যখন প্রতিকূল অবস্থাতেও নিজেদের আওয়াজ বুলন্দ রাখা হয়। যখন বিপদের ঝড়-ঝনঝায়ও সে আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে যায় না। এ শুধু অনুমান নয় বরঞ্চ কোরআন থেকেও তা জানতে পারা যায়। বস্তুতঃ সূরায়ে আলে ইমরানে একথার বিশদ বিবরণ বিদ্যমান আছে। مَنْ اَنْصَارِيْ

www.pathagar.com

اِلَى اللّٰه শব্দগুলো হযরত ঈসা (আ) তার মুখ থেকে তখনি বের করেছিলেন যখন তাঁর সম্বোধিত বনী ইসরাইলে শেষ বারের মতো তাঁর দাবী মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল এবং তাদের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে শয়তানি তৎপরতা শেষ সীমায় পৌঁছেছিল, এরশাদ হচ্ছে ঃ

فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ط قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ج اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ○

"অতপর ঈসা যখন অনুভব করলেন যে—এসব লোক (তাঁর দাওয়াত শেষ বারের মতো) অস্বীকার করলো, তখন তিনি বললেন, কে আছ আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে আমার সাহায্যকারী ? তখন হাওয়ারীগণ জবাবে বলেছিল, আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। আপনি সাক্ষী থাকুন, আমরা তাঁর অনুগত।"

—(সূরা আলে ইমরান ঃ ৫২)

জানা গেল যে, মুমেনের 'আল্লাহর সাহায্যকারী' হওয়ার সিদ্ধান্ত তখন হয়, যখন দ্বীনের দাওয়াত তার সাধারণ প্রচার প্রোপাগাণ্ডার স্তর অতিক্রম করে কঠিন বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। যারা সে সময়েও তাদের প্রচার বন্ধ রাখে না এবং প্রতিটি বিবাদ উপেক্ষা করে আল্লাহর বাণী তাঁর বান্দাদের কাছে পৌঁছাতে থাকেন, তাঁদেরকেই বলা হয় 'আল্লাহর সাহায্যকারী'। কেননা, দাওয়াতের এরূপ প্রচেষ্টাকেই সত্যিকার অর্থে 'জিহাদ' এবং 'আল্লাহর দ্বীনের মদদ বা সাহায্য' বলা হয়।

সশস্ত্র জিহাদের মর্যাদা

সর্বশেষ সশস্ত্র জিহাদের মর্যাদার পর্যালোচনা করা যাক ঃ

কোরআন মজিদ এবং হাদীসের পৃষ্ঠাগুলো এ আমলটির মহত্ব বর্ণনায় পঞ্চমুখ। তা দেখলে মনে হয় যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে এ আমলটি যত প্রিয়, নামায ব্যতীত আর অন্য কোন আমল ততটা প্রিয় নয়। হকের দুশমনদের মুকাবিলায়, আদর্শ প্রচারে জিহাদকারীদেরকে যখন তিনি তাঁর সাহায্যকারী বলে অভিহিত করেছেন, তখন অনুমান করুন যে, তাঁদেরকে তিনি কি বলে অভিহিত করেছেন, যাঁরা তাঁর দ্বীনের জন্যে, তাঁদের শেষ সম্বলটুকু বিলিয়ে দেয়ার জন্যে, মাঠে নেমে পড়েন। তিনি তাঁদেরকে তাঁর সাহায্যকারী শুধু নয়, প্রিয় বলেও আখ্যায়িত করেন।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ۔

www.pathagar.com

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন। যারা তাঁর পথে এমনভাবে কাতারবন্দী হয়ে যুদ্ধ করেন, যেন তারা একটা গলিত ধাতু নির্মিত প্রাচীর।"–(সূরা আস সফ ঃ ৪)

এই 'মাহবুবিয়াতের' (প্রিয় হওয়ার) সামান্য ব্যাখ্যা নবীর (সা) ভাষায় শুনুন ঃ

"একটি রাত ও দিনের জন্যে (যুদ্ধের সময়) সীমান্ত পাহারা দেয়া এক মাসের অবিরাম নামায রোযা থেকে উত্তম।"–(মুসলিম)

"প্রত্যেক ব্যক্তির আমল তার মৃত্যুর সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ঐ ব্যক্তির ব্যাপার স্বতন্ত্র যে আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্যে শিবির স্থাপন করেছে। কারণ তার এই আমল কিয়ামত পর্যন্ত বাড়তে থাকে।"–(তিরমিযি)

"ঐ সত্তার কসম, যার মুঠির মধ্যে আমার জীবন, আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্যে একটি সকাল অথবা সন্ধ্যায় অভিযান দুনিয়া ও তন্মধ্যস্থ সবকিছু থেকে অধিক মূল্যবান এবং খোদার পথে দুশমনের মুখোমুখী দাঁড়ানো ঘরে বসে সত্তর বছরের নামায থেকেও উৎকৃষ্ট।"–(তিরমিযি)

"আল্লাহর পথে জিহাদকারীর অবস্থা ঐ ব্যক্তির মতো যে মুজাহিদের জিহাদ থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত অবিরাম রোযা রাখে, নামায পড়ে, কোরআন তেলাওয়াত করে এবং না তার রোযার কোন শ্রান্তি আসে, না নামাযে।"–(বুখারী ও মুসলিম)

শুধু এই নয় যে, আল্লাহর কালেমা সমুন্নত করার জন্যে জিহাদ একমাত্র জিহাদকারীকেই আল্লাহর মহব্বত, মাগফেরাত ও রহমতের হকদার বানিয়ে দেয় না, বরঞ্চ ঐসব লোকও উচ্চমর্যাদা লাভ করে, যারা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে জিহাদকারীদের এবং সাহায্য করে জিহাদের প্রস্তুতির জন্যে। নবী বলেন–

"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারী কোন ব্যক্তির জন্যে জিহাদের সরঞ্জাম সংগ্রহ করে দেয় সে যেন স্বয়ং জিহাদ করলো এবং যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদের অনুপস্থিতিতে তার পরিবারবর্গের দেখা-শুনা করল, সে যেন স্বয়ং জিহাদে শরীক হলো।"–(মুসলিম ও বুখারী)

"আল্লাহ তায়ালা যুদ্ধে ব্যবহৃত একটি তীরের বদৌলতে তিন ব্যক্তিকে বেহেশতে পাঠান, প্রথম ঐ ব্যক্তি যে সওয়াবের নিয়তে এ তীর বানায়, দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যে, যে তীর দুশমনের প্রতি নিক্ষেপ করে এবং তৃতীয় ঐ ব্যক্তি যে তীর (জিহাদের জন্যে) সংগ্রহ করে দেয়।"–(আবু দাউদ)

www.pathagar.com

জিহাদের জন্যে অস্ত্র নির্মাণকারী ও সংগ্রহকারী যদি এতটা মর্যাদার অধিকারী হয়, তাহলে সেই ব্যক্তির জন্যে আল্লাহ কত মর্যাদা লিখে রেখেছেন যে ব্যক্তি তাঁর জন্যে নিজ গৃহ থেকে বের হয়ে পড়েন, যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করে আহত হন, রক্ত স্নাত হন এবং শেষ পর্যন্ত নিজের জীবন আপন প্রভুর হাতে সুপর্দ করেন। এমন ব্যক্তির সৌভাগ্য অনুমান করা যায় আল্লাহ পাকের নিম্ন এরশাদ থেকে ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ۝ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ..... يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ (ال عمران : ١٦٩-١٧١)

"কখোনও মৃত বলো না ঐসব লোকদেরকে যারা শহীদ হয়েছে আল্লাহর পথে। তারা প্রকৃতপক্ষে মৃত নয় বরঞ্চ জীবিত। তারা রিযিক পাচ্ছে তাদের প্রভুর কাছ থেকে এবং তারা এ অবস্থায় আছে যে, আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে তাদেরকে যা কিছুই দেন, তাতেই সম্পূর্ণরূপে তুষ্ট ও আনন্দিত থাকে ..... তারা হর-হামেশা সন্তুষ্ট থাকে আল্লাহর নিয়ামতের উপরে, তাঁর দয়া অনুগ্রহের উপরে এবং এটা লক্ষ্য করে যে, আল্লাহ মুমেনদের প্রতিদান নষ্ট হতে দেন না।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৯-১৭১)

মনে রাখতে হবে যে, এ ধরনের মনোমুগ্ধকর কথা শুধু তাঁদের সপক্ষেই বলা হয়েছে যাঁরা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে জীবন দান করেন। কোরআন মজীদের এ বিশেষ ঘোষণা একথা বলে যে, এ আমলটি আল্লাহর কাছে যতটা প্রিয়, কোন সাধারণ আমল ততটা প্রিয় নয়। বরঞ্চ এ একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা রাখে। আল্লাহর রসূল (সা)-এ ব্যাপারে যা কিছু বলেছেন, তার থেকে এ প্রিয় আমলটির স্বতন্ত্র মর্যাদা বিশদ ব্যাখ্যা নিম্ন এরশাদে পাওয়া যায় ঃ

مَا اَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَلَهٗ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا الشَّهِيْدُ يَتَمَنّٰى اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرٰى مِنَ الْكَرَامَةِ۔

"জান্নাতে প্রবেশকারী এমন কোন ব্যক্তিই এ দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবে না যদিও এ দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু তার মালিকানায় দিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু শহীদের অবস্থা তা হবে না। খোদার নিকট থেকে শহীদ যে মর্যাদা লাভ করবে তা দেখে সে কামনা করবে দশবার এ দুনিয়ায় ফিরে আসার এবং দশবারই আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার।"–(বুখারী ও মুসলিম)

www.pathagar.com

এতো গেল আখেরাতের ব্যাপার। এ দুনিয়াতেও আল্লাহর পথের এ শহীদ একটা স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী হন। প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো হয়। তার পরিহিত কাপড় খুলে ফেলে পাকসাফ কাফন পরানো হয়। কিন্তু শহীদ ব্যক্তির ব্যাপারে আদেশ এই যে, তাকে না গোসল করানো হবে, আর না কাফন পরানো হবে। বরঞ্চ যে পোশাকে শহীদ হয়েছেন সে রক্ত রাঙা পোশাকেই তাঁকে দাফন করতে হবে। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ

اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلٰى اُحُدٍ اَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيْدُ وَالْجُلُوْدُ وَاَنْ يُدْفَنُوْا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ۔

"ওহোদের শহীদান সম্পর্কে নবী (সা) হুকুম দিলেন যে তাঁদের কাছ থেকে অস্ত্র ও লৌহবর্ম খুলে নিয়ে তাঁদেরকে রক্ত ও পরিহিত কাপড়সহ দাফন করা হোক।"–(আবু দাউদ)

এর কারণ অন্য একটি হাদীস থেকে জানা যায়। তা এই যে, শহীদানের রক্ত সে ধরনের রক্ত নয়, যাকে ফেকাহর ভাষায় নাপাক বলা হয়। বরঞ্চ তা এমন রক্ত যার চেয়ে অধিকতর পাক জিনিস আর কিছু হতে পারে না। আল্লাহর কাছে তা হয় জাফরানের মতো খোশ রঙ এবং মিশক আম্বরের মতো সুগন্ধ।–(আবু দাউদ)

মোটকথা কেতাব ও সুন্নাহর বর্ণনা মতে এ এক স্বীকৃত সত্য যে, শহীদানের মর্যাদা বিভিন্ন দিক দিয়ে স্বতন্ত্র এবং লোভনীয়। একটু চিন্তা করলে জানতে পারা যাবে যে, এ স্বীকৃত সত্যটি আরও বহু স্বীকৃত সত্যের অস্তিত্বের ঘোষণা করে। একটা এই যে, সশস্ত্র জিহাদ সকল প্রকার জিহাদের মধ্যে সর্বোত্তম। দ্বিতীয় এই যে, এ জিহাদ সবচেয়ে বড়ো নেকি, সবচেয়ে বড়ো এবাদত এবং সবচেয়ে বড়ো খোদা পুরস্তি। বস্তুতঃ নবী পাককে যখন জিজ্ঞেস করা হলো সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জিহাদ কোন্‌টি ; তখন তিনি বলেন ঃ

مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِيْنَ بِمَالِهٖ وَنَفْسِهٖ

"মুশরিকদের বিরুদ্ধে মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করাই সর্বোৎকৃষ্ট জিহাদ।"
–(আবু দাউদ)

আল্লাহর পথে জান-মাল দিয়ে সংগ্রামকারী মুমেন সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হয়ে থাকে। একথাটি অন্যভাবে বলতে গেলে, বলতে হয় যে, আল্লাহর পথে আপন জানমাল দিয়ে সংগ্রাম করা সবচেয়ে উৎকৃষ্ট আমল এবং সবচেয়ে বড়ো নেকি।

www.pathagar.com

যে আমল সবচেয়ে বড়ো, তার প্রতিদানও সবচেয়ে বড়ো হবে। বস্তুতঃ উপরে যেসব কোরআনের আয়াত ও হাদীসের উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে এ সত্যতার সুস্পষ্ট ইংগিত ও ব্যাখ্যা আছে। আরও নিশ্চয়তার জন্যে নবীর (সা) নিম্নের এরশাদগুলো প্রণিধানযোগ্য।

✪ দু'টি চক্ষুকে জাহান্নামের অগ্নি স্পর্শ করবে না। একটি যা আল্লাহর ভয়ে অশ্রু বিসর্জন করে দ্বিতীয়টি যা আল্লাহর পথে পাহারা দিতে গিয়ে রাত্রি জাগরণ করে।–(তিরমিযি)

✪ আল্লাহর পথে জিহাদের ধূলিমাটি এবং জাহান্নামের ধূমরাশি কোন ব্যক্তির জন্যে একত্র হতে পারে না।–(তিরমিযি)

✪ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে এতটুকু সময় যুদ্ধ করেছে যতটুকু সময় লাগে উটনীর দুধ দোহন করতে, তার জন্যে বেহেশত জরুরী হয়ে পড়ে।

–(তিরমিযি)

হুনাইনের যুদ্ধে আনাস বিন আবি মুরসাদ গুনবী (রা) নামক এক সাহাবী সারারাত একটি ঘাঁটিতে পাহারা দেন। সকালে যখন তিনি নবীর খেদমতে হাযীর হলেন, তখন নবী (সা) তাঁকে বললেন ঃ

قَدْ اَوْجَبْتَ فَلاَ عَلَيْكَ اَلاَّ تَعْمَلَ بَعْدَهَا ـ

"তুমি তোমার জন্যে বেহেশত ওয়াজেব করে নিয়েছ, এ আমলের পর আর কিছু না করলে তাতে কিছু আসে যায় না।"–(আবু দাউদ)

যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সম্পর্কে নবী করীম (সা) এক সময়ে হযরত ওমরকে (রা) সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللّٰهُ اَطَّلَعَ عَلٰى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوْا مَاشِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ـ

"তুমি জান না, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের দিকে তাকিয়ে আল্লাহ হয়তো বলেছিলেন–যা খুশী কর, আমি তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছি।"

–(বুখারী)

আল্লাহর দৃষ্টিতে সশস্ত্র জিহাদের যে এত মর্যাদা তাতে আশ্চর্য প্রকাশ করা উচিত নয়। কারণ এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। আল্লাহর বন্দেগীই যদি একজন মুমেনের জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং মুসলিম জাতির অভ্যুত্থান যদি শুধু

www.pathagar.com

এ জন্যে হয়ে থাকে যে, তারা দুনিয়ার সামনে হকের পুরাপুরি সাক্ষ্য দেবে, তাহলে তার বন্দেগী থেকে আর বড়ো বন্দেগী এবং সাক্ষ্য থেকে আর বড় সাক্ষ্য কি হতে পারে যারা নিজের জান দিয়ে এ কাজের আঞ্জাম দিয়েছে ? এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, এ হলো সবচেয়ে বড়ো বন্দেগী এবং হকের এ হলো সবচেয়ে বড় সাফল্য। অন্য কথায় মুসলমানদের অস্তিত্বের যে উদ্দেশ্য, এ সশস্ত্র জিহাদ সেই উদ্দেশ্য পূরণের সবচেয়ে উচ্চমানের প্রচেষ্টা এবং যখন তারা এ জিহাদে নিজেদের জীবনও উৎসর্গ করতে পারে, তখন আল্লাহর বন্দেগীর এবং সত্যের সাক্ষ্যের শেষ স্তর তাদের পায়ের তলায় এসে যায়। কারণ, কোন উদ্দেশ্য অথবা দায়িত্বের জন্যে নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে দেয়া নিশ্চিত-রূপে তার খেদমতের শেষ হকটুকু আদায় করে দেয়া। প্রকৃতপক্ষে এরূপ ব্যক্তিই এ বিষয়ের হকদার যে তাকে এ উদ্দেশ্যের প্রকৃত ধ্বজাবাহী এবং এ দায়িত্বের সবচেয়ে সাচ্চা খাদেম বলা যাবে। যদিও প্রতিটি মুসলমানকে যে তার কথা ও কাজের দ্বারা দ্বীনের সাক্ষ্য দেয়, শহীদ (সাক্ষী) বলা হয়, তথাপি নাম ও উপাধির দিক দিয়ে 'শহীদ' উপাধি শরীয়ত তাঁদের জন্যেই নির্দিষ্ট করে রেখেছে যাঁরা আল্লাহর দ্বীনের জন্যে নিজেদের জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দিয়েছেন। কারণ এঁরা ঐসব লোক যাঁরা ইসলামের সাক্ষ্য দিতে গিয়ে নিজেদের শেষ সম্বলটুকু লুটিয়ে দিয়ে সম্ভাব্য শেষ চেষ্টাটুকুও করে গেছেন রক্তের সাক্ষর এঁকে দিয়ে। এ জন্যে প্রকৃত অর্থে 'শহীদ' উপাধি তাঁদেরই জন্যে শোভা পায়।

এ আলোচনায় একথা সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, এই জানের কুরবানী এক ব্যক্তির ঈমান ও ইসলামের সর্বোচ্চ সোপান। যে সময় মানুষ জিহাদের ময়দানে নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে মৃত্যুকে আলিংগন করে, সে সময় ঈমান ও ইসলামের এমন কোন সম্ভাব্য স্তরই বাকি থাকে না যা সে লাভ করেনি। এমন কি এ মুহূর্ত পর্যন্ত তার জীবন যদি ইসলাহ ও তাকওয়ার উচ্চমানের জীবন হয়ে থাকে, তাহলে এ আমলের বদৌলতে এমন এক উচ্চমর্যাদায় পৌঁছে যায়। সেখানে পৌঁছতে শুধু আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের বিশিষ্ট মর্যাদাই বাকি থাকে।

হযরত ওতবা বিন আবদুস সলমি (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْقَتْلٰى ثَلاَثَةٌ مُؤْمِنٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِذَا لَقِىَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتّٰى يُقْتَلَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ فَذَالِكَ الشَّهِيْدُ الْمُمْتَحَنُ فِىْ خَيْمَةِ اللّٰهِ تَحْتَ عَرْشِهٖ لاَيَفْضُلُهُ النَّبِيُّوْنَ اِلاَّ بِدَرَجَةِ النُّبُوَةِ۔

www.pathagar.com

"আল্লাহর নবী (সা) বলেন, জিহাদের ময়দানে যারা শহীদ হয় তারা তিন প্রকারের। একজন তো ঐ মুমেন ব্যক্তি যে তার জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। সে যখন দুশমনের মুখোমুখী হয়, তখন সে তার সংগে যুদ্ধ করে এবং অবশেষে শহীদ হয়ে যায়। নবী বলেন, এ হলো সাচ্চা এবং পাকাপোক্ত শহীদ। এ ব্যক্তি আরশের নীচে আল্লাহর একটি শামিয়ানায় অবস্থান করবে। তার চেয়ে অধিকতর মর্যাদা যে নবীগণের হবে, তা হবে শুধু নবুয়তের মর্যাদা।"–(দারমী)

সশস্ত্র জিহাদের দ্বীনি গুরুত্বের আর একটা দিক বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। অতএব তা বুঝে নেয়া উচিত। কোরআন হাকিমে এ জিহাদ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে, তার থেকে জানা গেল যে, দ্বীন এবং মিল্লাতের প্রয়োজনের দৃষ্টিকোণ থেকে এ জিহাদ সর্বদা একই ধরনের গুরুত্ব রাখে না। বরঞ্চ কখোন তা হয় নিছক একটি ফযিলত ও দৃঢ়তা প্রদর্শনের কাজ এবং কখনো হয় দ্বীনের অপরিহার্য চাহিদা ও ঈমানের প্রয়োজনীয় নিদর্শন স্বরূপ। এর বিশদ ব্যাখ্যা এই যে, যখন দুশমনের মুকাবিলার জন্যে সর্ব সাধারণের প্রয়োজন হয় না, বরঞ্চ কিছু লোক এর জন্যে যথেষ্ট বিবেচিত হয়, তখন এ জংগী খেদমত শুধু একটি ফযিলতের কাজ হবে। এ কাজ যারা করবে তারা যদিও বিরাট প্রতিদান ও সওয়াবের হকদার হবে এবং উপরে বর্ণিত মর্যাদার অধিকারী হবে, তথাপি যারা এ খেদমতে শরীক হবে না, তাদের প্রতি কোন দোষারূপ করা যাবে না। এমন অবস্থার জন্যে ওয়াদার যোগ্য উভয় প্রকারের মুসলমান হবে, কিন্তু গৃহে অবস্থানকারীদের তুলনায় যুদ্ধকারীদের মর্যাদা অনেক বেশী হবে।

–(সূরা আন নিসা ঃ ৭০)

কিন্তু পরিস্থিতি যখন এর বিপরীত হবে, তখন এই জংগী খেদমত শুধু ফযিলতের বস্তুই থাকবে না, বরঞ্চ দ্বীনের জরুরী চাহিদা এবং ঈমানের কষ্টিপাথর হয়ে পড়বে। বস্তুতঃ নবীর যমানায় যারা সাধারণ ঘোষণা সত্ত্বেও জিহাদের জন্যে বের হয়ে পড়তে শিথিলতা প্রদর্শন করেছে তাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে।[১]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَالَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ط اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ج ... اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا لا وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ـ (التوبة ٣٨-٣٩)

১. তবুক অভিযান প্রসংগে একথা বলা হয়।–(অনুবাদক)

www.pathagar.com

"হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের কি হলো যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়ার জন্যে বলা হয়, তখন তোমরা যমীনের সাথে লেগে থাকছো ? তোমরা কি তাহলে আখেরাতের তুলনায় দুনিয়াকেই ভালোবেসে স্থির হয়ে বসে আছ ?..... (মনে রেখে দিও) যদি তোমরা যুদ্ধের জন্যে বেরিয়ে না পড়ছো, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং তোমাদেরকে সরিয়ে দিয়ে তোমাদের স্থানে অন্যদেরকে নিয়ে আসবেন।"–(সূরা আত তওবা ঃ ৩৮-৩৯)

এভাবে যারা নবীর কাছে নানান বাহানা পেশ করে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি চাইলো—তাদের সম্পর্কে বলা হলো ঃ

لَايَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ○ اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ـ(التوبة : ٤٤ـ٤٥)

"যারা আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে, তারা তোমার কাছে এ বিষয়ে কখন দরখাস্ত করবে না যে মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করা থেকে বিরত থাকার অনুমতি তাদেরকে দেয়া হোক। আর আল্লাহ ও মুত্তাকীদের অবস্থা পরিজ্ঞাত। তোমার কাছে এরূপ আবেদন তো তারাই করছে যারা ঈমান রাখে না আল্লাহ ও আখেরাতের উপরে।"

–(সূরা আত তওবা ঃ ৪৪-৪৫)

এ আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, প্রয়োজনীয় সশস্ত্র জিহাদ থেকে পিছনে পড়ে থাকা ঈমানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এতদসংগে এও জানা যায় যে, খোদার পথে জিহাদ করার প্রেরণা, সংকল্প এবং ইচ্ছা পোষণ ঈমানের একটি অবিচ্ছেদ্য গুণ। অবশ্যি এ একটা স্বতন্ত্র কথা যে, এ জিহাদের সময় সুযোগ কখন আসবে এবং এ জিহাদের প্রয়োজনীয় শর্তগুলো কখন পূরণ হবে। মুমেনের আমল তো সে সুযোগ ও শর্তাবলীর প্রতীক্ষায় নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু তার প্রেরণা এমন কোন কিছুর প্রতীক্ষায় থাকবে না। সে তো এ কাজের জন্যে প্রতিমুহূর্ত প্রস্তুত থাকবে। মুমেন যদি সত্যিকার মুমেন হয়, তাহলে তার মানসিক অবস্থা স্বাভাবিকভাবেই এই হবে। যেই মাত্র তার ডাক আসবে এবং প্রয়োজনীয় শর্তাবলী সবুজ পতাকা (GREEN SIGNAL) দেখাবে, তখন সে তার আবাসস্থানে বসে থাকবে না। নবী (সা) বলেন ঃ

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسَهٗ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ ـ

www.pathagar.com

"যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো যে, সে না দ্বীনের জন্যে জিহাদ করলো, আর না তার মনের মধ্যে জিহাদের কোন বাসনাই পোষণ করলো, সে কোন না কোন দিক দিয়ে মুনাফেকীর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো।"
–(মুসলিম)

এর কারণও অতি সুস্পষ্ট। মুসলমান নামের দলটিকে তো এ জন্যে পয়দা করা হয়নি যে, তারা অন্যের মতো যেভাবে খুশী জীবনযাপন করবে। বরঞ্চ তাদেরকে একটা বিশেষ কাজের জন্যে পয়দা করা হয়েছে। ঐ কাজ এত বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ যে, তা ঠিক মতো করতে গেলে মানুষের যথা সর্বস্ব দাবী করে। অতএব এ দায়িত্ব ও কর্তব্য শুধু ঐ ব্যক্তিই সমাধা করতে পারে যে তার দায়িত্বের তুলনায় দুনিয়ার কোন একটি বস্তুকেও, এমন কি নিজের জীবনকেও প্রিয় মনে করে না। আর প্রকৃত মুসলিম জাতি এ ধরনের ব্যক্তি সমষ্টির নাম যাদের মধ্যে কুরবানীর এ প্রেরণা বিদ্যমান থাকে। নতুবা তারা মানুষের একটি দল এবং উম্মত অবশ্যই হবে, কিন্তু মুসলিম উম্মত বা মুসলিম জাতি হবে না। তাদের দ্বারা সে কাজ কখনই হবে না যার জন্যে তাদেরকে পয়দা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কোরআনের সিদ্ধান্ত আমাদের সামনে আছে। কিছু লোক যখন মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ঐ আচরণ থেকে পশ্চাদপদ হতে চাইলো যা মুসলিম জাতির লোক হিসেবে অবশ্যই তাদের অবলম্বন করা উচিত ছিল, তখন তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হলো ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ز يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ط (المائدة : ٥٤)

"হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের মধ্যে যারা দ্বীন থেকে ফিরে যেতে চায়, তারা ফিরে যাক। (যদি এমন হয়) তাহলে আল্লাহ তাদের স্থানে অন্য লোকদেরকে নিয়ে আসবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালোবাসবে, যারা মুমেনদের প্রতি নম্র ও বিনয়ী হবে কাফেরদের প্রতি হবে কঠোর এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এ ব্যাপারে তারা পরোয়া করবে না কারো তিরস্কার ভর্ৎসনার।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৫৪)

আল্লাহ তায়ালার উপরোক্ত এরশাদের উদ্দেশ্য এই যে, তাঁর দ্বীনের জন্যে যে ধরনের লোকের প্রয়োজন, তাদের মধ্যে কিছু গুণ অবশ্যই থাকতে হবে। যার একটি গুণ হলো আল্লাহর পথে জিহাদ করা। যাদের মধ্যে এ গুণের অভাব হবে তারা দ্বীনের খেদমত, তার রক্ষণাবেক্ষণ এবং সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব কিছুতেই

www.pathagar.com

পালন করতে পারবে না। আর যে মুসলমান এ কাজ করতে পারবে না, সে যেন তার পদমর্যাদা থেকে নিজকেই অপসারিত করছে। এ জন্যেই জিহাদ থেকে পলায়নের পথ অবলম্বন করাকেই দ্বীন থেকে ফিরে যাওয়া বলা হয়েছে। একথা সূরায়ে তওবার পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, "যদি তোমরা জিহাদের জন্যে বের না হচ্ছ তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং তোমাদেরকে সরিয়ে তোমাদের স্থানে অন্যকে নিয়ে আসবেন।" সত্য কথা এই যে, কোন ব্যক্তি বা দলকে তাদের স্থান থেকে তখোনি অপসারিত করা হয়, যখন তারা সে স্থানের যোগ্য আর থাকে না এবং যে কাজের জন্যে তাদেরকে সে স্থানে নিযুক্ত করা হয়েছে সে কাজ আর তাদের দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে না।

www.pathagar.com

ইসলামের দুনিয়াবী বরকত

দুনিয়ার সাফল্য এবং নবীগণের দাওয়াত

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে মোটামুটি যে কথা বলা হয়েছে তাতে এ সত্যটি বারবার উদ্ঘাটিত হয়েছে যে, আল্লাহর প্রকৃত সন্তুষ্টির জন্যে জীবন ও মরণের নামই ইসলাম এবং মুসলমান ঐ ব্যক্তি—যে তার দৃষ্টি হর-হামেশা আখেরাতের প্রতি নিবদ্ধ করে রেখেছে। আখেরাতের স্বার্থের উপরে দুনিয়ার কোন স্বার্থকে সে অগ্রাধিকার দিবে না। এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্ন জাগে যে, এই দ্বীনের সঠিক অনুসরণের পর মুসলমানের দুনিয়ার চিত্রটা কি হবে। তার কাছে দুনিয়ার কোন উল্লেখযোগ্য জিনিস বাকি থাকবে কি? ব্যক্তিগতভাবে কি সে সচ্ছল এবং সমষ্টিগতভাবে সম্মানিত ও ক্ষমতাবান থাকতে পারবে? কিন্তু মনে রাখতে হবে এ একটি সাধারণ ধরনের প্রশ্ন। এ শুধু ইসলাম সম্পর্কেই নয় বরঞ্চ প্রত্যেক ঐ দ্বীন সম্পর্কে হওয়া উচিত যা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। কারণ আসল তত্ত্বের দিক দিয়ে ইসলাম এবং অন্যান্য আসমানী দ্বীনগুলোর মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। ইসলামের মতোই প্রত্যেক দ্বীন ও মযহাব দ্বীনদারী এবং খোদা পুরস্তির শিক্ষা দিয়ে এসেছে, এই বলে যে মানুষ তার নিজকে আল্লাহতে সুপর্দ করে দিবে এবং দুনিয়ার উপরে আখেরাতকে অগ্রাধিকার দিবে। এ জন্যে ন্যায়সংগত এই হবে যে এ ব্যাপারে কোরআনের দাওয়াতের জবাব শুনার পূর্বে অন্যান্য নবীগণের দাওয়াতের জবাব শুনা যাক। এ উদ্দেশ্যে আমরা যখন আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের দাওয়াতের যাচাই পর্যালোচনা করি তখন এর জবাব তা পাওয়া যায় না যা প্রকাশ্যতঃ ধারণা করা হয়। বরঞ্চ পাওয়া যায় ঠিক বিপরীত জবাব। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাই যে, যে নবীই তাঁর জাতিকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি এ নিশ্চয়তার সাথেই জানিয়েছেন যে, "আমার আনুগত্য তোমাদেরকে শুধু আখেরাতেই নয়, দুনিয়ারও সাফল্য দান করবে।" দৃষ্টান্তস্বরূপ হযরত নূহ (আ) তাঁর জাতিকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا لا يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا لا
يُّمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ط

"ক্ষমা ভিক্ষা কর (তোমাদের প্রভুর কাছে)। নিশ্চয় তিনি বড়ো ক্ষমাশীল (তোমরা যদি তা কর তাহলে) তিনি তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে নামিয়ে দিবেন মুষলধারে বৃষ্টিধারা। তোমাদেরকে দান করবেন ধন-

www.pathagar.com

দৌলত ও সন্তান-সন্ততি। তোমাদের জন্যে বানিয়ে দিবেন বাগ-বাগিচা এবং প্রবাহিত করে দিবেন নদ-নদী।"–(সূরা আন নূহ ঃ ১০-১১)

এমনি হযরত হুদের (আ) দাওয়াতের ভাষা ছিল নিম্নরূপ ঃ

يٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ ـ(هود : ٥٢)

"হে আমার জাতি ! তোমরা ক্ষমা ভিক্ষা কর, তোমাদের প্রভুর কাছে। (যদি তা কর তাহলে) তিনি তোমাদের জন্যে বৃষ্টিপাত করবেন অবিরাম ধারায় এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি করতে থাকবেন তোমাদের শক্তি সামর্থ।"
–(সূরা হুদ ঃ ৫২)

সুসংবাদের এ মৌলিক প্রতিশ্রুতির ফলশ্রুতি যদি বাস্তব ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত ঘটনা বহুল সাক্ষ্যসহ দেখতে চান, তাহলে বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের সেই অধ্যায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, যা হযরত মূসার (আ) জন্মের কিছুকাল পূর্বে হতে শুরু হয়েছিল। সে সময় থেকে আরম্ভ করে শেষ নবীর (সা) আগমন পর্যন্ত তাদের জীবন অত্যন্ত হেয়, মর্মন্তুদ ও বিড়ম্বিত ছিল। তাদের এহেন ঘৃণিত জীবন সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন জীবনে তখোনি রূপান্তরিত হয়েছিল যখন তারা খোদার দিকে ফিরে গিয়েছিল এবং দ্বীন অনুসরণের ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছিল। কোরআন বলে ঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ ۙ بِمَا صَبَرُوْا ـ

"এবং তোমার প্রভুর মংগল প্রতিশ্রুতি বনী ইসরাঈলের জন্যে পূর্ণ হয়েছিল। এ জন্যে যে, তারা (সত্যের পথে) ধৈর্য সহকারে দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছিল।"–(সূরা আল আরাফ ঃ ১৩৭)

শুধু যে আপন প্রভুর দিকে ফিরে যাওয়ার জন্যে এবং সত্য পথে অবিচল থাকার জন্যে তাদের ঘৃণিত জীবনের পরিবর্তে সম্মান ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ হয়েছিল তা নয়। বরঞ্চ একটা মূলনীতির ভিত্তিতে তাদেরকে একটা চিরস্থায়ী সুসংবাদ শুনানো হয়েছিল। তাহলো আল্লাহর শোকর গুযারী ও তার নির্দেশাবলী মেনে চলার ব্যাপারে তারা যতদূর অগ্রসর হবে ততবেশী সম্পদ তাদেরকে দান করা হবে।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ ـ(ابراهيم : ٦)

www.pathagar.com

"এবং মূসা যখন তাঁর জাতিকে বললেন—আল্লাহর সেই নিয়ামত স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদেরকে ফেরাউনী দল থেকে রক্ষা করেছিলেন।"
–(সূরা ইবরাহীম ঃ ৬)

.....وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ ـ(ابراهيم : ٧)

"এবং সে সময়ের কথা মনে কর, যখন তোমাদের প্রভু ঘোষণা করেছিলেন যে, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতার আচরণ অবলম্বন কর, তাহলে তোমাদেরকে বেশী বেশী নিয়ামত দানে ভূষিত করব।"–(সূরা ইবরাহীম ঃ ৭)

বস্তুতঃ যতোদিন তারা কৃতজ্ঞতার আচরণ অবলম্বন করেছিল, দুনিয়া দেখেছে যে আল্লাহর সে সুসংবাদ প্রতিশ্রুতি পূরণ না হয়ে যায়নি। বরঞ্চ এমনভাবে পূরণ করা হয়েছে যে, তারা জাতীয় সম্মান মর্যাদার চরম শিখরে উপনীত হয়েছিল এবং যমীনের উপরে এমন কোন জাতি ছিল না যারা সম্মান ও প্রতিপত্তির দিক দিয়ে তাদের সমকক্ষ ছিল। আল্লাহ তাদের স্বর্ণ যুগের উল্লেখ করে তাদের স্মরণ করিয়ে দেন ঃ

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِيْنَ ـ(البقرة : ٤٧)

"হে বনী ইসরাঈলগণ ! আমার সে নিয়ামতের কথা স্মরণ কর—যা আমি তোমাদেরকে দান করেছিলাম এবং দুনিয়ার অনান্য জাতিদের উপরে তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ৪৭)

অতপর যখন তারা শোকরগুযারী অর্থাৎ খোদাপুরস্তি ও দ্বীন অনুসরণ করে চলা পরিত্যাগ করলো, তখন তাদের থেকে সম্মান প্রতিপত্তির মুকুট কেড়ে নেয়া হলো। বস্তুতঃ শেষ নবী (সা) যখন আগমন করেন, তখন এ জাতি পূর্বের লাঞ্ছিত অবস্থায় আবার ফিরে এসেছিল। এ অবস্থা দৃষ্টে কোরআন বলে ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ط (المائدة : ٦٦)

"যদি এ আহলে কেতাব সম্প্রদায় তওরাত, ইঞ্জিল এবং ঐসব হেদায়েত কায়েম করতো যা তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তাদের জন্যে পাঠানো হয়েছিল, তাহলে তাদের জন্যে সম্পদ (রিযক) উপর থেকেও বর্ষিত হতো এবং নীচ থেকেও উদগত হতো।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৬৬)

www.pathagar.com

এখন পৃথক পৃথক জাতির পরিবর্তে একত্রে সমুদয় জাতি সম্পর্কে আল্লাহর সাধারণ এরশাদ হলো ঃ

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ ـ(اعراف : ٩٦)

"যদি বস্তি ও জনপদের বাসিন্দারা ঈমান আনতো ও তাকওয়ার পথ অবলম্বন করতো তাহলে আমি তাদের জন্যে আসমান ও যমীনের বরকতের স্তরগুলো খুলে দিতাম।"–(সূরা আল আরাফ ঃ ৯৬)

এ এরশাদ তো তাদের সম্পর্কে যারা ঈমান ও তাকওয়ার পথ থেকে দূরে পলায়ন করছিল এবং এ জন্যে এ প্রতিশ্রুতির যোগ্যও তাদেরকে মনে করা হয়নি। কিন্তু যারা এ পথ অবলম্বন করেছে তাদের সম্পর্কে কোরআনের বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ـ (ال عمران : ١٤٨)

"..... আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার প্রতিদানও দিলেন এবং আখেরাতেও উৎকৃষ্ট প্রতিদান দিলেন।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৮)

নবীগণের দাওয়াতের এ সর্বসম্মত সাক্ষ্য আমাদের সামনে রয়েছে। এর থেকে আল্লাহ তায়ালার যে অপরিবর্তনীয় নিয়মনীতি ও সিদ্ধান্তের সন্ধান পাওয়া যায়, তা নিশ্চিতরূপে এই যে, তাঁর বন্দেগী ও আনুগত্যের বিনিময়ে তিনি আখেরাতের সাফল্যের সাথে সাথে এ দুনিয়াতেও সুখ-শান্তি, মান-সম্মান এবং শাসন ক্ষমতা দান করবেন। অতপর এ সর্বসম্মত সাক্ষ্য একথাও বলে যে, যখনি কোন জাতি আনুগত্য ও বন্দেগীর পথ ধরেছে, তাদের সপক্ষে এ নিয়মনীতি এবং প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ করা হয়েছে। এবং যাদের আখেরাত ভালো হচ্ছিল, তাদের পার্থিব জীবনও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে ভরে উঠছিল।

ইসলাম পার্থিব সাফল্যের নিশ্চয়তা দানকারী

ইসলাম এবং মুসলিম জাতির বেলায় আল্লাহ তায়ালার উপরোক্ত নিয়ম-নীতি ও সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হবে—এর কোন কারণ নেই। বস্তুতঃ পরিবর্তন হয়নি এবং পার্থিব সাফল্যের ব্যাপারে ঠিক ওভাবেই এ উম্মতকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, যেভাবে পূর্ববর্তীগণকে দেয়া হয়েছিল এবং প্রত্যেক পর্যায়ে দেয়া হয়েছিল। মক্কায় অন্ধকার পরিবেশে এবং মদিনার বিপদপূর্ণ যুগেও দেয়া হয়েছে। যারা এখোন ঈমান আনেনি, তাদেরকেও দেয়া হয়েছে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকেও। বস্তুতঃ মক্কায় কুরাইশদের সামনে দাওয়াত পেশ করার সময় আল্লাহ তায়ালা পরিকার করে বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

وَاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ـ(هود : ٣)

"তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কর এবং তারপর তাঁর দিকে ফিরে এসো। তিনি তোমাদেরকে একটা নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত জীবন যাপনের উৎকৃষ্ট উপায় উপাদান দান করবেন।"–(সূরা হুদ ঃ ৩)

আল্লাহর নবী তাদেরকে নিশ্চয়তা দিয়ে বললেন ঃ

فَاِنْ تَقْبَلُوْا مِنِّىْ مَاجِئْتُكُمْ بِهٖ فَهُوَ حَظُّكُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ

"তোমরা যদি আমার আনীত পয়গাম গ্রহণ কর তাহলে তা দুনিয়াতেও তোমাদের সৌভাগ্যের কারণ হবে এবং আখেরাতেও।"–(ইবনে হিশাম)

এ সৌভাগ্যের ব্যাখ্যা নবী (সা) তাঁর চাচা আবু তালেবের সামনে এভাবে করেছিলেন ঃ

اُرِيْدُهُمْ عَلٰى كَلِمَةٍ وَّاحِدَةٍ تَدِيْنُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ وَتُؤَدِّى الْعَجَمُ اِلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ ـ

"আমি তাদেরকে (কুরাইশদেরকে) শুধু একটি কথা বলে রাখতে চাই যার বদৌলতে সমগ্র আরব তাদের অনুগত হবে এবং বহির্জগতও তাদের করদাতা হবে।"–(মুসনাদে আহমদ)

পরবর্তীকালে ঈমান আনয়নকারীদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط (النور : ٥٥)

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, এবং নেক আমল করেছে তাদের কাছে আল্লাহর ওয়াদা এই যে, তিনি তাদেরকে যমীনের উপরে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করবেন যেমন তিনি তাদের পূর্ববর্তীগণকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেছিলেন এবং তাদের ঐ দ্বীনের মূল সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তাদের বর্তমান ভয়াবহ অবস্থাকে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় পরিবর্তন করে দিবেন।"–(সূরা আন নূর ঃ ৫৫)

www.pathagar.com

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

"দুর্বল হয়ে পড়ো না এবং চিন্তিত হয়ো না। তোমরাই উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হবে যদি তোমরা (সত্যিকার) ঈমানদার হও।"

–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৯)

ঈমান এবং নেক আমলের শর্ত পূরণ করার ফলে তারা উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। কিভাবে এ শর্ত পূর্ণ হয়েছিল তা দুনিয়ার কাছে অবিদিত নয়। দুনিয়া ভালোভাবে জানে যে, ইসলাম মুসলমানদেরকে ওসব কিছুই দিয়েছে যা দুনিয়ার প্রতিটি জাতি কামনা করে।

দ্বীনের অনুসরণ এবং পার্থিব সাফল্যের সম্পর্ক

এসব বিশদ বিবরণ ও সাক্ষ্যের পর মন তো এ বিষয়ে নিশ্চিত হয় যে, ইসলাম তার অনুসারীদেরকে দুনিয়ার সাফল্যদান করে। কিন্তু এখন সে জানতে চায় এমন কেন এবং কি করে হয়। দ্বীন তো মানুষকে আখেরাতের দিকে চালিত করে নিয়ে যায় এবং দুনিয়া থেকে বেপরোয়া বানিয়ে দেয়। অতপর দ্বীনের হস্তধারণ করার ফলে এ দুনিয়া কি করে তাদের মুষ্ঠির মধ্যে এসে যায়? এ প্রশ্নের জবাব জানার জন্যে এবং এ বিষয়টি বুঝার জন্যে কিছু মৌলিক তত্ত্ব বুঝে নেয়া দরকার।

এক তো এই যে, এ ধন-দৌলত, মান-সম্ভ্রম ও রাষ্ট্রশক্তি যাকে দুনিয়ার সাফল্য বলা হয়, দ্বীনের দৃষ্টিতে কোন অবাঞ্ছিত জিনিস নয়। বরঞ্চ তা আল্লাহর দান এবং অনুগ্রহ। বস্তুতঃ কোরানে হাকিম তার বর্ণনা প্রসংগে এগুলোকে এ মর্যাদাই দিয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সূরায়ে মায়েদার বিশ আয়াত দেখুন যেখানে বনী ইসরাইলের বর্ণনা প্রসংগে তাদের এ জাতীয় উন্নতি ও রাষ্ট্রক্ষমতাকে আল্লাহ পরিষ্কার ভাষায় তার দান বলে অভিহিত করেছেন যা অতীতে তারা লাভ করেছিল।

এরূপ সূরায়ে নহলের ১১২নং আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করুন যেখানে জীবনের সচ্ছলতা ও ধন-সম্পদের আধিক্যকে নিয়ামতসমূহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এভাবে সূরায়ে জুম'আ প্রভৃতি বহুস্থানে এসব সম্পদকে আল্লাহর ফযল (অনুগ্রহ) বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, মানুষকে এ দুনিয়ায় আল্লাহর খলিফা এবং প্রতিনিধি করে পয়দা করা হয়েছে। তার পদমর্যাদাই এই যে, সে এ পৃথিবী পরিচালনার ভার নিজের হাতে রাখবে এবং তাকে প্রভুর হুকুম ও মরযী মুতাবিক চালাবে।

www.pathagar.com

এ দু'টি মৌলিক তত্ত্ব যদি সামনে থাকে, তাহলে আলোচ্য প্রশ্নটির সমাধান তো এতদূর পর্যন্ত হয়ে যায় যে, দুনিয়ার মানসম্ভ্রম ধন-সম্পদ ও রাষ্ট্রক্ষমতা এমন জিনিস যার সাথে সম্পর্ক রাখা এবং যার থেকে উপকৃত হওয়া দ্বীন ও ঈমানের পরিপন্থী নয়। কেননা যেসব জিনিস আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ, তা তাঁর সত্যাশ্রয়ী বান্দাদের জন্য নিষিদ্ধ হতে পারে না। এ ধরনের জিনিস সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ ط

"বলে দাও যে, এসব পাক-পবিত্র জিনিস দুনিয়ার জীবনেও ঈমানদারদের জন্যে এবং কিয়ামতের দিনে তো বিশেষ করে তাদের জন্যেই হবে।"

–(সূরা আল আরাফ ঃ ৩২)

এর অর্থ এই যে, এসব জিনিসের আসল হকদার আল্লাহর অনুগত বান্দাহগণই। এখন যদি এসব জিনিসের সত্যিকার হকদার আল্লাহর অনুগত বান্দাহগণই হন, তাহলে তা তাদের কাছে অবাঞ্ছিত কি করে হতে পারে ? খোদাকে যারা জানতে এবং চিনতে পেরেছে তারা তো তাঁর ক্রোধ-আক্রোশ থেকে পলায়ন করবে, নিয়ামত ও দান থেকে তো পলায়ন করবে না।

এতো হলো দুনিয়াবী মান-সম্মান ও ধন-সম্পদে আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ হওয়ার দাবী। এখন মানুষের জন্মগত পদমর্যাদা সামনে রেখে চিন্তা করে দেখুন তার দাবী কি। যদি আল্লাহ মানুষকে তাঁর খলিফা বানিয়ে থাকেন এবং যদি তিনি চান যে, যমীনের উপরে সে তার হুকুম মুতাবিক নিজের এখতিয়ার ব্যবহার করবে যাতে করে এ ক্ষেত্রেও তাঁরই মরযী পূরণ হয়, যেমন সৃষ্টিজগতের অন্যান্য ক্ষেত্রে পূরণ হয়ে আসছে, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে এমন লোক বিদ্যমান থাকে যারা তাদের এ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন, ততক্ষণ পর্যন্ত এ আল্লাহর হিকমত, বিজ্ঞতা ও ইনসাফের খেলাপ হবে যদি তাদেরকে এ যমীনে রাষ্ট্রীয়ক্ষমতা ও এখতিয়ার থেকে বঞ্চিত করে তাদের স্থলে এ ক্ষমতা এমন লোকের উপর সুপর্দ করা হয় যারা নিজেদের এ পদমর্যাদার দায়িত্ব অস্বীকার করে। উপরন্তু তারা নিজেদের সম্পর্কে আল্লাহর খলীফা ও প্রতিনিধি হওয়ার পজিশনকে অস্বীকার করে এবং দুনিয়ায় নিজেদের স্বাধীন সার্বভৌমত্ব অথবা অন্য কারো সার্বভৌমত্বের দাবী করে। এ এক সুস্পষ্ট সত্য। তথাপি আল্লাহ এর গুরুত্বকে সামনে রেখে সুস্পষ্ট করে বলেছেন ঃ

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ (الانبياء : ١٠٥)

www.pathagar.com

"আমরা যবুর গ্রন্থে স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর একথা লিখে দিয়েছিলাম যে পৃথিবীর ওয়ারিশ (শাসক) আমার নেক বান্দাহগণই হবে।"

–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১০৫)

অপরদিকে খোদার এসব দায়িত্বশীল অনুগত বান্দাহদের জন্যে এটা কিছুতেই ঠিক হবে না যে, তারা এ রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করা থেকে দূরে থাকবে। কারণ তা, না হলে তারা খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে পারে না। যে জিনিসের সাথে তাদের জীবনের আসল দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট তা তাদের জন্যে শুধু পছন্দনীয়ই নয়, আবশ্যকও বটে।

এ সমুদয় দিক সামনে রেখে চিন্তা করলে একথা বুঝতে পারা যাবে যে, মুসলমান শুধু আখেরাতের সাফল্যের জন্যে নয়, দুনিয়ার সাফল্যের হকদার এবং প্রার্থী। এরূপ হওয়াটাই তার সত্যিকার দ্বীনদারীর দাবী। এ কারণেই সুষ্ঠু চিন্তার মুসলমান এ দোয়া করে থাকে ঃ

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً ـ(البقرة : ٢٠١)

"হে খোদা ! আমাদেরকে দুনিয়াতে (দুনিয়ার) মংগল এবং আখেরাতে (আখেরাতের) মংগল দান কর।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২০১)

এ দোয়া নিশ্চিতরূপে কবুল হয়ে থাকে, যদি দোয়াকারী নিজকে তার যোগ্য প্রমাণ করতে পারে।

এখন আলোচ্য প্রশ্নের শুধু একটি দিক রয়ে গেছে এবং তা এই যে, যদি মুসলমান আখেরাতের সাফল্যের সাথে সাথে দুনিয়ার সাফল্যেরও হকদার এবং প্রার্থী হতে পারে এবং হয়, তাহলে কোরআন হাদীসে, দুনিয়া তলব করার এত নিন্দা করা হয়েছে কেন ? এরূপ অবস্থায় তাহলে একথারই বা কি অর্থ হবে যখন বলা হয় যে, মুসলমান ঐ ব্যক্তি যে তার দৃষ্টি সর্বদা আখেরাতের প্রতি নিবদ্ধ করে রাখে এবং দুনিয়ার কোন স্বার্থকেই আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয় না ?

প্রথম কথার জবাব এই যে, যে দুনিয়াকে অভিশপ্ত ও ঘৃণিত বলা হয়েছে সে এক জিনিস, এবং যে দুনিয়ার সাফল্যের হকদার ও প্রার্থী মুমেন হয়, সে আর এক জিনিস। ইসলামের দৃষ্টিতে ঘৃণিত ও পরিত্যাজ্য শুধু ঐ জিনিস যা মানুষকে খোদা থেকে গাফেল এবং দ্বীনের চাহিদাগুলো থেকে বেপরোয়া বানিয়ে দেয়। যে দুনিয়ার নিন্দা কেতাব ও সুন্নাতে করা হয়েছে তা আসলে এসব জিনিসেরই নাম। কিন্তু যেসব জিনিস মানুষকে খোদা থেকে গাফেল করে দেয় না এবং যা দ্বীনের চাহিদা পূরণ করার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হওয়ার পরিবর্তে

www.pathagar.com

সাহায্যকারী হয়, তা কখনও ঘৃণিত ও পরিত্যাজ্য হতে পারে না। বরঞ্চ সকল দিক দিয়ে পছন্দনীয় ও বাঞ্ছিত। এসব জিনিসকে কোরআন মজিদে ঘৃণিত অভিশপ্ত নয় ; বরঞ্চ দুনিয়ার মঙ্গল (فى الدُّنْيَا) পবিত্র ও ভালো জীবন (حَيٰوةً طَيِّبَةً) এবং দুনিয়ার প্রতিদান (ثَوَابَ الدُّنْيَا) প্রভৃতি বলে অভিহিত করা হয়েছে। একজন মুসলমানের জন্যে দুনিয়াবী সাফল্যের কথা যখন বলা হয়, তার থেকে আসলে এসব জিনিসই বুঝানো হয়। বলা হবে যে, খোদা থেকে গাফেল হওয়া এবং দ্বীনের চাহিদাগুলো থেকে বেপরোয়া হওয়ার সম্পর্কে তো আসলে মানুষের মনের সাথে ; দুনিয়ার বস্তুসমূহের সাথে নয়। একই বস্তু একজনের জন্যে খোদা থেকে গাফেল হওয়ার কারণ হয় কিন্তু অন্যের জন্যে হয় না। অনেক নগণ্য ব্যক্তি সামান্য সম্পদ লাভ করে অহংকারে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। কিন্তু হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (রহ) তৎকালীন সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রের কর্ণধার হয়েও মুহূর্তের জন্যেও খোদা থেকে গাফেল হননি। অতএব যে নির্দিষ্ট কোন বস্তু না এ ধরনের দুনিয়া ছিল না অন্য ধরনের। নিঃসন্দেহে প্রকৃত ব্যাপার এই যে, দুনিয়ার ধন-সম্পদ মান-সম্মান এবং রাষ্ট্রীয়ক্ষমতা প্রভৃতি জিনিসগুলোর মধ্যে মূলতঃ কোন কিছু খারাপ ও পরিত্যাজ্য নয়। এ হচ্ছে আসলে মানুষের আপন ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি যা এসব বস্তু তার পক্ষে হলাহলে পরিণত হয়। কিন্তু মুমেনের ব্যাপারে কোরআন ও ইসলামের ধারণা এই যে, সে আল্লাহ প্রদত্ত এসব জিনিসের ব্যবহার ভ্রান্ত পথে নয় ; বরঞ্চ তার মরযী ও হেদায়েত মুতাবিকই করে। অতএব তার জন্যে সে ধরনের দুনিয়া নয় যা নিন্দিত ও অভিশপ্ত। বরঞ্চ এমন দুনিয়া যা প্রশংসিত ও বাঞ্ছিত।

দ্বিতীয় কথার জবাব এই যে, আখেরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয়ার অর্থ দুনিয়ার সম্পর্ক ত্যাগ করা নয়। বরঞ্চ তার অর্থ এই যে, তা অর্জন করার ব্যাপারে এবং অর্জন করার পর তাকে ব্যবহার করার ব্যাপারে দ্বীনের চাহিদাকে নস্যাৎ করা চলবে না ও আখেরাতের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করা চলবে না। এখন দ্বীনের চাহিদা ও আখেরাতের স্বার্থ তো অবশ্যই এমন যা প্রবৃত্তির মুখে লাগাম লাগায়, মনগড়া কাজ করতে বাধা দেয় এবং তার থেকে পার্থিব স্বার্থের কুরবানী দাবী করে। কিন্তু এমনও নয় যে, দুনিয়ার কোন জিনিসই কোন প্রকারে এবং কোন এক সীমারেখা পর্যন্ত অর্জন করে দেবার উদারতা দেখাবে না। বস্তুতঃ হাদীসে মুমেনের তুলনা একটি ঘোড়ার সাথে করা হয়েছে যাকে একটি সীমিত দীর্ঘ রশিতে বেঁধে রাখা হয়েছে।

এ ঘোড়ার অবস্থা ঐ ঘোড়ার মতো নয় যার পাগুলো খুঁটির সাথে একত্র করে বাঁধা হয়েছে যার ফলে সে মোটে এদিক সেদিক নড়া-চড়াই করতে পারে না। প্রথম ঘোড়াটির একটা বিশিষ্ট সীমা পর্যন্ত চড়ে বেড়াবার স্বাধীনতা

www.pathagar.com

থাকে। কিন্তু দ্বিতীয়টি এ প্রকার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত থাকে। এ দৃষ্টান্তের দ্বারা বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, দুনিয়ার উপরে আখেরাতকে প্রাধান্য দেয়া সত্ত্বেও মুমেনের জন্যে পার্থিব সাফল্যের পথও ন্যায়সংগত ও প্রয়োজনানুরূপ সীমা পর্যন্ত সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। অর্থাৎ যেখানে এ একটি স্বীকৃত সত্য যে, মুমেনের আসল লক্ষ্য বস্তু আখেরাতের সাফল্য, সেখানে এটাও এক সত্য যে, ইসলাম আখেরাতের সাফল্যের যে পথ বলে দিয়েছে দুনিয়ার সাফল্যকে ডিঙিয়ে সে পথ চলেনি। বরঞ্চ চলেছে তার ভিতর দিয়েই।

একটু আগে সূরায়ে আলে ইমরানের যে উদ্বৃতি দেয়া হয়েছে, তার শব্দগুলো ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখুন। এ আয়াতটি পরিষ্কার একথা বলে যে, যেসব লোক সত্যিকার ঈমান ও নেক আমল রাখে, তাদেরকে ঈমান ও নেক আমলের পুরস্কার স্বরূপ আখেরাতের উৎকৃষ্টতম প্রতিদানের (حُسْنُ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ) সাথে দুনিয়ার প্রতিদানও (ثَوَابُ الدُّنْيَا) দেয়া হয়ে থাকে। খোদা পুরস্তি এবং আখেরাতের সাফল্যের পথ যারা অবলম্বন করে তাদের দুনিয়ার প্রতিদানও লাভ করা একথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, দুনিয়ার সাফল্য খোদাভীতি ও পরকাল প্রিয়তার সওয়াব বা প্রতিদানের মধ্যেই শামিল। অতএব দুনিয়ার উপরে আখেরাতকে প্রাধান্য দেয়া দুনিয়া থেকে বঞ্চিত হওয়া নয়, দুনিয়ার স্বার্থও লাভ করা।

পার্থিব সাফল্যের অপরিহার্য শর্তাবলী

সর্বশেষে এ সত্যকেও স্মরণ করিয়ে দেয়াটাও সঙ্গত হবে যে, সত্যিকার ঈমান ও নেক আমল আখেরাতের সাফল্যের জন্যে যেমন জরুরী, তেমনি দুনিয়ার সাফল্যের জন্যেও তা জরুরী। অর্থাৎ দুনিয়ার বরকতের দুয়ার মুসলমানের জন্যে তখোনি খুলে যায় যখন সে ঈমান ও আমলের শর্ত পূরণ করে। এ ব্যাপারে কোন প্রমাণ পেশ করা নিষ্প্রয়োজন। উপরের পৃষ্ঠাগুলোতে আপনি দেখেছেন যে, যে কোন জাতিকেই পার্থিব সাফল্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তা দেয়া হয়েছে ঈমান ও আমলের শর্তসহ। স্বয়ং মুসলিম জাতিকে কাফেরদের উপরে বিজয়ী হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, তাও اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ-এর শর্তসহ এবং যখন রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, তখনও এরূপ পরিষ্কার ভাষায় দেয়া হয়েছিল যে, এ প্রতিশ্রুতি শুধু তাদের জন্যে যারা ঈমান ও নেক আমলের অধিকারী।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ (النور : ٥٥)

মোটকথা যেখানে আল্লাহর এ এক সাধারণ প্রতিশ্রুতি যে তিনি দ্বীন অনুসারীদেরকে পার্থিব সাফল্যও দান করেন, সেখানেই তাঁর এ সাধারণ নিয়ম-

www.pathagar.com

নীতিও থাকে যে, এ সাফল্য ঈমান ও নেক আমলের অপরিহার্য শর্তের অধীন। অর্থাৎ ঈমান ও নেক আমল ব্যতীত শুধু আখেরাতেরই নয়, দুনিয়ার সাফল্যও হস্তগত করা যায় না।

দ্বীন ব্যতীত সত্যিকার অর্থে দুনিয়াও লাভ করা যায় না। এ নিয়ম-নীতি ব্যক্তি অথবা দল উভয়েরই জন্যে। কেউ এর ব্যতিক্রম নয়। ব্যক্তিবর্গ ও তাদের ব্যক্তিগত জীবনে পার্থিব সাফল্য যথা—শান্তি ও নিরাপত্তা, মান-সম্মান, জনপ্রিয়তা এবং জীবনযাপনের দৈনন্দিন প্রয়োজন প্রভৃতি তখোনি লাভ করে যখন তারা খোদা ও আখেরাতকে ভয় করে চলে যেমন একজন মুসলমানের চলা উচিত। নবী করিম (সা) এ সত্যটির বিশদ ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ

مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ اٰخِرَتِهٖ كَفَاهُ اللّٰهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُوْمُ اَحْوَالُ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ فِيْ اَيِّ اَوْدِيَتِهَا مَلَكَ ـ

"যে ব্যক্তি তার যাবতীয় চিন্তা একটি মাত্র চিন্তা—তার আখেরাতের চিন্তা বানিয়ে নিয়েছে, তার দুনিয়ার ব্যবস্থাপনার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। (পক্ষান্তরে) যে ব্যক্তির মন-মস্তিষ্ককে অসংখ্য অগণিত চিন্তা দুনিয়ার বহুবিধ চিন্তা ও কায়কারবারে ব্যস্ত বিক্ষিপ্ত করে রেখেছে, আল্লাহ তায়ালা পরোয়া করেন না যে, সে কোন্ ঘাঁটিতে ধ্বংসের সম্মুখীন হচ্ছে।"–(ইবনে মাজা)

... وَمَنْ كَانَتِ الْاٰخِرَةُ لِنِيَّتِهٖ جَمَعَ اللّٰهُ اَمْرَهٗ وَجَعَلَ غِنَاهُ قَلْبِهٖ وَاَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ ـ

"যে ব্যক্তি আখেরাতকে তার কাম্য বানিয়ে নিয়েছে, আল্লাহ তার কাজ-কর্ম দুরস্ত করে দেন এবং তাকে মনের দিক দিয়ে ধনী বানিয়ে দেন। অতপর দুনিয়া অনুগত হয়ে তার সামনে হাযীর হয়।"–(ইবনে মাজা)

এভাবে মুসলিম উম্মত তার সমষ্টিগত জীবনের সাফল্য-স্বাধীনতা, সমৃদ্ধি, শ্রেষ্ঠত্ব, রাষ্ট্রক্ষমতা আন্তর্জাতিক শ্রদ্ধা প্রভৃতি তখোনি লাভ করে যখন তারা সমষ্টিগতভাবে প্রকৃত উম্মত হয়। অর্থাৎ একদিকে তো তারা এমন সব ব্যক্তি-বর্গের সমন্বয়ে গঠিত হবে যারা হবে সত্যিকার ঈমানদার ও নেক আমলকারী, অন্যদিকে তাদের মধ্যে এমন সুদৃঢ় সামাজিক সামষ্টিক শৃংখলা বিরাজ করবে যার অভাবে কোন দল মোটেই দল হতে পারে না এবং যার জন্যে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে বার বার তাকীদ করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে অন্যান্য জাতিদের সাথে তার (মুসলিম মিল্লাতের) তুলনা করা ঠিক হবে না। অন্যান্য জাতিসমূহ তাদের সকল প্রকার খোদাদ্রোহীতা সত্ত্বেও

www.pathagar.com

বড়ো বড়ো রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করতে পারে। কিন্তু মুসলিম জাতির এ ধরনের কোন সম্ভাবনা নেই। তাদের জন্যে মান-সম্মান ও রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের একটি মাত্র পথ রয়েছে এবং তা হচ্ছে ইসলামের পথ, আল্লাহর আনুগত্যের আচরণ, শাহাদতে হকের সহজ-সরল পথ। এ পার্থক্যের কারণ এই যে, ইসলামী মিল্লাতের উন্নতি অবনতির কানুন আল্লাহ তেমন নির্ধারিত করেননি যেমন অন্যান্য জাতির জন্যে করেছেন। অন্যান্য জাতির জন্যে তাঁর কানুন এই যে, যদি তারা কিছু মৌলিক ধরনের মানবিক চরিত্র নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারে এবং উন্নতির জন্যে প্রয়োজনীয় বস্তুগত উপায় উপাদান তৈরী করে, তাহলে তারা উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠতে পারে। কিন্তু এসব জিনিস মুসলিম জাতির উন্নতির কারণ কখনো হতে পারে না। কারণ এ জাতি এ দুনিয়ায় আল্লাহর দ্বীনের ধ্বজাবাহক এবং অন্যান্য জাতির সামনে হকের সাক্ষদাতা। অন্য কোন জাতির এ পজিশন নয়। পজিশনের পার্থক্য অকাট্য রূপে অধিকার ও দায়িত্ব এ উভয়ের পার্থক্য দাবী করে এবং অধিকার ও দায়িত্বের পার্থক্যের জন্যে উভয়ের প্রতি আচরণবিধিও পৃথক হওয়া আবশ্যক। অন্যান্য জাতি যদি সত্য ও ন্যায়-নীতির বিপরীত পথে চলে, তাহলে ন্যায়তঃ তাদের এ অপরাধ ততোটা কঠিন ও ঘৃণ্য হবে না, যতটা হবে মুসলিম জাতির এ অপরাধ। অন্যান্য জাতিসমূহ যদি স্বাভাবিক নিয়মে এ সুযোগ লাভ করে যে তারা খোদার আনুগত্য না করেও সমৃদ্ধ হতে পারবে এবং মুসলিম জাতি সে সুযোগ পাবে না, তাহলে তাই তো হওয়া উচিত।

যারা আল্লাহ তায়ালার বিশিষ্ট অনুগ্রহ লাভ করলো, সে বিশিষ্ট অনুগ্রহের প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপনের কারণে তাদেরকে আবার তাঁর বিশিষ্ট শাস্তির যোগ্যও হতে হবে।

এক্ষণ গত সাড়ে তেরশত বছরের ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম জাতি দুনিয়ার প্রকৃত সমৃদ্ধি ও রাষ্ট্রশক্তি তখোনি লাভ করতে পারে, যখন তারা প্রকৃতপক্ষে মুসলিম ছিল ততদিন গোটা সভ্য জগতে রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি এবং বস্তুগত শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে তার সেই পজিশন ছিল যা আজ আমেরিকা এবং রুশের আছে। কিন্তু যেমন সে মুসলিম জাতির পরিবর্তে শুধু 'জাতি' হতে লাগলো, নিজের সেই পজিশন হারাতে লাগলো। অবশেষে এমন এক অবস্থায় এসে পৌছলো, যখন দুনিয়ায় তার কোন মর্যাদাই বাকি রইলো না। এ অবস্থা স্বয়ং একথাই বলে দেয় যে, জাতির এ অবস্থা সত্যিকার মান-সম্মান ও ভক্তি শ্রদ্ধায় রূপান্তরিত ততক্ষণ পর্যন্ত হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজকে পরিবর্তন করে আগে যা ছিল তাই না হয়েছে। আহলে কেতাব সম্পর্কে আল্লাহর সেই সিদ্ধান্ত আমাদের কাছে আছে যা নবী করিম (সা) তাদেরকে শুনিয়ে দিয়েছেন ঃ

www.pathagar.com

يَاَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ ط (المائدة : ٦٨)

"হে আহলে কেতাব ! তোমরা কোন মূল বস্তুর উপরে নও, যতক্ষণ না তোমরা তওরাত, ইঞ্জিল এবং ঐ হেদায়েত কায়েম করেছ, যা তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে।"

–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৬৮)

এ সিদ্ধান্ত মুসলিম জাতির ভবিষ্যতেরও আলোকবর্তিকা। যদি তারা কোরআনের উপস্থাপিত দ্বীনে হক নতুনভাবে কায়েম না করেছে তাহলে খোদায়ী কানুনের দাবী এই যে, তাদেরকেও কোন মূল বস্তুর উপরে প্রতিষ্ঠিত মনে করা হবে না এবং না তাদেরকে সে মান-সম্মান ও রাষ্ট্রশক্তির যোগ্য মনে করা হবে যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তাদেরকে 'মুসলিম জাতি' হিসাবে দিয়েছিলেন। প্রকৃত সম্মান ও রাষ্ট্রশক্তি তারা তখনি লাভ করতে পারবে, যখন তারা তাদের জীবনের উপরে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করবে। এ দ্বীন তাদের মসজিদের দ্বীন হবে এবং তাদের এসেম্বলী (পার্লামেন্টে)-রও দ্বীন হবে। আল্লাহর মঙ্গলের প্রতিশ্রুতি সর্বদাই পূর্ণ হওয়ার প্রতীক্ষায় আছে। এ জাতি যখন তা খাঁটি দেলে কামনা করবে, তখন তা অবশ্যই পূর্ণ হবে।

এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার আর একটি কানুন মনে রাখতে হবে। তা এই যে, মিল্লাতের স্বাধীনতা, মান-সম্মান ও প্রতিপত্তি দলেরই হয়ে থাকে, ব্যক্তির নয়। বস্তুতঃ এ সবের প্রতিপত্তিও জামায়াত বা দলকেই দেয়া হয়েছে, ব্যক্তিকে নয়। অতএব যদি এ উম্মত বা জাতি, মোটামুটি ঐ ধরনের জামায়াত হয়, যে ধরনের আল্লাহ ও তাঁর রসূল চান, অর্থাৎ সে দল হিসেবে হবে মুমেন, নেক ও সত্যের সাক্ষ্যদাতা দল, তাহলে নিশ্চিতরূপে সে দল স্বাধীন ও সমুন্নত হবে। সম্মানশ্রদ্ধা ও রাষ্ট্রক্ষমতা তাদের পায়ের তলায় লুণ্ঠিত হবে। কিন্তু যদি এ উম্মত এরূপ দল না হয়, তাহলে তারা সংখ্যার দিক দিয়ে অসংখ্য অগণিত বালুকণার মতো হলেও, কিছু সংখ্যক ব্যক্তির ব্যক্তিগত নেকির জন্যে ইসলামের ঐসব পার্থিব বরকতের যোগ্য কিছুতেই হবে না। আর যখন এমন অবস্থা হবে তখন স্বাভাবিকভাবেই নেক আমলকারী লোকও দুষ্কর্মকারী ও নিষ্কর্ম লোকদের সাথে ঐ দুর্ভাগ্য বরাবর শরীক হবে। অবশ্যি এ অন্য কথা যে, এসব নেক আমলকারী ব্যক্তিগণ জীবনে দুনিয়ার বরকত যথারীতি পেতে থাকবে। কেননা এসব বরকত লাভের জন্যে যে শর্ত ছিল তা যখন পূর্ণ হলো, তখন মিল্লাতের সমষ্টিগত দুষ্কর্ম ও তার অশুভ পরিণাম তার আপন জায়গায়

www.pathagar.com

হলেও ব্যক্তিগত জীবনে এসব বরকত লাভ তো হওয়াই উচিত। প্রস্তর খণ্ডের স্তূপের তলায় দলিত কিছু সংখ্যক উজ্জ্বল রত্ন এ গোটা স্তূপকে তো রত্নখচিত মুকুটে পরিণত করতে পারবে না যে তা মানুষের মাথার শোভাবর্ধন করবে। কিন্তু তার নিজস্ব একটা মূল্য আছে যা বিনষ্ট করতে পারবে না প্রস্তর খণ্ডের আধিক্য।

একটি বিভ্রান্তি ও তার খণ্ডন

পার্থিব সাফল্যের বিষয় যা কিছু বলা হলো, অবস্থার বাহ্যিক দিক দিয়ে পর্যালোচনা করলে, পর্যালোচনাকারিগণ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের বিভ্রান্তিতে পড়ে যাবেন। তাঁরা বলবেন এসব অভিজ্ঞতার বিপরীত। কেননা, এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে যে, যারা ভালো মুসলমান তারা কোন রকমে জীবনযাপন করছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদেরকে চরম দুঃখ-কষ্টের মধ্যে কালাতিপাত করতে হয়। পক্ষান্তরে যারা শুধু নামের মুসলমান তারা অগাধ ধন-সম্পদ ও খ্যাতি লাভ করে। এমনি কিছু মুসলিম রাষ্ট্র যারা তাদের রাজনীতি ও সরকারের গায়ে ইসলামের নামটা পর্যন্ত তাবাররক হিসাবে এঁটে দেয়া পছন্দ করেন না ; তারা স্বাধীন ও সার্বভৌম কিন্তু ওসব মুসলিম রাষ্ট্র যেখানে শরীয়তের হুকুম জারী আছে অপরের আশ্রিত। এ অবস্থায় দুনিয়ার সাফল্যের উপরে বর্ণিত প্রতিশ্রুতি ও নিয়ম-নীতি অবোধগম্য।

ব্যক্তিগত সাফল্য সম্পর্কে চিন্তা করলে এ বিভ্রান্তি শুধু তাদেরই হতে পারে যাঁদের মধ্যে পার্থিব সাফল্য সম্পর্কে ইসলামী ধারণার অভাব আছে। এই সাধারণ ধারণা থেকে অনেকাংশে পৃথক। অতএব এ বিভ্রান্তির সমাধান এই যে, এ ধারণা জেনে নেয়া যাক। এর জবাব ঐসব আয়াত থেকে পাওয়া যাবে যার মধ্যে একজন সাচ্চা মুসলমানকে পার্থিব সাফল্যের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

"যে ব্যক্তিই পুরুষ অথবা নারী, নেক আমল করবে এবং সে হবে ঈমানদারও আমরা অবশ্যই তার ভালোভাবে জীবনযাপনের ব্যবস্থা করব।"

–(সূরা আন নহল ঃ ৯৭)

فَمَنِ تَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ۝ وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا (طه : ١٢٣-١٢٤)

"অতপর যে কেউই আমার হেদায়েত অনুসরণ করে চলবে ; সে না পথভ্রষ্ট হবে আর না বিপদ ও দুঃখ-কষ্টে পতিত হবে। আর যে কেউই

www.pathagar.com

আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে ; তার জীবন অবশ্যই সংকীর্ণ হবে।"–(সূরা ত্বহা ঃ ১২৩-১২৪)

এ আয়াতগুলো একথাই বলে যে, ঈমান ও নেক আমলের ফলে এ দুনিয়ার মুমেন যে সাফল্য লাভ করবে, তা হবে حَيٰوةً طَيِّبَةً উৎকৃষ্ট জীবন এবং বিপদ মসিবত হীন لَايَشْقٰى সাফল্য। অন্য কথায়, এ সাফল্যের প্রকৃত অর্থ মোটা ব্যাংক ব্যাল্যান্স, বিরাট বিরাট অট্টালিকা, মূল্যবান গাড়ী, চাকর-বাকরের বাহিনী, রাজকীয় খানাপিনা এবং মূল্যবান বেশভূষা নয়, বরঞ্চ জীবনযাপনের প্রকৃত প্রয়োজন পূরণ এবং মনের দিক দিয়ে সচ্ছলতা। যে ধন-সম্পদের কারণে ঘুমের মতো স্বাভাবিক প্রয়োজন মিটাবার জন্যে মানুষকে ঘুমের পিল খেতে হয় ; মন সবসময় অস্বস্তিকর ক্ষেত্রে পরিণত হয়, বুকের মধ্যে একাধারে ভীতি ও লালসার চিতা জ্বলতে থাকে, সে সম্পদে কিছুতেই দুনিয়ার শান্তি লাভ করা যায় না, বরঞ্চ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিই ভোগ করতে হয়। সে সম্পদ সাফল্য নয়, বরঞ্চ তা চরম দুর্ভাগ্য যা অনুকম্পার যোগ্য। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, খোদার মহব্বত ও আখেরাতের চিন্তা পরিত্যাগ করার পর মানুষ শুধু এমন সম্পদই লাভ করে যা হাতে পেয়ে সে অনাহারক্লিষ্টদের অপেক্ষা অধিক দরিদ্র ও সর্বহারা হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যার মন খোদার মহব্বত ও আখেরাত কামনার আস্বাদে ভরপুর থাকে, সে মাত্র দু' সন্ধ্যা আহার করেও যা তার অবশ্যই জোটে, সুলায়মানের ধন-সম্পদের মালিক হয়ে থাকে। কেননা যে বস্তুর নাম মনের শান্তি ও নিশ্চিন্ততা, তার উৎস হলো আল্লাহর স্মরণ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ এবং মানুষ যদি আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না হয়, তাহলে নিশ্চিতরূপে তার মধ্যে থাকবে তাকওয়া। আর যে ব্যক্তির মধ্যে তাকওয়া থাকবে, সে অভুক্ত ও বিবস্ত্র থাকবে না।

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ ط

"যে কেউ আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে, তিনি তার জন্যে (বিপদ আপদ থেকে) মুক্ত হবার পথ তৈরী করে দেন, এবং এমন উপায়ে তাকে রিযক পৌঁছিয়ে দেন যার কোন ধারণাই সে করতে পারে না।"

–(সূরা আত তালাক ঃ ২-৩)

এখন রইলো সামষ্টিক সামাজিক সাফল্যের কথা। এ বিভ্রান্তি শুধু বাহ্যিক দিকটা দেখারই ফল। নতুবা এ আসলে উল্লেখযোগ্য নয়। যেসব মুসলমান রাষ্ট্রকে আপনি ইসলামের সাথে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করার পরও স্বাধীন ও সার্বভৌম দেখতে পাচ্ছেন, তাদের মুখের উপরে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের আবরণটুকু মাত্র পড়ে আছে। নতুবা সত্যিকার অর্থে না তাদের স্বাধীনতা আছে,

www.pathagar.com

আর না সার্বভৌমত্ব। তাদের অবস্থা এই যে, তাদের মধ্যে কেউ মার্কিনের কৃপার উপর নির্ভরশীল, আর কেউ রুশের সাহায্য-সহযোগিতার ছায়ায় বেঁচে আছে। এ যদি জাতীয় মান-সম্মান ও সার্বভৌমত্ব হয় তাহলে এ ধরনের সার্বভৌমত্বের প্রতি ইসলাম বীতশ্রদ্ধ।

এমনিভাবে যেসব মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে আপনি শরীয়তের আইন জারী রাখার পরও অন্যের ধামাধরা দেখতে পান, তাদের একটিও এমন নেই যেখানে ইসলামী কানুন জারী থাকার কথাটা পঞ্চাশ কেন পঁচিশ ভাগও সত্য নয়। তাদের মধ্যে কারো এ সৎ সাহস নেই যে, জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ক্ষেত্রে ইসলামের দেয়া কানুন তারা জারী করতে পারে। তাদের মধ্যে যা দেখা যায়, তা খুব জোর কতিপয় অর্থনৈতিক ও মযহাবী ব্যাপারে ইসলামী আইন জারী আছে। কিন্তু একথা ঠিক যে ইসলামী জীবন বিধানের শুধু কিছু অংশ গ্রহণ করা এবং অবশিষ্ট অংশগুলো পরিত্যাগ করা ইসলামের উপর ঈমান ও একীনের প্রমাণ নয়। বরঞ্চ ঈমান অপূর্ণ থাকারই প্রমাণ। এর বিনিময়ে প্রকৃত সর্বময় শাসকের পক্ষ থেকে লাঞ্ছনাময় শাস্তিই নির্ধারিত আছে, উন্নত ও সমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়নি। অতএব এসব মুসলিম রাষ্ট্রগুলো যদি অপরের ধামাধরা হয়ে থাকে তাহলে তারা এ লাঞ্ছনাময় পরিণতির প্রকৃত যোগ্য। তাদের বর্তমান আচরণ এবং দুই-তৃতীয়াংশ ধরনের ইসলামের আনুগত্য তাদেরকে কখনো সত্যিকার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করতে দেবে না। এ নিয়ামত তো ইসলামের পুরোপুরি আনুগত্য এবং তার জীবন বিধান পুরোপুরি জারী করার পরই লাভ করা যেতে পারে। কেননা আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতি এমন অবস্থার সাথেই সংশ্লিষ্ট এবং এ শর্তেরই অধীন। তিনি তাঁর নিজের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে তাঁর বান্দাদের একথা বলেছেন।

أَوْفُوا بِعَهْدِيٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ج (البقرة : ٤٠)

"তোমরা আমার সাথে করা প্রতিশ্রুতি পালন কর। আমিও আমার প্রতিশ্রুতি পালন করব।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ৪০)

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔

সমাপ্ত

www.pathagar.com

আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১

বিক্রয় কেন্দ্র

৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার,
(ওয়ারলেস রেলগেট)
ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২

১০, আদর্শ পুস্তক বিপণী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।

www.pathagar.com